স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ

ভূমিকা / বিনয় ঘোষ

সংকলক / কমলেন্দু ধর

দেশকাল
৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ১৯৫৯

প্রকাশক
বি. রায়
দেশকাল
৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

অলংকরণ ও মুদ্রণে
কোলাজ
২ জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৩

প্রচ্ছদশিল্পী : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

বিষয়—বিন্যাস

প্রকাশকের পক্ষে

'স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। এ-কাজ শুরু করবার আগে, স্বাভাবিক ভাবেই, বিভিন্ন জিজ্ঞাসা এসেছিল বিভিন্ন মহল থেকে নানান বিষয়ে। সেই-সব জিজ্ঞাসা নিয়েই আমরা এগিয়েছি এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে এ-কাজ আমরা শেষ করেছি—অনেকের সহায়তায়।

তবু কিছু জিজ্ঞাসা থেকে যায়। তাঁদের কাছে আমাদের নিবেদন—এ-কাজকে আপনারা 'উদ্যোগপর্ব' হিসাবেই গ্রহণ করুন এবং যা আমরা করতে পারিনি—আগামী দিনে সে-কাজ করতে আমাদের সহায়তা করুন, আপনারাও এগিয়ে আসুন।

এই খণ্ড প্রকাশনার ব্যাপারে বিভিন্ন মহল থেকে আমরা যে সহায়তা পেয়েছি তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। প্রথম পর্ব থেকেই শ্রদ্ধেয় অশোক ঘোষ যে-ভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন—তার জন্য আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে উপকৃত হয়েছি। শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ, অরবিন্দ পোদ্দার ও জ্যোতি ভট্টাচার্য এ-কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আলোচনা করে এবং পরামর্শ দিয়ে যে উৎসাহ দিয়েছেন—তাতে তাঁদের বিদগ্ধ সহৃদয়তাই প্রকাশ পেয়েছে। লেখকদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাদের উদার সহযোগিতার জন্য।

দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ আমরা শুরু করেছি। বিভিন্ন কারণে দ্বিতীয় খণ্ডের কলেবর অনেক বড় হবে। তার মধ্যে 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা' ও 'রাজনৈতিক পটপরিবর্তন'—এই দুটি লেখা লেখকরা দিতে পারিনি। দ্বিতীয় খণ্ডে লেখাদুটি যাবে। এই ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমা চাইছি। আশা করছি, সবার সহযোগিতায় এ-কাজ আমরা শেষ করতে পারব।

ভূমিকা

এই ভূমিকা সম্পাদকের নয়, সংকলনের একজন লেখকের। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় উদ্ধৃত রচনাটির পর যাঁর লেখা প্রথম রচনা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে, ভূমিকাটি তাঁকেই লিখতে হচ্ছে প্রকাশকদের অনুরোধে। সংকলনের বিভিন্ন রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া ভূমিকা-লেখকের কর্তব্য। কর্তব্য পালন করতে গেলে প্রথমেই আমার নিজের রচনাটির কথা বলতে হয়। রচনার বিষয় হল স্বাধীনতা-উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক ইতিহাসের পরিবর্তনের ধারা। লেখাটির নাম দিয়েছি আমি—'যুগসন্ধিক্ষণের মানুষ। পরিবর্তনশীল পশ্চিমবঙ্গ।' সংকলনের অন্যান্য লেখকেরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন পশ্চিমবঙ্গের জনকর্মবিন্যাস, শিক্ষার অগ্রগতির ধারা, বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা, ভূমিসম্পর্কের রূপান্তর ও কৃষকের সমস্যা, শিল্পায়নের বিবর্তন প্রভৃতি। এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটিকেই সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম অঙ্গ বলা যায়। কিন্তু যেহেতু বিষয়গুলি পারদর্শী লেখকরা আলোচনা করেছেন, অবশ্যই তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, তাই আমার নিজস্ব রচনাটি এই প্রথম খণ্ডে অসম্পূর্ণ থেকে গেল। আমি শুধু এই সময়কার সামাজিক ইতিহাসের গতির প্রবণতাগুলি সামান্য ইঙ্গিত করেছি মাত্র। অর্থনীতি শিক্ষা ভূমিসমস্যা শিল্পায়ন বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সম্বন্ধে সামাজিক ইতিহাসের পরিবর্তন-সংশ্লিষ্ট আমার নিজের চিন্তাধারা পরবর্তী খণ্ডে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। এইটাই আমার অসম্পূর্ণ রচনার কৈফিয়ত।

এবারে সংকলনের বিভিন্ন রচনার কথা বলব। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস অনেক তথ্যসমৃদ্ধ সারণী-সহযোগে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস কর্মবিন্যাস উন্নয়নধারা জাতি-উপজাতি সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখক বলেছেন 'একদিকে অনুন্নত কারা, তারা কী কাজ করে, কোথায় থাকে? অপর-দিকে উন্নয়ন কোথায় হয়েছে, সেখানকার লোকের জীবিকা কী, সেখানে কারা থাকে। দুটো ছবি পাশাপাশি মেলালে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র আমীরি আর গরিবি—দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এ দুটোর একটা বস্তুত আরেকটারই উল্টোপিঠের ছবি।'

শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য শিক্ষার ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং তথ্যসমাবেশে কার্পণ্য করেননি। শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে তিনি এই ধরনের কিছু মন্তব্য করেছেন: 'শিক্ষাব্যবস্থার

বনিয়াদে কোনও ক্রমবিবর্তন ঘটেনি, ইংরেজ আমলে যা ছিল, কাঠামোর অঙ্গগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও অনুপাত মোটামুটি তাই-ই আছে।' 'পক্ষান্তরে বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্বও ট্রেড ইউনিয়ন, কিসান আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতিতে যত উৎসাহ দেখিয়েছেন, শিক্ষাপ্রসারের জন্য আন্দোলনে তার শতাংশের একাংশ দেখাননি। তাঁরা শিক্ষকদের বেতন-বৃদ্ধির জন্য আন্দোলনে সাহায্য সমর্থন যুগিয়েছেন, উচিত ভাবেই। কিন্তু শিক্ষা যে সমাজপরিবর্তনের একটা অন্যতম প্রধান অস্ত্র সে বিবেচনার বদলে তাঁরা শিক্ষক ও ছাত্রকে শুধু নিজ নিজ দলবৃদ্ধির উপাদান ও ভোট-সংগ্রহের যন্ত্র হিসাবেই দেখেছেন।' প্রসঙ্গত লেখক নকশালপন্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রেব আন্দোলনকেও কঠোর সমালোচনা কবেছেন। লেখাটিতে চিন্তার ও বিতর্কের খোরাক আছে যথেষ্ট।

শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখেছেন। অনেক চিন্তাশীল প্রসঙ্গেব তিনি অবতারণা করেছেন। বর্তমান অবস্থায় বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব কী হতে পারে, সে প্রসঙ্গে শ্রীপোদ্দার বলেছেন: 'শোষণ ও উৎপীড়নে জর্জরিত মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার বোধে উদ্‌বুদ্ধ হওয়া, সমকালীন সমস্যার ভাবনায় উদ্বিগ্ন হওয়া ও সমাধানের পথ আবিষ্কারের চেষ্টা; মানবিক ভুবনের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা, সংগ্রামের মধ্যে আপন অস্তিত্বের সার্থকতা উপলব্ধি করা; এবং সেজন্য মৃত্যুসহ যে কোন প্রকার বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকা। যিনি একান্ত সত্য অর্থে নিজেকে বুদ্ধিজীবী রূপে গণ্য করেন, তার কাছে এ ছাড়া কোন পথ নেই।'

শ্রীঅশোক রুদ্র 'ভূমিসম্পর্কের রূপান্তর ও কৃষির উন্নয়ন' সম্বন্ধে লিখেছেন। আমাদের দেশে ভূমিসম্পর্ক যেহেতু মৌল সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্য শ্রীরুদ্রের লেখাটির প্রতি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লেখক ভূমিসম্পর্ক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ক্ষেতমজুর, ভাগপ্রথা এবং সেকালের জমিদারশ্রেণীর অবর্তমানে জোতদারশ্রেণীর উদ্‌ভব, আয়তনবৃদ্ধি ও ক্ষমতার প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আমরা আজকাল কথায়-কথায় জোতদার কথাটি খুব ব্যবহার করি। কিন্তু 'জোতদার' ঠিক কাদের বলে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অনেকের নেই। অবশ্যই জোতদার এমন এক ব্যক্তি যার সম্পদ ও আয়ের উৎস হল চাষের জমির মালিকানা। আমাদের দেশে এই চাষের জমির খুব বড় একটা অংশ মুষ্টিমেয় কয়েকজন জোতদারের মালিকানাধীন। জোতদাররা বহুরূপীর ভূমিকায় অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়।

এরা জমি ভাগে দিয়েও চাষ করায়, আবার নিজের জোত হিসেবে ক্ষেতমজুর দিয়েও চাষ করায়। আয়ের উদ্‌বৃত্ত অংশ দিয়ে অর্থাৎ মুনাফা দিয়ে এরা বীজ কেনে, সার কেনে, যন্ত্রপাতি কেনে, কীটনাশক ওষুধপত্তর কেনে, সেচের ব্যবস্থা করে। ধনতান্ত্রিক সমাজের পুঁজিপতিদের মুনাফা-নিয়োগের সঙ্গে এদের টাকা খাটানোর সাদৃশ্য আছে। এই মুনাফা থেকে এরা গরিব চাষীদের সুদে টাকা ধার দেয়, ধান-পাট নিয়ে ফটকাবাজি করে, হাটে বাজারে দোকান পাট করে, পারমিট নিয়ে বাস চালায়, লরি চালায়, সিনেমাহলের মালিক হয়, শহরের যাত্রা-পার্টি গ্রামেগঞ্জে নিয়ে গিয়ে সংস্কৃতিরও ব্যবসা করে। অর্থাৎ টাকা চালিয়ে টাকা বাড়ানোর জন্য এরা কী যে করে আর কী করে না তা কল্পনা করা যায় না। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্যসমাজে এই জোতদারশ্রেণী দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এবং স্বভাবতই তারা আমাদের দেশের শাসকশ্রেণীরও ডানহাত। শ্রীরুদ্র এই শ্রেণীচরিত্রের সুন্দর ছবি এঁকেছেন।

বর্গাদারি প্রথা সম্বন্ধেও তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। অনেকে মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অর্থনীতির মূল স্তম্ভ হল বর্গাদারি। লেখক একথা স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, 'শতকরা ৩০ ভাগ বা তারও অনেক কম অংশে যে ব্যবস্থা কায়েম আছে তাকে নিশ্চয় কৃষিব্যবস্থার মূল স্তম্ভ বলে বর্ণনা করা যায় না।' আরও মুশকিল হল বর্গাদার কাদের বলা হবে? সেটাও লেখক ভাল করে বিশ্লেষণ করেছেন। ক্ষেতমজুর ও ভূমিসংস্কার প্রসঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে।

'পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের বিবর্তন' বিষয়ে লিখেছেন 'অন্য অর্থ' গোষ্ঠী। যাঁরা এই গোষ্ঠীকে জানেন, এই নামে পত্রিকা ও বিভিন্ন রচনা থেকে, তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে এঁদের বিশ্লেষণশক্তির স্বাতন্ত্র্য ও তীক্ষ্ণতা আছে। দৃষ্টিভঙ্গিটা মার্কসীয় হলেও তার মধ্যে গতানুগতিকতা নেই এবং অন্ধতাও নেই। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের গতি ও প্রকৃতির মধ্যে বেশ গভীরভাবে বোঝার মতো অনেক সমস্যা আছে এবং বহু সমস্যা যথেষ্ট জটিল। সেই সমস্যাগুলি তাঁরা একটি-একটি করে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন এবং যথাসম্ভব দুর্বোধ্য পাণ্ডিত্য এড়িয়ে সকলের কাছে সহজবোধ্য করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই সংকলনের পাঠকরা শ্রীঅশোক রুদ্রের কৃষি-অর্থনীতির স্বরূপ ব্যাখ্যার সঙ্গে শিল্পায়নের এই প্রবন্ধটি পাঠ করলে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সজাগ

বিনয় ঘোষ

পলাশী যুদ্ধের পরের প্রবহমানতা নিয়ে ব্রিটিশরা ১৯০ বছর ১ মাস ২২ দিন ধরে ভারতবর্ষের রক্তমোক্ষণ করে তার খণ্ডিত অংশকে ১৫ই অগস্ট ১৯৪৭ সালে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়ে তাঁদের ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন এদেশের নতুন শাসকগোষ্ঠীকে।

নতুন শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত স্বাধীনতার নামে যে সংকল্প-প্রস্তাবটি গ্রহণ করত তা নিচে উদ্‌ধৃত হল। পূর্ণ স্বাধীনতার এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ১৯২৯ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে। তারপর ১৯৩০ সাল থেকে পরাধীন ভারতবর্ষে ২৬ জানুয়ারি বিভিন্ন জনসভায় দেশের নেতারা স্বাধীনতার নামে এই প্রস্তাবটি পাঠ করে গ্রহণ করতেন :

"আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগলাভের জন্য অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মত ভারতবাসীরও স্বাধীনতা লাভ করবার, স্বীয় শ্রমার্জিত অর্থ ভোগ করার, এবং জীবনধারণের উপযোগী উপকরণ পাওয়ার অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদি কোন গভর্নমেণ্ট কোন জাতিকে এই সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং তাকে নির্যাতন করে, তবে সেই গভর্নমেণ্টকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করার অধিকারও সেই জাতির আছে। ভারত গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীকে শুধু স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত রেখেই বিরত হন নি, অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপরই আত্মপ্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাজনীতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্ম-সমুন্নতির সর্বনাশ করেছে। সুতরাং ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই, এটাই আমাদের বিশ্বাস।

"ভারতের অর্থ নৈতিক সর্বনাশ হয়েছে। আয়ের তুলনায় অত্যধিক পরিমিত রাজস্ব আমাদের দেশের লোকের কাছ থেকে আদায় করা হয়। আমাদের দৈনিক আয় গড়পড়তা সাত পয়সা মাত্র। আমরা যে শুধু করভার বহন করতে বাধ্য হই, তার শতকরা বিশ টাকা কৃষকদের কাছ থেকে ভূমি-কর হিসাবে এবং শতকরা তিন টাকা লবণ শুল্ক বাবদ আদায় করা হয়। এই শুল্কভারে দরিদ্র জনসাধারণ অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছে।

"সুতা-কাটা প্রভৃতি গ্রাম্যশিল্পের ধ্বংস সাধন করে তার পরিবর্তে অন্যান্য দেশের মত কোন নূতন শিল্পের প্রবর্তন করা হয় নি, ফলে দেশের কৃষক-সম্প্রদায়কে বৎসরে অন্তত চার মাস অলসভাবে সময় কাটাতে হয় এবং শিল্প-নৈপুণ্যের অভাবে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিও খর্ব হচ্ছে।

"বাণিজ্য-শুল্ক এবং মুদ্রানীতি এরূপ চতুরতার সঙ্গে পরিচালিত করা হচ্ছে যে তার ফলে কৃষকদের বোঝা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশের আমদানী পণ্যের মধ্যে অধিকাংশই ইংলণ্ডে প্রস্তুত। বাণিজ্য-শুল্ক ধার্য করার পদ্ধতি যে ব্রিটিশ শিল্পের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এবং এই শুল্কলব্ধ রাজস্ব দরিদ্রের দুঃখ নিরাকরণের জন্য ব্যয়িত না হয়ে ব্যয়বহুল শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। মুদ্রাবিনিময়নীতি আরও অধিক যথেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক; এর ফলে কোটি কোটি টাকা দেশ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।

"ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা যত হীন হয়েছে, এমন আর কখনও হয় নি। কোন প্রকার শাসন-সংস্কারই ভারতবাসীকে প্রকৃত রাজনৈতিক অধিকার দান করে নি। আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে পর্যন্ত বিদেশী শাসকগণের নিকট অবনত হতে হয়। আমরা স্বাধীন মত প্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে সঙ্ঘ-সমিতি গঠনের অধিকারে বঞ্চিত। আমাদের দেশের অনেককে নির্বাসিত অবস্থায় বিদেশে কাল কাটাতে হচ্ছে, তাঁরা স্বদেশে ফিরে আসতে পারেন না। শাসনকার্য পরিচালনার উপযোগী সমস্ত প্রতিভার বিলোপ সাধনের ফলে জনসাধারণকে শুধু কেরানীগিরি এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

"সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে বৈদেশিক শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের বিশিষ্ট ভাবধারা থেকে বিচ্যুত করেছে। ফলে যে শৃঙ্খল আমাদের দাসত্বের বন্ধনে বেঁধে রেখেছে সেই শৃঙ্খলকেই আদর করতে শিখেছি।

"বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ আমাদের নৈতিক সর্বনাশ করে আমাদের নির্বীর্য করে ফেলেছে। আমাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে নিষ্পেষণ করার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বিজাতীয় সৈন্যদলের উপস্থিতির মারাত্মক ফল এই হয়েছে যে, তাদের দেখে আমরা মনে করি যে বিদেশীয় আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে, এমন কি, চোর, ডাকাত, গুণ্ডা প্রভৃতির হাত থেকে নিজেদের গৃহ রক্ষা করতেও আমরা অসমর্থ।

"যে শাসন-পদ্ধতি আমাদের দেশের এই চার ধরনের সর্বনাশ সাধন করেছে, সেই শাসন-পদ্ধতির অধীনে আর মুহূর্তকাল বাস করা আমরা মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে মনে করি। একথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, হিংসাই স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃষ্টতম পন্থা নয়; সুতরাং আমরা ব্রিটিশের সঙ্গে সবরকম স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা যথাসাধ্য বর্জন করার জন্য প্রস্তুত হব এবং করপ্রদান বন্ধ ও অন্যান্য উপায়ে নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি অবলম্বন করার জন্য প্রস্তুত হব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, উত্তেজনার কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা যদি হিংসামূলক উপায় অবলম্বন না করে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা বর্জন করতে পারি এবং করপ্রদানে বিরত হই, তা হলে এই অমানুষিক শাসনতন্ত্রের অবসান সুনিশ্চিত।

"অতএব এতদ্দ্বারা আমরা শান্ত ও সংযত দৃঢ়তার সংকল্প গ্রহণ করছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস যখন যেমন নির্দেশ দেবেন আমরা সেই নির্দেশ ঐকান্তিকভাবে পালন করব। বন্দেমাতরম।"

১৫ই অগস্ট ১৯৪৭—স্বাধীন স্ব-তন্ত্র যুগের সূচনায় জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে নতুন শাসকরা যখন ক্ষমতায় বসলেন তাঁরা জাতিকে উপহার দিলেন প্রধানত দুটি জিনিস। এক, দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন যে নিশ্চলতার নাগপাশে জাতিকে বেঁধে রেখেছিল—তার থেকে মুক্তি দিয়ে এক নতুন জাতি গড়ে তুলবার প্রতিশ্রুতি। দুই, বর্ণিত-রঞ্জিত-শোভিত সংবিধান—যার মাধ্যমে তাঁরা প্রতিশ্রুত হলেন এই নতুন জাতি গড়ার কাজে—এই সংবিধানকে 'পথনির্দেশ' ধরে নিয়ে।

তাঁরা শুরু করলেন এইভাবে :

"WE THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN *SOCIALIST SECULAR* DEMOCRATIC REPUBLIC

and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political ;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship ;

EQUALITY of status and of opportunity ; and to promote among then all ;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity *and integrity* of the Nation.

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT., ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION."

The words in italics were inserted by the Constitution (42 Amendment) Act, 1976.

জাতীয় জীবনের ঐ সন্ধিক্ষণে নতুন যুগের প্রয়োজন সম্পর্কে মতান্তর ছিল না মানুষের। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি একচ্ছত্র একদলীয় শাসনব্যবস্থায় 'নিশ্চলতার নাগপাশ থেকে জাতিকে মুক্তি দিয়ে' কেমন ধরনের 'নতুন জাতি' গড়ে উঠেছে—তার মূল্যায়ন আজকে প্রয়োজন।

সত্যকে তত্ত্বের আড়ালে না ঢেকে আর প্রকৃত বাস্তবকে আশা দিয়ে অস্বীকার না করে এই মূল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সন্ধানের কথা অনেকেই ভাবছেন। বাস্তব জীবনই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দাবি করছে।

এই উত্তর সন্ধানের আগ্রহ থেকেই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পরস্পরসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই এই সংকলন—স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ।

প্রসঙ্গত, মনে রাখা দরকার—[১] এই সংকলনের আলোচনার প্রেক্ষাপট জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সমজাতীয় প্রশ্ন; কিন্তু পরিধি মূলত পশ্চিমবঙ্গ। স্বাভাবিক কারণেই আলোচ্য বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলি সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে।! [২] এবং, এখানে বিভিন্ন আলোচনায় বিশেষ কোন প্রশ্নের সরলীকৃত সমাধানে না গিয়ে বরং উত্থাপিত প্রশ্নটির মূল প্রকৃতি কী তা নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ আমরা মনে করি, কোন প্রশ্নের সমাধান সূত্র, প্রশ্নটির চরিত্র সঠিকভাবে বুঝবার উপরই অনেক বেশি নির্ভরশীল। [৩] আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রেই সমস্ত প্রশ্নকে তুলে ধরতে পারা যায় নি—এর পরিধির স্বল্পতার জন্য। এ বিষয়ে আমরা সচেতন। পরবর্তী প্রয়াসে এই দিকে আরো বেশি নজর অবশ্যই দেওয়া হবে। [৪] সংকলিত লেখাগুলি আমরা পেয়েছি বিভিন্ন সময়ে, এই সময়ের ব্যবধান—১ জুন ১৯৭৯ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৯। বিনয় ঘোষের লেখাটি পেয়েছি ২৯.২.৮০ তারিখে।

কমলেন্দু ধর

শতবর্ষ পূর্বের বাঙালী

বাঙ্গালীর দারিদ্র্য। ৯ ভাদ্র ১২৯২। সোমপ্রকাশ

* কোন জাতির দারিদ্র্য বলিতে মোটামুটি আমরা সেই জাতির ধনাভাব বুঝি। ধন কাহাকে বলে? স্বর্ণ রৌপ্যের মুদ্রা বিশেষকে কি ধন বলে? না, কেবল বিনিময়ের সুবিধার জন্য মুদ্রা, গবর্ণমেণ্ট নোট প্রভৃতির সৃষ্টি। কোন জাতির জীবন ধারণোপযোগী ও সাংসারিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ সমূহকে এবং সেই সকল পদার্থ উৎপাদন ও প্রস্তুত করণোপযোগী উপকরণ সমূহকে জাতীয় ধন বলে, অতএব জাতীয় দারিদ্র্য বা ধনাভাব বলিলে প্রকৃতপক্ষে মুদ্রার অভাব বুঝায় না। জাতীয় জীবন রক্ষণোপযোগী দ্রব্য সমূহের অভাব বুঝায়। তবে সাধারণ ভাবে মুদ্রাকেই লোকে ধন বলে; কারণ বিনিময়াত্মক থাকিলেই প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়, সেইজন্য মুদ্রা ও ধন একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের বিষয় আলোচনা করা এ-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির কয় প্রকার উপজীবিকা আছে, কি কারণে সেই সকল উপজীবিকার ব্যাঘাত বা অভাব হইতেছে, তাহাই অগ্রে দেখা কর্তব্য। ঐরূপ ভাবে আলোচনা করিলে বাঙ্গালীর প্রকৃত দারিদ্র্যের কারণ নির্ণীত হইবে। কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন—জাতীয় দারিদ্র্যের বিষয় সাধারণভাবে আলোচনা করিলেই বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের হেতু বুঝা যাইত। বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে এই বলি, বাঙ্গালী পরাধীন জাতি; বঙ্গদেশের প্রকৃতি ও বাঙ্গালীর স্বভাব সামর্থ্য, আচার ব্যবহার ধর্ম ইত্যাদি ভেদে, উপজীবিকার প্রভেদ আছে। সুতরাং অন্য ধর্মাবলম্বী স্বাধীন জাতির সহিত বাঙ্গালীর জাতীয় দারিদ্র্যের হেতু সমূহের অনেক স্থলে মিল নাই। এ সমস্ত বিষয় করিয়া বুঝাইতেছি।

---

* 'সোমপ্রকাশ' উনিশ শতকের বিখ্যাত পত্রিকা, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। ১২৯২ সনে, অর্থাৎ প্রায় শতবর্ষ পূর্বে, বাঙালীর সামাজিক চরিত্রের যে-বিশ্লেষণ 'সোমপ্রকাশ' করেছেন, তার অনেকটা আজকের দিনেও প্রযোজ্য বলে মনে হয়। সেইজন্য এই রচনাটি দিয়ে, পূর্বসূরীদের দূরদৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, এই সংকলন আরম্ভ করা হল। —বিনয় ঘোষ

সর্বাগ্রে বাঙ্গালীর উপজীবিকা বিভাগ করা যাইতেছে।

১ম। সামান্ত ব্যবসা বাণিজ্য; এই শ্রেণীতে আড়তদার গোলাদার দোকানদার হইতে সামান্ত মুদি ও ফেরিওয়ালা পর্যন্ত এবং যাহারা নগদ টাকা ও ধান্য ইত্যাদির তেজারত করে, সে সমস্তই বুঝিতে হইবে। কারণ ইহারা সকলেই একটা মূলধন লইয়া লাভ লোকসানের দায়িত্ব স্বীকারে জীবিকা অর্জন করে।

২য়। ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ; এই বিভাগে জমিদার পত্তনিদার, তালুকদার, জোতদার. গাঁতিদার, বৃত্তি ব্রহ্মোত্তর ভোগী ও কৃষক শ্রেণী বুঝিতে হইবে। কারণ ঐ সকল সম্প্রদায় ভূমির উপস্বত্ব ভোগ দখল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

৩য়। দৈহিক ও মানসিক শ্রম বিক্রয় অথবা চাকুরি, হাইকোর্টের জজ হইতে সামান্য মুটে মজুর, চা বাগান অথবা রেলওয়ে প্রভৃতিতে নিযুক্ত কুলি ইত্যাদি সকলকেই বুঝিতে হইবে। উকীল. মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতিও এই শ্রেণীভুক্ত। কারণ উহারা সকলেই অপরের কার্য উপকার সাধন অথবা অভাব মোচন জন্য নিরূপিত মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক বা উপস্থিত বেতন গ্রহণে নিয়োগকর্তার রুচি অনুসারে শ্রম বিক্রয় করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন ও সাংসারিক অভাব দূর করে।

৪র্থ। জাতীয় ব্যবসাযোগে জীবিকা-শিল্পী. ইহাতে পুরোহিত, ধোপা, নাপিত, তন্তুবায়, কর্মকার, সূত্রধর, কাংসকার, গন্ধ ও সুবর্ণ-বণিক প্রভৃতি বুঝায়। কারণ উহারা প্রাচীনকাল হইতে কার্য ব্যবসায়ভেদে সেই জাতি বা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, সেই হেতু পুরাকালপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় কার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

৫ম। তোষামোদ, ভিক্ষা ও উঞ্ছবৃত্তি চাটুকার, পরভোগোপজীবী, ভিক্ষুক, পরমুখাপেক্ষী, উঞ্ছবৃত্তিধারী, পরতেজ্যবস্তু সংগ্রহ করিয়া দিনপাত করে। নিতান্ত অক্ষমতায়, ধর্মের জন্য অথবা আলস্য পরবশ হইয়া অনেকে ঐরূপ ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করে।

জীবিকা নির্বাহ জন্য অধুনা আরও কয়েকটি পন্থা অবলম্বিত হইতেছে। পুরাকালে হিন্দুজাতির মধ্যে এরূপ কুপ্রবৃত্তিমূলক জঘন্য বৃত্তি অবলম্বিত হইত, এরূপ বোধ হয় না।

৬ষ্ঠ। আত্মবিক্রয় অথবা ধর্মবিক্রয়, বেশ্যাবৃত্তি, বিবাহের কন্যা বিক্রয় ও

বি-এ, এম-এ পাশযুক্ত পুত্রের প্রভূত পণ গ্রহণ, শিষ্যের নিকট গুরুর অর্থ গ্রহণ ; এ সকল বৃত্তি প্রাচীন সমাজে বড প্রচলিত ছিল না। হিন্দু শাস্ত্রে ঐরূপ বৃত্তি অবলম্বনে বিশেষ নিষেধ আছে ও ঘোর অধর্ম বলিয়া দণ্ডের বিধান আছে।

৭ম। প্রতিভা বিক্রয় : এই বিভাগে প্রতিভাসম্ভূত কাব্য নাটক নভেল বিক্রয়, বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র অথবা উপদেশপূর্ণ কোনরূপ সাময়িক পত্রাদি বিক্রয় দ্বারা আবিষ্কর্তা, প্রণেতা রচয়িতা যে স্বত্ব ভোগ করেন, সেই স্বত্বাধিকারিগণকে প্রতিভাবিক্রেতা বলা যায়। পুরাকালে এ প্রথাটি প্রচলিত ছিল না। ঐ সকল বৃত্তি ব্যতীত চৌর্য, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বৃত্তি কেহ কেহ অবলম্বন করেন। কিন্তু সাধারণ বা প্রকাশ্যবৃত্তি নহে বলিয়া উহাকে বৃত্তি মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে উল্লিখিত উপজীবিকা বিভাগের ব্যাঘাত সংঘটন কিভাবে হইতেছে, তাহাই দেখান যাইতেছে।

প্রথমতঃ, আমাদেব দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য আছে, কিন্তু সামান্য পরিমাণে। বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই ধনাগমেব প্রধান উপায়। কিন্তু সেরূপ বাণিজ্য বা সওদাগবি আমাদেব দেশে নাই। ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন দেশীয় লোকের হস্তে ঐরূপ বাণিজ্য একচেটে হইয়া বহিয়াছে। সেই জন্য এদেশজাত দ্রব্যাদি অন্য দেশে রপ্তানি করিয়া ও ভিন্ন দেশের দ্রব্যাদি এই দেশে আমদানি কবিয়া প্রভূত লাভ করিতেছে। আমাদের দেশে যে শ্রেণীব লোকে ব্যবসায় করে, তাহাবা লাভাংশ সামান্য পরিমাণে পায়। আজকাল আবার তাহাতে প্রতিযোগিতাও বিস্তর হইয়াছে। এক দ্রব্যের প্রয়োজনে অতিরিক্ত ব্যবসাদার হইয়াছে। সুতরাং যাহা কিছু লাভাংশ তাহাও শত শত সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া কাহারো অভাব বিদূরিত হয় না। তবে ঐ উপায় অবলম্বনে সামান্য সামান্য সংখ্যক লোকের উন্নতি দেখা যায়, যে উন্নতি ব্যক্তিগত, জাতীয় উন্নতি নহে। বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানির ও রপ্তানির হরণ পূরণ হইয়া যে পরিমাণ দ্রব্য বেশী রপ্তানি হয় সেই পরিমাণ জাতীয় ধনের ক্ষয় হয় ও ক্রমে লোক দরিদ্র হয়। আবার ঐ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভূত লাভাংশ বিদেশেই সঞ্চিত ও ব্যবহৃত হয়, সুতরাং এদেশের তাহাতে কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতি আছে।

দ্বিতীয়তঃ, জমিদার, তালুকদার, পত্তনীদার প্রভৃতি যাহারা উক্ত শ্রেণীর ভূস্বত্বাধিকারী, তাঁহাদেরও অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছে। কৃষক শ্রেণী বা প্রজা

স্বচ্ছল থাকিলে জমিদারের লাভাংশ পাইতে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অধুনা কৃষক শ্রেণীর বড় শোচনীয় অবস্থা। মধ্যে মধ্যে অজন্মাহেতু ইহারা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই অজন্মা ভূস্বত্বাধিকারীদিগের উপজীবিকার প্রধান প্রতিবন্ধক। এই অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা বশতঃ হয়। সে বৎসর দেশের যে কতদূর ধনক্ষয় হয় তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এইরূপ ধনক্ষয় আজকাল ভারতের কোন না কোন প্রদেশে প্রতি বৎসরই ঘটিতেছে। এইরূপ দুর্ঘটনায় কৃষক শ্রেণীর এত অপ্রতুল যে কাল কি খাইবে, এমন খাদ্যও ঘরে সঞ্চয় করিতে পারে না। এক এক জন কৃষক ভূমিকর্ষণ দ্বারা যাহা উৎপন্ন করে, তাহাতে তাহার পারিবারিক জীবিকা-নির্বাহ ও অভাব মোচন হইয়া কিছুই সঞ্চয় থাকে না। বরং অনেকস্থলে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় হয়, স্থতরাং মহাজনের বা জমিদারের নিকট দেনাদার হয়। ইহার উপর যদি অজন্মা হইল তবে আগামী পাঁচ বৎসরেও বহু চেষ্টায় নিজ অবস্থার সংশোধন করিতে পারে না। ক্রমে তাহাদের হাল গরু জমি বিক্রয় হইয়া যায়, দুর্দশার চরমসীমায় উপস্থিত হয়। এদেশের পক্ষে কৃষকই যথার্থ ধনউৎপাদক। সে শ্রেণীর এরূপ দুর্দশা হইলে, দেশেরও দুর্দশা, উপস্থিত জমিদার, তালুকদারেরও দুর্দশা। ইহার উপরে আবার গবর্ণমেণ্টের আইন কানুনের উপসর্গে এই দারিদ্র্যরোগ আরও বর্ধিত হয়। সে সমস্ত কথা দারিদ্র্য উপসর্গ বিভাগে বলিব। বৈজ্ঞানিক শিল্পপ্রধান দেশে এরূপ দুর্দশা ঘটে না। কারণ বৈজ্ঞানিক ও কল কারখানার কার্যের উপর প্রাকৃতিক বা দৈব ঘটনার আধিপত্য নাই। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হউক, তাহাতে মেসিনারির বল ও কার্য সমান ভাবেই হইতে থাকে। সেই জন্য শিল্পপ্রধান দেশ ধনী এবং কৃষকপ্রধান দেশ দরিদ্র।

তৃতীয়তঃ, শ্রমবিক্রয় অর্থাৎ চাকুরি কিম্বা মুটে মজুরিতে অনেকে অনেকটা স্থবিধা বিবেচনা করেন কিন্তু ঐ কার্যে এত লোকের প্রবৃত্তি হইয়াছে, চাকুরির জন্য লোক লালায়িত যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রার্থী হইয়াছে স্থতরাং চাকুরির বাজার সস্তা হইয়াছে। শ্রমবিক্রয়ে এক্ষণে যে অর্থ মিলে তাহাতে দারিদ্র্য কিছুমাত্র অন্তর্হিত হয় না। আবার শ্রমবিক্রয়ের উৎকৃষ্টাংশ রাজপুরুষ বা রাজানুগৃহীতের একচেটে। তাঁহাদের যোগ্যতা বা শ্রম যে মূল্যে দেশীয় ধন দ্বারা ক্রীত হয়, তদপেক্ষা অল্পমূল্যে দেশীয় যোগ্যতা ও শ্রম পাওয়া যাইতে পারে। আবার তাঁহাদের সঞ্চিত ধনের ও পেন্সনের অধিকাংশই বিদেশে

চলিয়া যায় ও তথায় ব্যয়িত হয়, দেশীয়ের সঞ্চিত ধন পেন্সন দেশেই থাকে।

চতুর্থতঃ, জাতীয় ব্যবসায়ী অথবা শিল্পী, এই বিভাগের অনেক শ্রেণীরই অন্ন মারা গিয়াছে। আমাদের দেশে কোনরূপ শিল্পকার্যের উন্নতি কোন কালে ছিল না বা এখনও নাই। কল কৌশলে শিল্পকার্য হইলে সুন্দর অথচ সুলভ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এদেশে সেরূপ কল বল কোন কালে ছিল না, এখনও নাই। ইউরোপীয় কল কৌশল নিষ্পন্ন দ্রব্যাদির সংঘর্ষণে, এদেশের জাতীয় ব্যবসায় অথবা শিল্পী শ্রেণী একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। যে সকল দ্রব্য বিলাত হইতে আমদানি হয় না, সামান্যাকারে সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত ও বাজারে বিক্রয় হয়। ইহাতে দেশের দারিদ্র্য ভঞ্জনের কোন কারণ নাই। বরং বিদেশীয়ের হস্তে শিল্পকার্য ন্যস্ত থাকায়, তদুৎপন্ন প্রচুর লাভ তাহারা বিদেশে বসিয়া উপভোগ করে।

পঞ্চম শ্রেণীর উপজীবিকার কথা আর কি বলিব? দরিদ্রের নিকট ভিক্ষুকেরও প্রত্যাশা নাই, চাটুকারেরও আদর নাই, উঞ্ছবৃত্তিরও উপায় নাই।

ষষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত উপজীবিগণ নিতান্ত ঘৃণ্য। তাহারা সমাজের অব্যবহার্য জীব তবে তাহাদেরও যে নিতান্ত দীন দশা, তাহা তাহাদের ভিত্তিতেই পরিচয় দেয়।

সপ্তম শ্রেণীব উপজীবিকা যদিও পূর্বকালে হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু এইরূপ বৃত্তি অবলম্বনে কোন দোষ দেখা যায় না বরং প্রার্থনীয় বলা যাইতে পারে। এইরূপ শ্রেণীর লোকসংখ্যাও এত অল্প যে উহাকে উপজীবিকা বিভাগে না ধরিলেও হানি ছিল না। যাঁহারা আছেন তাঁহাদের অবস্থাও ভাল নহে। কারণ কুরুচি আসিয়া সুরুচিকে তাড়াইয়া দিতেছে।

বাঙ্গালীর উপজীবিকা বিভাগ ও প্রত্যেক বিভাগের ব্যাঘাত ও অসুবিধার বিষয় বলা হইল। এতাদ্দ্বারা বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের কারণ অনেকটা অনুমিত হইবে। উহা ব্যতীত বাঙ্গালীর দারিদ্র্য রোগের আরও কয়েকটি ভয়ানক উপসর্গ আছে, যদ্দ্বারা দারিদ্র্য ব্যাধি আরও জড়িত ও বর্ধিত হয়। সেই সকল উপসর্গের কথা এক্ষণে বলিব।

১ম। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও স্বদেশপ্রিয়তা। সেন্সসে দেখা যায় বঙ্গদেশে ক্রমেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। বঙ্গদেশে যে পরিমাণ ধনোৎপত্তি হয় ও ধনোৎপত্তি হইবার যে সকল উপায় আছে, তদতিরিক্ত লোকসংখ্যা হইলে কোন

মতে জীবিকার সঙ্কুলান হয় না। ইহার উপর আবার বিদেশীয়েরা ও বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সেই ক্লেশার্জিত অনটন ধনের অংশ দ্বারা পরিতুষ্ট হন। এস্থলে আমরা নবজীবন সম্পাদক কথিত ধর্মব্যথার বশবর্তী হই। যথা—"আপনি খাইতে পাই না, রাজপুরুষদিগকে চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্বিধ আহার দিতেই হইবে। সুতরাং এই অসাধ্য, অস্বাভাবিক ধর্মের জ্বালায় বাঙ্গালী দিন দিন দরিদ্র হইতেছে। আবার স্বদেশপ্রিয়তা হেতু বাঙ্গালী অন্য দেশে যাইয়া ও তথায় বাস করিয়া তদ্দেশজাত ধনে প্রতিপালিত হইতে আদৌ ইচ্ছা করে না। ইহারা পরের গ্রাসে ভাগ লইতে জানে না। জন্মভূমি ইহাদের নিকট স্বর্গ হইতেও গরীয়সী। বাঙ্গালী ঘরে পড়িয়া অনাহারে মরিবে, তথাপি বাহিরে যাইয়া আহারান্বেষণ করিবে না। সুতরাং বাঙ্গালীর উল্লিখিত প্রবৃত্তিদ্বয় দারিদ্র্য ব্যাধির ঘোর উপসর্গ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২য়। আমাদের সামাজিক রীতি নীতি, আচার ব্যবহার আমাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। বাঙ্গালীর বিবাহপ্রিয়তা বা বাধ্যতা বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের প্রধান সহায়। অনুপযুক্ত ও বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ, বিবাহ-প্রিয়তা বা বাধ্যতা হেতু সংঘটিত হয়। ঐ হেতু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও কত অর্থপাত হয়।

৩য়। কৌলীন্য প্রথা ; এই প্রথা হইতে বিবাহে পুত্র কন্যার পণগ্রহণের নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে এবং ঐ অনুকরণে ব্রহ্মোণেতর জাতির মধ্যেও ঐ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক পরিবারকে দারিদ্র্য ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। এই সামাজিক নিয়মে বাধ্য হইয়া অনেককে প্রভূত ব্যয় স্বীকার করিতে হয়, দুরপনেয় ঋণপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়, এমন কি অনেক সময়ে ভিক্ষাবৃত্তিও অবলম্বন করিতে হয়। আবার এইরূপ কৌলীন্য প্রথায় একদিকে 'অনুপযুক্ত, বাল্য ও বহুবিবাহের প্রশ্রয় পায়, অন্যদিকে বংশজ অথবা শ্রোত্রীয়দিগের আদৌ বিবাহ হয় না। যদি হইল, তবে একটি বিবাহের উচ্চপণে দরিদ্র হইয়া পড়িতে হয়। একটি ১৬।১৭ বৎসরের বালককে পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণ পূর্বক একটি আঠার মাসের কন্যাকে তিন শত টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিতে দেখিয়াছি। এইটি কন্যার উচ্চপণ ও বাঙ্গালীর বিবাহপ্রিয়তার চরম উদাহরণ। এ প্রথাগুলিকে অত্যন্ত অবনতিব্যঞ্জক বলিতে হয়।

৪র্থ। একান্নবর্তিতা। বহু পরিবারের এক অন্নে থাকা, বঙ্গীয় সমাজের চির প্রচলিত এই প্রথায়ও দারিদ্র্য আনয়ন করে। ভাবুন, একটি পরিবারে

একজন উপায়ক্ষম আছেন। সে উপার্জন করিতে আরম্ভ করিলে চতুর্দিক হইতে দূর সম্বন্ধীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব আসিয়া তাহার গলগ্রহ হইল। তাহারা নিষ্কর্মা হইয়া একজনের উপার্জিত অর্থে উদর পোষণ করিতে লাগিল। সুতরাং উপার্জনকারীর কিছুমাত্র সংস্থান হইল না, অথচ আলস্য পরবশ জ্ঞাতি কুটুম্বগণ ও সমাজের অকর্মণ্য জীব হইয়া কেবল ধনক্ষয় করিতে লাগিল, সামাজিক নিয়মে বাধ্য হইয়া, তুমি তোমার কন্যাকে বা ভগ্নীকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিতে পারিলে না, কারণ সে তোমার সমান বংশের লোক নহে। কাজেই এক অযোগ্য পাত্রে বিবাহ দিতে বাধ্য হইল। সে ব্যক্তির কিছুমাত্র সংস্থান বা ক্ষমতা নাই। সুতরাং তোমাকে ভগ্নিপতি অথবা জামাতাকে পর্যন্ত প্রতিপালন করিতে হইল। আবার তাহাদের পুত্র, কন্যা পর্যন্ত প্রতিপালন করিতে ও বিবাহাদি দিতে হইল। ক্রমে তোমার পরিবার রাবণের পরিবারের ন্যায় আকার ধারণ করিল। আবার তোমার ভগ্নি বা কন্যা যদি বিধবা হইল, তুমি তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিতে পারিলে না। সুতরাং চিরদিনের জন্য তাহারা তোমার গলগ্রহ হইল। ঐরূপ ভাবের নারীকে কুপোষ্য বলে। বঙ্গীয় সমাজে এইরূপ কত কুপোষ্য একজনের পোষ্য হইয়া তাহার সর্বনাশ উপস্থিত করে, ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই অবিদিত নাই।

৫ম। ধর্মাদেশে কতকগুলি কার্য বাধ্য হইয়া করিতে হয়। যথা—পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ, ঠাকুর সেবা উৎসব ও পার্বণ ইত্যাদি। ক্ষমতা স্বত্বে একর্মগুলি করা কর্তব্য। অক্ষমতা স্থলে বাধ্য হইয়া করিলে ব্যক্তিগত দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয়। তবে একটি কথা আমাদের দেশে ধনীর হস্ত হইতে যে ভাবে অর্থটা সাধারণের হস্তে যায়, সেভাব বা নিয়মটা স্থায়ী নহে। বিবেচনা করুন একস্থানে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি বারইয়ারি পূজা হইল। যাত্রা, মহোৎসব, নাচ, তামাসা, সাজ সরঞ্জাম, ঠাকুর গঠন প্রভৃতিতে সেই ৫০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইল, অর্থাৎ ধনীর হস্ত হইতে সে টাকাটা দশজনের হস্তে পড়িল। বারইয়ারির পর দিবসে সে অর্থ ব্যয়ের চিহ্নও থাকিল না। কিন্তু ভাবুন দেখি, এই বঙ্গদেশে শুদ্ধ বারইয়ারি উপলক্ষ্যে এক বৎসরে যে টাকাটা ব্যয় হয়, সেই অর্থ দ্বারা যদি পাঁচটা উচ্চদরের কারখানা খোলা যায়, তবে তাহাতে কত লোক কত দিনের জন্য প্রতিপালিত হইতে পারে। আমাদের দেশে ক্রিয়া কর্মে যাগ যজ্ঞে ও মহোৎসবে অধিক টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু ইহাতে সাধারণকে আলস্য পরবশ করে। কিন্তু অতিথিশালা স্থাপন করিলেন বা অন্নসত্র দিলেন,

কতকগুলি লোক তথায় পরপিণ্ডে পেট পুরিয়া আলস্য ও পাপের আশ্রয় দিতে লাগিল ও অকর্মণ্য হইয়া সমাজের অব্যবহার্য জীব হইতে চলিল। ধনীর ধন বিতরণের এরূপ পন্থা প্রশস্ত নহে। ইহাতে দারিদ্র্য আনয়ন করে।

৬ষ্ঠ। বংশগত মর্যাদা ও শাস্ত্রোক্ত নিষেধ: কোন জমিদার সন্তানের প্রপিতামহ সুপ্রসিদ্ধ মান্যগণ্য জমিদার ছিলেন। তাঁহার বার্ষিক আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল, দেশহিতকর কার্যে অর্থব্যয় করায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজোপাধি দিয়াছিলেন। তিনি পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঞ্চিত সম্পত্তি পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে বিভক্ত হইল। আবার তাঁহাদিগের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় চারি পুরুষের মধ্যে ঐ-সম্পত্তি কড়ায় গণ্ডায় ভাগ হইল। বর্তমান জমিদার বা রাজসন্তান নয় গণ্ডা তিন কড়ার মালিক; তাহাতে যে আয় হয়, তদ্দারা সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হয় না। জমিদার সন্তানের যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি আছে, পরের দ্বারস্থ হইলে মাসিক একশত টাকা বেতন পাইতে পারেন। যে জমিদারের দ্বারস্থ হইতে হইবে, তিনি হীনবংশ। সুতরাং নয় গণ্ডা তিন কড়ার জমিদার বংশের মর্যাদা হেতু, হীন বংশীয়ের চাকুরি স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রপিতামহ রাজা ছিলেন, এই অভিমানে ফাটিয়া ঘরে পড়িয়া উপবাস করিতে লাগিলেন ক্রমে বৃথা অভিমানে, চিন্তায়, দারিদ্র্যতায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন এবং তাঁহা হইতেও দরিদ্র কতকগুলি অপগণ্ড শিশুসন্তান বিধবা স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতি সাত আটজনকে দুস্তর সংসার সাগরে নিরবলম্বনে ভাসাইয়া গেলেন। ইহাকে বলে বংশগত অভিমানের অত্যাচার।

এক্ষণে শাস্ত্রোক্ত নিষেধের কথা বলিতেছি। তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, তুমি স্বহস্তে হলচালন করিতে, যবন বা ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতে পারিবে না। সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রোক্ত নিষেধ মানিলে, ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ব্রাহ্মণেতর জাতির সম্বন্ধেও অনেক প্রকার নিষেধ আছে। সে সকলের বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। মনু প্রভৃতির সংহিতা পাঠে পাঠক জানিতে পারিবেন। সুখের বিষয় যে, অধুনা অনেকে ঐ সকল সংহিতার নিষেধ বিধি মানেন না। তথাপি যেটুকু পালন করেন, তাহাতে অবনতির আশঙ্কা আছে।

৭ম। জাতিভেদ ও কর্মভেদ জাতীয় অবনতির দুইটির প্রধান সহায়। জাতি ও কর্মভেদে পরস্পরের সহিত ঐক্য থাকে না, কোন সভা সমিতি সংগঠিত হয়

না। কেহ কাহারো জন্য চিন্তা করে না, সহানুভূতিও থাকে না। কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না। কোন সাধারণে দেশহিতকার্যে সকলে একত্র হইয়া বদ্ধপরিকর হয় না। দুরূহ কার্যে একাগ্রতা ও একতার বলপ্রয়োগ আবশ্যক হইলে, তাহা পাওয়া যায় না। তখন কেহ উজান কেহ বা ভাটা বাহিতে আরম্ভ করে, কেমন চাঁ ভাঁ লাগিয়া যায়। ইহার উদাহরণ আজকাল বিরল নহে। পাঠক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। এরূপ অবস্থা, জাতীয় উন্নতির ও ধন বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়।

৮ম। শিক্ষা বিভ্রাট: এক্ষণে বেতারের শিক্ষা হইতেছে, তাহাতে কার্যক্ষম হওয়া যায় না। নানা প্রকার শিল্প কৌশল বিজ্ঞান প্রভৃতি অর্থকরী ও কার্যকরী শিক্ষা, এদেশে নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। যে ভাবের শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে কেবল শূন্যে কেল্লা নির্মাণের বৃদ্ধি হয়, বচনে খৈ ফুটাইবার ক্ষমতা হয়, শিমুল ফুলের মত অল্প বাতাসে ফাটিয়া চাটিয়া দেশময় হওয়ার সুবিধা হয়, এরূপ নিষ্ফল শিক্ষায় দারিদ্র্য ও দুঃখের স্রোত প্রবলবেগে বহিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

৯ম। কার্যক্ষেত্রের অভাব: যাহার যেরূপ শিক্ষা ও পারদর্শিতা, তাহার জন্য সেইরূপ কার্যক্ষেত্র আবশ্যক। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। কতক পরিমাণে শিক্ষাও হইতেছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ সেইজন্য অনেক লোক উপযুক্ত কার্যাভাবে ভয়ানক দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করে। রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, চা বাগানে, সওদাগরের বাটীতে অনেক লোক প্রতিপালন হয়। বিদেশীয় বণিকদিগকে আশীর্বাদ করি। তাঁহাদের দ্বারে খাটিয়া বিস্তর লোক জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। দেশীয় ধনী গুণপুরুষ-দিগের এ সকল বিষয়ে আদৌ দৃষ্টি নাই। দেশের কিসে উন্নতি হয়, অবনতি হয়, দারিদ্র্য দূর হয়, এরূপ চিন্তায় কোনদিন কোন মুহূর্তের জন্যও তাঁহাদের অসাড় মস্তিষ্ক আলোড়িত হয় না। যদি আজ বিদেশীয় বণিকগণ তাহাদের কাজ কারবার কল কারখানা ভারত হইতে উঠাইয়া লয়, তবে এই অগণ্য দরিদ্র ভারতবাসীর দশা কতদূর শোচনীয় হয়, তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সেইজন্য এই বলি, কেবল বিদেশীয়ের মুখাপেক্ষী ও বিদেশীয়ের ভাগ্যোপজীবী হইলে দেশের দারিদ্র্যতা কখনও ঘুচে না।

১০ম। গবর্ণমেণ্টের বিদেশপ্রিয়তা, বিজাতীয়তা ও ধর্মান্ধতা—গবর্ণমেণ্টের এই তিনটি গুণ দেশীয় দারিদ্র্য ভয়ানক দুশ্চিকিৎসা উপসর্গ। গবর্ণমেণ্টের

এই গুণত্রয়ে শুদ্ধ বঙ্গদেশ কেন, সমস্ত ভারতে কতদূর অমঙ্গল, অবনতি ও অনর্থপাত হইতেছে, তাহাই বলিতেছি। দেশীয় ধনবৃদ্ধি, উন্নতি অথবা অবনতি সম্বন্ধে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ততদূর দৃষ্টি থাকে না। দেশীয় প্রজার উপর সহানুভূতি জন্মে না। সকলেই জানেন, গত বৎসর হইতে বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে দুভিক্ষ বা অন্ন কষ্ট হইয়াছে। মনে করুন—ঐ স্থানে গবর্ণমেণ্টের ত্রিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। ভূমিতে কিছুমাত্র শস্যোৎপত্তি বা ধনোৎপত্তি হয় নাই। প্রজারা জমিদারকে এক কপর্দকও কর দিতে পারিল না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিরূপিত দিনে অন্যায় আইন জারি দ্বারা জমিদারের নিকট হইতে নিজ প্রাপ্য রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিলেন। এটি ঘোর অবিচার। প্রজা হইতে রাজা পর্যন্ত সকলেই ভূমির উৎপত্তি অংশই উপভোগ করেন। যখন ভূমিতেই কিছুমাত্র উৎপন্ন হইল না, তখন কাহারো রাজস্ব পাওয়া উচিত নহে। কিন্তু রাজার বিদেশীয়তা ও বিজাতীয়তা হেতু প্রজার উপর সহানুভূতি না থাকায় তিনি অন্যায়রূপে ঐ ত্রিশ লক্ষ টাকা লইলেন। আবার ভাবুন, ঐ অন্যায় অর্জিত অর্থ গবর্ণমেণ্ট বিলাতি আমলাবর্গের বেতন দেওয়ার জন্য তথায় পাঠাইলেন কিংবা রুশের সহিত যুদ্ধের আশঙ্কায় আমীরকে উপহার দিলেন, তাহা হইলে ঐ-টাকাটা সাত সমুদ্র তের নদী পারে যাইয়া সঞ্চিত বা ব্যয়িত হইল: এদেশে ব্যবহৃত হইল না। সুতরাং জাতীয় ধনের ক্ষয় হইল।

সন্ধিক্ষণের মানুষ। পরিবর্তনশীল পশ্চিমবঙ্গ

বিনয় ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট শ্মশানঘাট পর্যন্ত পৌঁছেচে। ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ কালীঘাটে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটের কর্মীদের ধর্মঘটের ফলে শবযাত্রীদেব মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যেতে হয় অন্য শ্মশানে। দুর্ভোগের একশেষ। কারণ দরিদ্রদের মৃতদেহ বহন করার জন্য লোক-জোটানোই এক সমস্যা, তার উপর সৎকারের খরচ ১৯৬০-এর দশকে যা ছিল তাব চেয়ে প্রায় তিনচারগুণ বেড়েছে। কাজেই এক শ্মশানে পৌঁছে আবার যদি ধর্মঘটেব জন্য অন্য শ্মশানে যেতে হয়, তাহলে দরিদ্রের শববাহকদের অতিরিক্ত মজুরির সমস্যা তো থাকেই এবং সৎকারের সংকটও দেখা দেয়। কলকাতা নেহাৎ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী-শহর বলে শবদেহ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত অথবা মাটিতে প্রোথিত হতে পারে না, গ্রাম্য শ্মশান হলে নিঃসন্দেহে হত। গ্রামের শ্মশান এবং শহরের শ্মশানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, যেমন আছে গ্রাম্য সমাজের সঙ্গে শহুরে সমাজের, এবং পশ্চিমবঙ্গেও। যদিও রাস্তাঘাটের, যানবাহনের, বৈদ্যুতিক ট্রেনের প্রসারের জন্য শহর-গ্রামের ব্যবধান নানাদিক থেকে কমে যাচ্ছে এবং গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ রেডিও টিভি ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছে, তাহলেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও শহরের মধ্যে আজও, ১৯৮০ সালেও, পার্থক্য আছে বিস্তর।

যেমন গ্রামের অর্থপিশাচ সুদখোর মহাজনকে দেখলে আজও চেনা যায় এবং বোঝা যায় শহরের মহাজনদের সঙ্গে তার পার্থক্য কত। সুদের পার্থক্য নয়, চেহারার ও চালচলনের পার্থক্য। কেবল আগেকার গ্রাম্যসমাজে মহাজনরা ছিল মার্কামারা, আজকের গ্রাম্যসমাজে তারা নানারঙের মুখোস পরে থাকে, রাজনীতির মুখোস, ধর্মের মুখোস, গ্রামসেবক-সংস্কারকের

মুখোস। চোরাকারবারী স্মাগলার সকলেই একরকমের। গ্রীল দিয়ে আঁটা সিমেন্ট-ইট-কংক্রীটের বাড়ি গ্রামেও অনেক হয়েছে, কেবল শহরের কাছাকাছি গ্রামে নয়, শহর থেকে অনেক দূরের গ্রামেও হয়েছে। চারিদিকের পাতাঘর টালিঘরের মধ্যে একটা-দুটো পাকাবাড়ি দেখলেই বোঝা যায় ভাগ্যবান বাড়ির মালিক লটারিতে জিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লটারিতে নয়, ভাগ্যচক্রের লটারিতে। ভাগ্যচক্রটা গ্রহ-উপগ্রহের চক্র নয়, রাজনৈতিক পার্টির চক্র। যে পার্টির 'বৃহস্পতি' যখন তুঙ্গে, সেই পার্টির মৈ ধরে কোনরকমে ভিড় ঠেলে সে কয়েক ধাপ উপরে উঠে পড়েছে। তাই আজ গ্রামের মধ্যে তার দোতালা পাকাবাড়ি তৈরি হয়, তার ছেলেমেয়েরা মিনি-ম্যাক্সি-বেলবটম্ পরে, তার সহধর্মিণী সিন্‌থেটিক চকমকে শাড়ি পরে সিনেমাতে যায়। তথাপি এই ভাগ্যবান গ্রাম্য মানুষটিকে পশ্চিমবঙ্গের শহরের পরিবেশে দেখলেই চেনা যায়, বালিগঞ্জের শপিং সেণ্টারে অথবা ময়দানের বইমেলায় শাড়িকাপড়-মেলায় চিড়িয়াখানায় বা মিউজিয়ামে বা নিউমার্কেটে, এমনকি মিনিবাসেও। এই গ্রাম্য মানুষটির মতো আরও অনেক ভাগ্যবান গ্রাম্য মানুষের তরুণ ছেলেরা যখন কৃষ্ণনগর লোকালে, বনগাঁ লোকালে, বারুইপুর লোকালে, পাঁশকুড়া-মেছেদা লোকালে, বর্ধমান-ব্যাণ্ডেল লোকালে কলকাতা শহরের কলেজে বা স্কুলে পড়তে আসে, কানের কাছে ট্র্যানজিস্টার চেপে ধরে গাভাস্কারের ব্যাটিং আর দৌড় শুনতে শুনতে, এবং হাওড়া-শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে জনস্রোতের মধ্যে ভাসতে থাকে, তখন তাদের দেখলেও চেনা যায়, শহুরে তরুণ নয়, গ্রামের তরুণ শহুরে হাওয়ায় উড়তে শিখেছে। গ্রামের তরুণীদের চিনতেও কষ্ট হয় না, শাড়ি-ব্লাউসের বাহার সত্ত্বেও। শহর-গ্রামের এই পার্থক্যটা কি? নিশ্চয় আধিভৌতিক কিছু নয়। কৃত্রিমতার সূক্ষ্মতার পার্থক্য, যা হাবভাবে চালচলনে কথাবার্তায় ফুটে ওঠে। এই পার্থক্য, গ্রাম-শহরের মানুষের মধ্যে এখনও আছে, নতুন স্বাধীনতা-উত্তর গ্রাম্য ধনিক-মধ্যবিত্তদের মধ্যেও। টাকা যানবাহন আকাঙ্ক্ষা এখনও এই পার্থক্য ঘোচাতে পারেনি। সহজে পারবে না। এই যুগসন্ধিক্ষণে তো নয়ই। সময় লাগবে।

এমন গ্রাম অনেক দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলায়, সত্তরের দশকে, যেখানে সন্ধ্যার পরে সমস্ত গ্রাম নিষ্প্রদীপ হয়ে যায়, কারণ কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য, কেবল একটি পাকাবাড়িতে আলো জ্বলে এবং জেনারেটারে।

বাড়ির মালিক গ্রামের লীডার, টাকার ও ক্ষমতার মালিক এবং টাকার মতো ক্ষমতাও তাঁর কাছে একাধিক পরস্পর-সংলগ্ন পাইপের ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে আসে। জেনারেটারে তাঁর বাড়ির আলো জ্বলছে এবং পাশের একটি পাকামণ্ডপে সিনেমা দেখানো হচ্ছে—পরিবার পরিকল্পনা, সরকারের কীর্তি-কথার ডকুমেণ্টারি, বাবা তারকনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা এইরকম কোনো ছবি। অর্থাৎ গ্রামের সাধারণ মানুষকে স্লিপিং পিল খাওয়ানো হচ্ছে। কোনো-কোনো গ্রামাঞ্চলে দেখেছি, আধ-কিলোমিটার অন্তর 'হরিসভা' স্থাপন করা হয়েছে এবং বাঁধামাইনের তিনচারজন কীর্তনিয়া খোল বাজিয়ে সেখানে সন্ধ্যায় কীর্তনের আসর বসাচ্ছে। অন্ধকার গ্রামের মানুষ চাল-ডাল-নুন-তেলের কথা ভুলে গিয়ে রোজ সেখানে জমা হয় কীর্তন শোনার জন্য। কোথাও দেখেছি কালীমন্দির স্থাপন করা হয়েছে এবং বাঁধামাইনের শক্তি-উপাসকরা সেখানে শক্তিসাধনার (সাধুভাষায়) অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ গ্রাম্য মস্তানদের মস্তানীর মহড়া দেন। হয় বৈষ্ণব মতে স্লিপিং পিল (কীর্তন, হরিসভা, গীতাপাঠ ইত্যাদি) অথবা শাক্ত-তান্ত্রিক মতে উত্তেজক চোলাই (যেমন কালীমন্দির, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি) সহযোগে 'ডাইভার্সানের' সুব্যবস্থা গ্রামে গ্রামে ছেয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে আরও মারাত্মক যে মারণাস্ত্রের প্রয়োগ করা হচ্ছে, তার নাম 'যাত্রা'। অপসংস্কৃতির নিকৃষ্ট নিদর্শন এই 'যাত্রা'। লেনিন স্টালিন থেকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সীজার মধুসূদন রামপ্রসাদ, নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় জনৈক প্রণবকুমার এবং জনৈকা স্বপনকুমারী। 'যাত্রা' হবে, গ্রামের লোক সকলে ঘর ছেড়ে আসে, অন্ধকার থেকে হ্যাজাকের আলোয়, ক্ষেতমজুরও তার রোজগারের পয়সা দিয়ে সপরিবারে যাত্রা শোনে রাতে, দিনে উপোস করে থাকে। যাত্রাদলের সুদক্ষ পাণ্ডারা ও নায়কনায়িকারা গ্রামের হাঘরে লোকদের চুষে হাজার-হাজার টাকা নিয়ে শহরে ফিরে আসে। বড বড় সংবাদপত্রকে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁরা কিনে রাখেন, প্রচার ভালই হয়। তার ফলে সংক্রমণ গ্রামেও হচ্ছে। 'যাত্রা'র দল অনেক গ্রামে গজিয়ে উঠছে। সংস্কৃতির প্রসার? কিসের সংস্কৃতি? আদৌ তা নয়, সেই একই 'ডাইভার্সান', কীর্তন কালীবাড়ি আর হরিসভার মতো। গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজকে গিলে ফেলছে এইভাবে শহরের শাসক-শোষকদের বহুমুখী একজাতীয় ময়াল সাপ, এবং সেই সাপটিকে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী দুইশ্রেণীর সরকারই দুধকলা খাইয়ে পরিপুষ্ট করছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সম্বিক্ষণের সমাজের কয়েকটি অলিগলিতে মাত্র আমরা আলোকসম্পাত করেছি। একটু পিছিয়ে গিয়ে ১৯৬০-৭০এর দশকের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। তারপর আবার ১৯৮০-র দশকের সামাজিক গতির প্রবণতাগুলির দিকে চেয়ে দেখব।

আজ চাষী বলছে যে জমিতে তার অভাব মেটে না, কারণ তার অভাব অনেক বেড়ে গিয়েছে। ছাতা জুতো কাপড় আসবাব তার ঘরের অনেক কাছে এসেছে এবং দেশবিদেশের খদ্দের এসে তার দরজায় ঘা দিচ্ছে। কিঞ্চিদধিক ষাট বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেছিলেন বাংলার গ্রাম সম্বন্ধে ('ভূমিলক্ষ্মী', ১৩২৫)। প্রায় সেই সময় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও এই ধরনের উক্তি করা হয়। তাতে বলা হয় যে গ্রাম্য জীবন-যাত্রার মান বদলাচ্ছে, কারণ বিলাসের সামগ্রী উপভোগের বাসনা জাগছে চাষীদের মনে, শুধু খেয়েপরে কোনরকমে দিনযাপনের ও প্রাণধারণের গ্লানি তারা আর ভোগ করতে চাইছে না এবং একটা শহুরে হাওয়া যেন মৃদুমন্দ গতিতে বাংলার গ্রামের দিকে বইতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির উক্তির মধ্যে মিল যতটা আছে, ঐতিহাসিক সত্য ততটা নেই। বাস্তব সামাজিক সত্য হিসেবে বিচার করলে ষাট বছর আগে বাংলার গ্রামীণ সমাজে চাষীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এই পর্বান্তর অভাবনীয় মনে হয়। তবে গ্রাম্যসমাজে চাষীদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে, যেমন আছে শহুরে সমাজে, শহরবাসীদের মধ্যে। উচ্চশ্রেণীর সম্পতিপন্ন চাষীর মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও নাগরিক ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা জাগা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়' যে ছোট-ছোট গ্রামগুলির কথা রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, সেটা অনেক বেশি বাস্তব সত্য ছিল পঞ্চাশ বছর আগেও, এবং কোনো উন্নত জীবনযাপনের বাসনা অথবা সম্ভাবনাও তখন বাংলার এই শান্তির নীড়গুলিতে আশার ক্ষীণ প্রদীপ জ্বালাতে পারেনি। প্রধানত রেলগাড়ির যোগাযোগের ফলে যেটুকু নাগরিক মনোভাব গ্রামাঞ্চলে সঞ্চারিত হয়েছিল, তার প্রভাবসীমানা ছিল রেললাইনের সমান্তরাল সঙ্কীর্ণ একটি রেখাবদ্ধ, সুবিস্তৃত গ্রামীণ সমাজের গভীরে প্রবেশ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর অটোমোবিলের আনাগোনা তখন শুরু হলেও, গ্রামের মানুষের কাছে সেটা একটা অত্যাশ্চর্য দর্শনীয় বস্তু ছিল মাত্র, যেমন ছিল আকাশপথে কদাচিৎ উড্ডীয়মান দু-একটা উড়োজাহাজ (বিমান)। গ্রাম তো দূরের কথা,

কলকাতার মতো মহানগরেই তখনো পর্যন্ত অটোমোবিল তার 'মোবিলিটি' বা গতিবেগ নাগরিকদের জীবনে সঞ্চারিত করতে পারেনি। সাধারণ শহরবাসীর জীবনে ছ্যাকরাগাড়ির আধিপত্য তখনো রীতিমত অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তার চলার গতি ও ছন্দের সঙ্গে নাগরিক জীবনের ছন্দের একটা মিলও ছিল। গ্রামে তখন গরুগাড়ির একনায়কত্ব অটুট রয়েছে এবং গ্রাম্য জীবনযাত্রার গতি ও ছন্দের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

পরিবর্তন যে পঁচিশ বছর আগে পর্যন্ত অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের আগে পর্যন্ত বিশেষ কিছু হয়নি তা বর্তমান লেখক প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারেন। ঠিক স্বাধীনতা-লাভের পর ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে প্রায় সাত-আট বছব পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলায়-জেলায় গ্রামে-গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান অনুসন্ধানের কাজে ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন দেখেছি অধিকাংশ গ্রামে যানবাহনের মধ্যে গরুর গাড়ি ও পাল্কিই প্রধান ছিল, আর ছিল দ্বিচক্রযান বাইসাইকেল। হয় পা দুখানির উপর নির্ভর করে, না-হয় এই তিন প্রকারের যানের সাহায্যে কুড়ি বছব আগে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের প্রত্যেকটি জেলা পরিক্রমা করতে হয়েছে। প্রথম পর্বের এই কাজ শেষ কবি ১৯৫৬ সালে। তাবপর প্রায় দশ বছর পরে ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে ১৯৭০-৭৪ পর্যন্ত পুনরায় বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করি। এই সময় গ্রামাঞ্চলেব ও গ্রাম্য জীবনযাত্রার একটা পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করি। গত পনের-কুড়ি বছরেব অর্থনৈতিক উন্নয়ন-পরিকল্পনার ঘাতপ্রতিঘাতে যে এই পরিবর্তন হয়েছে তা বলা বাহুল্য। অবশ্য গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনে যে একটানা একধরনের পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। সেরকম যান্ত্রিক ও রৈখিক গতিতে সামাজিক পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তনের ধারা আঁকাবাঁকা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের উঁচু-নিচু উভয় দিকের অসম গতির মধ্যে তার প্রতিফলন হয়। অর্থনৈতিক প্রকল্পের লক্ষ্য নীতি ও প্রয়োগকৌশলের পার্থক্যের ফলে সামাজিক পরিবর্তনেরও গুণগত পার্থক্য ঘটে। আমাদের দেশে যেহেতু বর্তমান সমাজব্যবস্থার ও সামাজিক সংস্থার প্রচলিত বিন্যাসের মধ্যে উন্নয়নসূচক অগ্রগতি সীমাবদ্ধ, সেইহেতু একথা প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম্যসমাজের পরিবর্তনও এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য।

পরিবর্তনের পরিবৃত্ত

আধুনিক যুগে পরিবর্তন-সঞ্চারী সক্রিয় শক্তির মধ্যে প্রধান হল (১) যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা এবং (২) শিল্পায়ন (industrialisation)। এর সঙ্গে তৃতীয় একটি বিষয়ও যোগ করা যেতে পারে, সেটি হল আধুনিক শিক্ষা (modern education)। আমাদের দেশে যে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা সেদিন পর্যন্ত স্থিতিশীল ছিল, তার অনেক গভীর স্তর পর্যন্ত এই শক্তিগুলির আঘাতে আলোড়িত হয়ে উঠেছে। নতুন পথঘাটের প্রসার, যানবাহনের বিস্তার, যোগাযোগের বৈচিত্র্য, শিল্পায়ন ও তৎসহ নগরায়নের (urbanization) অগ্রগতি এবং আধুনিক শিক্ষার বিস্তার আমাদের মধ্যযুগীয় গ্রাম্যসমাজের অচলায়তনে এমন সজোরে আঘাত করেছে এবং তার ফলে পরিবর্তনের উপসর্গগুলি এমনভাবে হঠাৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, যে তাদের গুণাগুণ ও প্রকৃত রূপ নির্ণয় করাই অনেক সময় দুঃসাধ্য মনে হয়।

গ্রাম্য জীবনের সচলতা (mobility) অনেক বেড়েছে, গ্রাম ও শহর-নগরের দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা অনেক কমেছে, শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ও সমস্যা কেবল শহরে নয়, গ্রামেও দেখা দিয়েছে, এবং সবচেয়ে উল্লেখ্য হল যে শহরের মানসতা, ভালমন্দ-মূল্যবোধ, ভোগবিলাসের বাসনা গ্রামাঞ্চলেও ক্রমে প্রকট হয়ে উঠেছে। সমাজের ভবিষ্যৎ রূপরেখা সুস্পষ্ট নয় বলে বর্তমানে পরিবর্তনের এই কোলাহলের মধ্যে পুরাতনের ভাঙনের শব্দটাই উৎকটরূপে ধ্বনিত হয়। এই বেসুরো শব্দঝংকারের আরও একটা বড কারণ আছে। সেই কারণটা হল, অর্থনৈতিক প্রকল্পে উন্নয়নের গুরুত্ব বিভিন্ন জেলায় ও গ্রামাঞ্চলে সমানভাবে আরোপিত হয়নি এবং তার মধ্যে সামাজিক লক্ষ্য ও আদর্শ সুনির্দিষ্ট না থাকার জন্য, বাস্তব অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে মানসিক পরিবর্তনের কোনো সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের আলোচ্য নয়। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই উন্নয়ন ও প্রকল্পের অগ্রগতির ফলে গ্রামাঞ্চলে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। আগেই বলেছি সামাজিক পরিবর্তনের সক্রিয় ও গতিশীল উপাদান-কারণের মধ্যে প্রধান হল যানবাহন-যোগাযোগ, শিল্পায়ন ও শিক্ষা। এই তিনটি ক্ষেত্রে প্রকল্পজনিত অগ্রগতির চিত্র কতকটা এইরকম।

যেমন সরকারী তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গে চলাচলের রাস্তা ছিল ১৯৫১-৫২

সালে ৩৫০০ কিলোমিটার, ১৯৬৭-৬৮ সালে হয়েছে ১৫,০০০ কিলোমিটার। এ ছাড়া পৌরসংস্থা জেলাবোর্ড ইত্যাদির অধীন রাস্তাঘাটও বেশ খানিকটা বেড়েছে। তা ছাড়া বড় বড় ন্যাশনাল হাইওয়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। শুধু প্রাইভেট নয়, সাধারণের চলাচলের মোটরযানের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে প্রত্যেক জেলায়। ১৯৫১-৫২ সালে ডাকঘরের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮০০-এর মতো, ১৯৬৭-৬৮ সালে হয়েছে প্রায় ৫৫০০। ১৯৫১-৫২ সালে অনুমোদিত রেডিওর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৬,০০০, ১৯৬৭-৬৮ সালে হয়েছে প্রায় ১১ লক্ষ। কলকাতা শহরের বাইরে মফঃস্বল টাউনে টেলিফোন একরকম ছিলই না বলা চলে, ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে কলকাতার বাইরে প্রায় ১৪০টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়েছে, প্রায় ২১০০০ টেলিফোনসহ, তাতে প্রায় ১৮ লক্ষ টেলিফোন-কল হয় ১৯৬৭-৬৮ সালে। রাস্তাঘাট চারগুণ, ডাকঘরও প্রায় তাই, রেডিও দশগুণেরও বেশি, টেলিফোন এবং তদনুপাতে যানবাহন, বিশেষ করে মোটরযানেব বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্যজীবনের স্থিতিশীলতা ও গতানুগতিকতাকে প্রচণ্ডভাবে মথিত করার পক্ষে যে যথেষ্ট তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য নিছক সংখ্যার দিক থেকে যানবাহন-যোগাযোগের এই উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গের মোট গ্রামসংখ্যা, গ্রাম্য জনসংখ্যা ও গ্রামাঞ্চলের বিস্তারের তুলনায় যথেষ্ট কি না, অথবা গত ২৫-৩০ বছরের অর্থনৈতিক প্রকল্পের সাফল্য ও কৃতিত্ব তাতে কতখানি সূচিত হচ্ছে, তা তর্কসাপেক্ষ বিচার্য বিষয়। তথাপি কতটুকু হয়েছে এবং কিভাবে হয়েছে তার বিচার না করেও আমরা বলতে পারব, যা হয়েছে এবং যতটুকু হয়েছে তাই গ্রাম্যসমাজের কূপমণ্ডুকতা চূর্ণ করে তার মধ্যে বহু ভিন্নমুখী স্রোত ও আবর্তের সৃষ্টি করেছে।

অগ্রগতি শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও কম হয়নি। স্বাধীনতালাভের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নখাতে মোট খরচ হয়েছে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার মতো, তার মধ্যে অর্ধেকের কিছু বেশি টাকা (৫৬%) খরচ হয়েছে উৎপাদনমুখী উন্নয়নে (প্রকৃত অর্থনৈতিক) এবং বাকি টাকা নানাবিধ জনকল্যাণকর কাজকর্মে, যা অর্থনৈতিক উৎপাদন-সংশ্লিষ্ট নয়। ১৯৫১ সালে রেজিস্টার্ড কারখানার মজুরের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার, ১৯৬৬-৬৭ সালে তার সংখ্যা হয় ৮ লক্ষ ৫০ হাজারের মতো। ১৫/১৬ বছরে মাত্র ২ লক্ষ মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি শিল্পায়নের আশাপ্রদ অগ্রগতির লক্ষণ নয়। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৬টি জেলার

মধ্যে ১১টি জেলায় কারখানার মজুর-সংখ্যা ৭.৪% থেকে ৯% মাত্র বেড়েছে। অর্থাৎ শিল্পায়ন যেটুকু হয়েছে তা মাত্র চার-পাঁচটি জেলার মধ্যে কেন্দ্রীভূত। ১৯৬৭-৬৮ সালে দেখা যায় প্রায় ৬০০০ রেজিস্টার্ড কারখানার মধ্যে ৪৫০০ মতো ছুটো কারখানা (৮১%) কেবল কলকাতা ২৪-পরগনা ও হাওড়া জেলার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৬১ সালে সেন্সাসে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে প্রায় অর্ধেক জেলায় নগরায়নের (urbanization) গতি রাজ্যের গড়পড়তা গতির তিনভাগের একভাগের মতো। আরও অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে কয়েকটি জেলায়—যেমন বর্ধমান হাওড়া হুগলি ২৪-পরগনা—প্রধানত এই কয়টি জেলায় নগরায়নের গতি অন্যান্য জেলার তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশি। যেহেতু নগরায়নের গতির সঙ্গে শিল্পায়নের (industrialisation) গতির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ, সেইহেতু এই কথা বলা যায় যে শিল্পায়ন ও নগরায়নের বিকাশবৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সমানভাবে হয়নি। তার ফলে স্বভাবতই গ্রাম্যসমাজের পরিবর্তনের মধ্যে আঞ্চলিক ব্যবধান অনেক থেকে গেছে। যদিও পথঘাট যানবাহন ও গমনাগমনের গতিবৃদ্ধি এই আঞ্চলিক ব্যবধান অনেকটা বিলোপ করছে, তথাপি ব্যবধান যে খানিকটা থেকে যাচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষার অগ্রগতিও লক্ষ্য করার মতো। প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি হয়েছে, অন্তত জনসংখ্যা ও তরুণ শিক্ষার্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে বিচার করলে, এমন কথা বলা যায় না। তথাপি শিক্ষার প্রসার যতটুকু হয়েছে, প্রকৃত শিক্ষার দিক থেকে যতটা নয়, সামাজিক প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে তার গুরুত্ব খুব বেশি, সুদূরপ্রসারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। পঁচিশ বছর স্বাধীন হবার পরে দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা আজও এত আছে যে ভাবতেও লজ্জা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার তেমন উল্লেখ্য নয়। যেমন ১৯৪৭ সালে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ হাজারের মতো, ১৯৭২ সালের মার্চে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৭ হাজারের মতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং গণতান্ত্রিক সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার অত্যাবশ্যকতার দিক দিয়ে বিচার করলে একে আশাপ্রদ অগ্রগতি বলা যায় না। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের (মার্চ) মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৮৯৬ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৫৯৬, ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষের বেশি হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কলেজের সংখ্যা ৫৪ থেকে বেড়ে হয়েছে ২২১,

এবং কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৩৫ হাজার থেকে প্রায় ৩ লক্ষের মতো। বিশ্ববিদ্যালয় ও তার ছাত্রসংখ্যা অনেক বেড়েছে। প্রয়োজনের দিক থেকে আরও অনেক বাড়া উচিত ছিল। কিন্তু শিক্ষার সংখ্যাগত বৃদ্ধির কথা আমরা বলছি না। সামাজিক পরিবর্তনের দিক থেকে শিক্ষার আরও একটা দিক আছে যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটা হল শিক্ষার আবশ্যকতাবোধ এবং শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহবৃদ্ধির দিক। স্কুল কলেজ ও ছাত্রদের সংখ্যাবৃদ্ধির চেয়ে শিক্ষার প্রতি মনোভঙ্গির এই যে পরিবর্তন, এর প্রভাব সমাজের সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থনৈতিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজের মূল গঠনবিন্যাসের পরিবর্তন হয় ঠিকই এবং তার প্রভাবও যে সমাজজীবনে ব্যাপক তাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষা সমাজের উর্ধ্বস্তরের ব্যাপার হলেও তার স্বতন্ত্র প্রভাবশক্তিও যথেষ্ট ব্যাপক হতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে (যেমন পশ্চিমবঙ্গে) সেটা অর্থনৈতিক শক্তির চেয়েও অনেক বেশি যুগান্তকারী হতে পারে। এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী খণ্ডে করার ইচ্ছা রইল।

পশ্চিমবঙ্গ : মানচিত্র-জনতা-জনজীবিকা

অরবিন্দ বিশ্বাস



এই রচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র, জনতা ও জনজীবিকার সঙ্গে পাঠকদের একটা সাধারণ পরিচিতি ঘটিয়ে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতি ও অর্থনীতির কোনও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এই রচনার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এই জনসমাজের গঠন, বিন্যাস এবং জীবিকাসংস্থানের আলোচনা-সূত্রে শহর-গ্রাম কৃষি, শিল্প যাতায়াত-ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতি আরও কয়েকটা আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই এই রচনায় স্থান পেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ছিল ৭৫,১৮৭ বর্গ-কিলোমিটার। এই পশ্চিমবঙ্গ এককালীন সুবা বাংলার একটা ছোট অংশ মাত্র। ১৮৬৩ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার প্রশাসনিক মানচিত্রের বহু পরিবর্তন ঘটেছে। ১৮৭৪ সালে আসামকে সুবা বাংলা থেকে পৃথক করা, ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ এবং, তারপরে ১৯১১ সালে বিহার ও উড়িষ্যার

পৃথকীকরণের ফলে বাংলা ক্রমশ শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়েছে। কিন্তু তথাপি বাংলা ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত একটা অখণ্ড ভূভাগ হিসাবেই চিহ্নিত ছিল। ১৯৪৭ সালের র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডের ফলে বাংলা যে কেবল দু টুকরো হয়ে দুটো পৃথক রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হল তাই-ই নয়, শীর্ণকায় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ তার প্রধান দক্ষিণাংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সীমা বিস্তৃত হল বিহারের পূর্ণিয়া জেলা পর্যন্ত। ফলে দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলা দুটো পশ্চিমবঙ্গের অধীন হয়েও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান অবয়ব থেকে বিচ্যুত হল। এই ঘটনা যে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেরই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল তা নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল, আসাম ও কুচবিহারের দেশীয় রাজ্যের সঙ্গেও ভারতের প্রধান অংশের যোগাযোগ রক্ষা করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াল ; কেননা উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে পূর্ব ভারতের যোগাযোগ-সাধনকারী সড়ক, রেলপথ ও জলপথগুলো পূর্ব পাকিস্তানের সীমানাধীন হয়ে পড়ল। আজও পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ রক্ষা করছে নকশালবাড়ির কাছে মাত্র ১৫ কিলোমিটার প্রস্থের একটা সংকীর্ণ ভূভাগ।

অবিভক্ত বাংলার অপেক্ষাকৃত উর্বর ও কৃষি এবং জল-সম্পদে সমৃদ্ধ পাললিক অঞ্চলের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানের সীমানাধীন হওয়ার ফলে দেশবিভাগের অনতিবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে যে দুটো সামগ্রীর অভাব প্রকট হয়ে দাঁড়ায় তা হচ্ছে কাঁচা পাট এবং মাছ। গত তিন দশকের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরেও এই সমস্যার কোনো সুষ্ঠু সমাধান এখনও সম্ভব হয়নি। অবশ্য একথা মনে করলে ভুল হবে যে প্রাকৃতিক সম্পদের আঞ্চলিকতার দায়ভাগ দেশবিভাগের পর কেবল পশ্চিমবঙ্গকেই বিড়ম্বিত করেছে। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক সূত্রে পাওয়া রেল এবং সড়ক যোগাযোগ-ব্যবস্থায় উপকৃত অঞ্চলগুলোর অধিকাংশই দেশবিভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গে থেকে যায়। উপরন্তু দেশের পশ্চিমাংশে মালভূমিপ্রায় অঞ্চলের খনিজ সম্পদগুলোর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান। শুধু তাই নয়, কলকাতা শহর এবং বন্দরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা হুগলী নদীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চলের সুযোগ-সুবিধাও পূর্ব পাকিস্তানের নাগালের বাইরে চলে আসে।

১৯৪৭-এ কুচবিহার এবং ফরাসী চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কুচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৯৫০ সালে এবং ১৯৫৪ সালে চন্দননগরের ভারতভুক্তি ঘটে। এর ফলে ১৯৫৪ সালের

পরে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ৭৮,৫৭২ বর্গ-কিলোমিটার। কুচবিহার এবং চন্দননগরের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যাও বর্ধিত হয় প্রায় ৭ লক্ষের মতো। ১৯৫৪ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সামনে যে-সমস্ত অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির দাবি পেশ করা হয় সেগুলো হচ্ছে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পূর্বাংশ, মানভূম জেলার পুরুলিয়া এবং ধানবাদ অঞ্চল, ধলভূমি জেলার সিংভূম অঞ্চল, সেরাইকেল্লার কিছু অংশ, গোড্ডা মহকুমা বাদে সমগ্র সাঁওতাল পরগনা, উড়িষ্যায় উত্তর বালেশ্বর অঞ্চল, আসামের গোয়ালপাড়া, গারো পাহাড় ও কাছাড় এবং ত্রিপুরা। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এই অঞ্চলগুলোকে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, নৃ-তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করলেও রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এদের মধ্যে মাত্র যে দুটো অঞ্চলকে ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তা হচ্ছে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার একটি সংকীর্ণ অংশ—বর্তমানে যা পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমা বলে চিহ্নিত, এবং মানভূমের পুরুলিয়া অঞ্চল যা এখন পুরুলিয়া জেলা বলে পরিচিত। ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠনের পর পশ্চিমবঙ্গের আয়তন দাঁড়ায় ৮৮,৫৬৩ বর্গ-কিলোমিটার। ১৯৫৬ সালের এই মানচিত্রই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী মানচিত্র।

পশ্চিমবঙ্গের জনতা

১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনবল ছিল ২ কোটি ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার। ১৯৫১ সালের আদমশুমারির সময় কুচবিহারের লোকসংখ্যা সমেত এই লোক-সংখ্যা দাঁড়ায় ২ কোটি ৪৮ লক্ষের কিছু বেশি। আরও দশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে বিহার থেকে পাওয়া পুরুলিয়া ও পূর্ণিয়া জেলার কিছু ভূ-খণ্ড এবং ফরাসী চন্দনগরের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির সূত্রে এই অঞ্চলগুলোর বাড়তি জনসংখ্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনবল হয় ৩ কোটি ৩৯ লক্ষেরও বেশি। কিন্তু জনবৃদ্ধির এই রকম হিসাব একটু গোলমেলে। কারণ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তারই সূত্রে সামগ্রিক লোকবৃদ্ধির হার আপনা থেকেই বেড়ে যায়। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া যায় যে পুরুলিয়া, পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমা, দার্জিলিঙ জেলার খড়িবাড়ি

থানার কয়েকটা মৌজা এবং ফরাসী চন্দননগর প্রথম থেকেই পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহলে জনসংখ্যার হিসাবটা দাঁড়ায় :

সাল	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১
লোকসংখ্যা	২৩,২২৯,৫৫২	২৬,২৯৯,৯৮০	৩৪,৯২৬,২৭৯,	৪৪,৩১২,০১১

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক সীমার মধ্যে ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত লোকবৃদ্ধির হারটা উপরের হিসাব থেকে যথাযথ টের পাওয়া যায়। ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত এই হার ছিল শতকরা ১৩.২২, পঞ্চাশের দশকে শতকরা ৩২.৮০ এবং ষাটের দশকে শতকরা ২৬.৮৭।

জনবৃদ্ধির শতকরা হার এবং মোট জনসংখ্যার আঞ্চলিক তারতম্যগুলো আরেকটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে নিচের জেলাওয়ারি তথ্যের ভিত্তিতে :

অঞ্চল	জনবৃদ্ধির শতকরা হার			প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব			মোট জনসংখ্যা
	১৯৪১-৫১	১৯৫১-৬১	১৯৬১-৭১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৭১
বর্ধমান	১৫·৯২	৪০·৬৫	২৭·০৪	৩১২	৪৩৯	৫৫৭	৩,৯১৬,১৭৪
বীরভূম	১·৭৭	৩৫·৫৫	২২·৮০	২৩৪	৩১৮	৩৯০	১,৭৭৫,৯০৯
বাঁকুড়া	২·৩০	২৬·১৭	২২·০২	১৯২	২৪২	২৯৫	২,০৩১,০৩৯
মেদিনীপুর	৫·২৮	২৯·২৬	২৬·৮৯	২৪৫	৩১৬	৪০১	৫,৫০৯,২৪৭
হাওড়া	৮·১২	২৬·৫১	১৮·৫৮	১,০৯৩	১,৩৮৩	১,৬৪০	২,৪১৭,২৮৬
হুগলী	১৩·৩৫	৩৯·০২	২৮·৭২	৫১০	৭০৯	৯১৩	২,৮৭২,১১৬
২৪-পরগনা	২৩·৫০	৪০·৮৪	৩৪·৫৩	৩২৩	৪৫৫	৬১২	৮,৪৪৯,৪৮২
নদীয়া	৩৬·১৫	৪৯·৭৮	৩০·১৪	২৯১	৪৩৬	৫৬৮	২,২৩০,২৭০
মুর্শিদাবাদ	৪·৫৯	৩৩·৪৭	২৮·৩৯	৩২১	৪২৯	৫৫০	২,৯৪০,২০৪
প.দিনাজপুর	১৭·০৩	৩৫·৫১	৪০·৫০	১৮৮	২৫৪	৩৫৭	১,৮৫৯,৮৮৭
মালদা	১১·০৫	৩০·৩৩	৩১·৯৮	২৫৩	৩২৯	৪৩৪	১,৬১২,৬৫৭
জলপাইগুড়ি	৮·১৩	৪৮·২৭	২৮·৭৬	১৪৭	২১৮	২৮০	১,৭৫০,১৫৯
দার্জিলিঙ	১৭·৫৮	৩৫·৯০	২৫·১৬	১৪৯	২০৩	২৫৪	৭৮১,৭৭৭
কুচবিহার	৪·৭৪	৫২·৪৫	৩৮·৬৭	১৯৮	৩০১	৪১৮	১,৪১৪,১৮৩
পুরুলিয়া	৭·৪৩	১৬·৩৩	১৭·৮৬	১৮৭	২১৭	২৫৬	১,৬০২,৮৭৫
কলকাতা	২৪·৫০	৮·৪৮	৭·৫৭	২৫,৯৪৭	২৮,১৪৭	৩০,২৭৬	৩,১৪৮,৭৪৬
পশ্চিমবঙ্গ	১৩·২২	৩২·৮০	২৬·৮৭	২৯৯	৩৯৮	৫০৪	৪৪,৩১২,০১১

উপরের সারণী থেকে এক নজরায় বোঝা যায় যে প্রধানত শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলেই লোকবসতির চাপ অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশি। কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগনা এবং বর্ধমান—এই জেলাগুলোতেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপ্রসার সীমাবদ্ধ রয়ে গিয়েছে। শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলের বাইরে যে জেলাগুলোতে লোকবসতি অন্যান্য জেলা থেকে বেশি সেগুলো হচ্ছে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ এই জেলাগুলোতে বসতি স্থাপন করেছে। নদীয়ার লোকসংখ্যা দেশবিভাগের অনতিপরেই প্রচণ্ডভাবে বাড়তে আরম্ভ করে। কিন্তু মুর্শিদাবাদে উদ্বাস্তুসমাগম ঘটে প্রধানত পঞ্চাশের দশকে। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে আরও যে জেলাগুলোতে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে জনসংখ্যা হঠাৎ স্ফীত হয়ে ওঠে সে জেলাগুলো হচ্ছে কলকাতা, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি আর ২৪-পরগনা।

পশ্চিমবঙ্গে লোকবৃদ্ধির হার এবং লোকবসতির আঞ্চলিক তারতম্যের পিছনে শিল্পপ্রসার এবং পুনর্বাসন ভিন্নও অনেকগুলো ভৌগোলিক কারণ আছে। লোকসংখ্যার ঘনত্বের হিসাব থেকে জেলাগুলোকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করলেই ভৌগোলিক কারণগুলো পরিস্ফুট হয়ে যাবে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিংএ লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৩০০ রও কম। এর মধ্যে দার্জিলিঙ-এর উত্তরাংশ একেবারেই পাহাড়ী, আবাদের উপযোগী জমির পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য, জীবনধারণের জন্য মাথাপিছু জমির প্রয়োজন বেশি। ফলে এই অঞ্চলের লোকধারণের ক্ষমতাও সীমিত। জলপাইগুড়ি জেলা নদীবহুল এবং জলসম্পদে সমৃদ্ধ হলেও এখানকার নদীগুলোর ধরনধারন খুবই অনিশ্চিত। অতীতে এই নদীগুলো বহুবার গতিপথ পালটেছে, বিধ্বংসী বন্যার সৃষ্টি করেছে, নদীখাত ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বালি, কাঁকর আর নুড়ি জড় করে জমিকে চাষের অযোগ্য করে তুলেছে। এই দুর্বার অনিশ্চিত নদীগুলোকে পোষ মানানো সম্ভব হয়নি বলে এই অঞ্চলে জলসেচ এবং কৃষির অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। পুরুলিয়া আর বাঁকুড়া জেলার ভূ-প্রকৃতিও বন্ধুর, কেননা এরা ছোটনাগপুর মালভূমির সমীপবর্তী। এই রকম ভূ-প্রকৃতিতে জল ধরে রেখে চাষবাসের কাজে ব্যবহার করার সম্ভাবনা সীমিত, উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই অংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও অপেক্ষাকৃত কম, মাটি অসার, অনুর্বর এবং রুক্ষ, কৃষির প্রসার কম এবং সম্ভাবনা অনুজ্জ্বল, ফলে লোকবসতির ঘনত্বও কম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই জেলাগুলোতে শিল্প ও যাতায়াতব্যবস্থার বিকাশও নিতান্তই সামান্য।

কুচবিহার, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলার ভূপ্রকৃতি অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। কেবলমাত্র মেদিনীপুর ও বীরভূমের পশ্চিমপ্রান্তের ভূমিরূপ চাষ-আবাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা, বীরভূমের পশ্চিম এক-তৃতীয়াংশ এবং মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুরের পূর্ব এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিলে এই জেলাগুলোর ভূপ্রকৃতি কৃষির পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। কুচবিহার, মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুরে কৃষির উপযোগী জলসংস্থান ঘটে থাকে এখানকার প্রচুর বৃষ্টিপাতের দৌলতে, অপরদিকে বীরভূম ও মেদিনীপুরের সমতল অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত উঁচু পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে গড়িয়ে আসা জলকে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। জলসেচের কাজে গড়িয়ে আসা জলের ব্যবহার লক্ষ করা যায় বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর এবং রাঢ় মুর্শিদাবাদে। দামোদর, ময়ূরাক্ষী এবং কংসাবতী সেচ-প্রকল্পগুলো রাঢ় সমভূমিকে চাষের জল যোগান দিতেই তৈরী হয়েছে।

নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার বাগড়ি অংশে এবং ২৪ পরগনা জেলার উত্তরাংশে খালের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা না থাকলেও এখানকার ভৌগোলিক পরিবেশ চাষ-আবাদের পক্ষে খুবই অনুকূল। এই অঞ্চলের উর্বর পলিমাটিতে বর্ষার শেষেও যথেষ্ট রস থাকে। ফলে খেসারি, মুসুর সর্ষে ইত্যাদি রবিশস্যের চাষ এখানে ব্যাপক। অন্যদিকে খরিফ খন্দে আউশ ধান আর পাটের চাষ সম্ভব হয়ে থাকে মাঝারি পরিমাণে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ফলে। রাঢ়ের সমতলভূমি এবং সমগ্র বাগড়ি অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের সম্পদও পর্যাপ্ত।

আঞ্চলিক জনবিন্যাসের চরিত্র আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই এসে পড়ে জীবিকা ও অর্থনীতির কথা। ভৌগোলিক কারণবশত লোকবসতির ঘনত্বে যে আঞ্চলিক তারতম্য দেখা যায় তা কেবলমাত্র গ্রামীণ কৃষিজীবী জনসংখ্যার পক্ষেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই গ্রামীণ জনসমাজই পশ্চিমবঙ্গের মোট জনবলের শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাকি প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ শহরবাসী জনসাধারণও অবহেলার যোগ্য নয়, কারণ অঞ্চল-বিশেষে এই শহরবাসী জনসংখ্যা জীবিকা, অর্থনীতি ও লোকবসতির চেহারা সম্পূর্ণ বদলে দেয়। ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নগরবাসী জনসংখ্যার পরিবর্তনের হার অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। মোট জনসংখ্যার তুলনায় ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে শহরবাসী জনগণের সংখ্যা ছিল শতকরা ২৩·৮৮, ১৯৬১তে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪·৪৫ এবং ১৯৭১-এ ২৪·৭৫। অতএব

বলা যেতে পারে যে এই রাজ্যে স্বাধীনতা-উত্তর কালে নাগরিকীকরণের ধারা প্রায় স্থির ও রুদ্ধ। এই রুদ্ধতার কারণ খোঁজার আগে নাগরিক লোকসংখ্যার আঞ্চলিক চেহারাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলে বোধহয় সমস্যাটা বুঝতে সুবিধে হবে। জেলাওয়ারি শহুরে ও গ্রামীণ জনসংখ্যার যে সারণী নিচে দেওয়া হল তার থেকে নগরকেন্দ্রিক জনবিন্যাসের আঞ্চলিক বৈষম্যটাই প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

মোট জনসংখ্যায় নগরবাসী জনসংখ্যার শতকরা হার

	১৯৫১	১৯৭১		১৯৫১	১৯৭১
বর্ধমান	১৮·৭৮	২২·৭৮	নদীয়া	১৮·১৮	১৮·৭৪
বীরভূম	৬·৪৭	৭·০৩	মুর্শিদাবাদ	৭ ৮৬	৮·৪৫
বাঁকুড়া	৭·১৭	৭ ৫৭	প. দিনাজপুর	৪·২২	৯·৩৪
মেদিনীপুর	৭·৫৩	৭·৬৭	মালদা	৩·৬৫	৪·২২
হাওড়া	৩২·৪১	৪১·৯৩	জলপাইগুড়ি	৭·২৩	৯·৬০
হুগলী	২৪·৬১	২৬·৪৭	দার্জিলিঙ	২১·২২	২৩·০৫
২৪ পরগনা	২৭·২৭	৩৫·১৫	কুচবিহার	৭·৪৮	৬·৮৩
কলকাতা	১০০·০০	১০০·০০	পুরুলিয়া	৬ ৭১	৮·২৬
			পশ্চিমবঙ্গ	২৩· ৮	২৪·৭৫

প্রকৃতপক্ষে কলকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগনা, বর্ধমান, নদীয়া ও দার্জিলিঙ বাদে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলোতে নগরবিকাশ প্রায় ঘটেনি বললেই হয়। এদের মধ্যে আবার স্বাধীনতার পরবর্তী কালে কেবলমাত্র কলকাতা, বর্ধমান হাওড়া ও ২৪-পরগনায় নাগরিকীকরণের হারে কিছুটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ করা যায়। অন্যান্য জায়গায় মোট লোকসংখ্যার তুলনায় নগরবিকাশের ধারা প্রায় স্তব্ধ। একান্ন থেকে একাত্তর—এই তিন দশকে কলকাতার লোকসংখ্যা বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ, বর্ধমান জেলার অনুরূপ বৃদ্ধি প্রায় ৬ লক্ষ, হাওড়ায় ৫ লক্ষ এবং ২৪-পরগনায় প্রায় ১৭ লক্ষ। নিচে কিছু তথ্য দিলাম :

নগর-শহরের আকার ('৭১-এর লোকসংখ্যা অনুযায়ী)	সংখ্যা
মহানগরী (১০ লক্ষের বেশি)	১
নগরী (৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ)	১
অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর শহর (১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ)	১৩
দ্বিতীয় শ্রেণীর শহর (৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ)	৩১
তৃতীয় শ্রেণীর শহর (২০ হাজার থেকে ৫০ হাজার)	৪৯
চতুর্থ শ্রেণীর শহর (১০ হাজার থেকে ২০ হাজার)	৬০
পঞ্চম শ্রেণীর শহর (৫ হাজার থেকে ১০ হাজার)	৫৯
ষষ্ঠ শ্রেণীর শহর (৫ হাজার পর্যন্ত)	৯
	মোট—২২৩

উপরের ছবিটাকে আরেকটু পরিষ্কার করা প্রয়োজন। হাওড়া নামের শহরটা আসলে বৃহত্তর কলকাতার একটা অংশ মাত্র। পৌর কলকাতা এবং হাওড়া ছাড়াও আরও ৭৩টা মাঝারি এবং ছোট আকারের শহর বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্ভুক্ত। বৃহত্তর কলকাতার মোট লোকসংখ্যা ৭,০৩১,৩৮২ এই লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের মোট নাগরিক লোকসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ। বৃহত্তর কলকাতার পরেই দ্বিতীয় শহর দুর্গাপুর, লোকসংখ্যা মাত্র ২ লক্ষ; তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শহর যথাক্রমে খড়্গপুর, আসানসোল এবং বর্ধমান—এদের লোকসংখ্যা গড়ে দেড় লক্ষের মত। তারপরেই যে শহরটার লোকসংখ্যা ১ লক্ষের কাছাকাছি সেটা হচ্ছে শিলিগুড়ি (৯৭ হাজার)। প্রথমত, প্রথম শহর সত্তর লক্ষাধিক এবং দ্বিতীয় শহর ২ লক্ষ—এই পরিস্থিতি পাঠককে নিশ্চয়ই একটু ভাবিয়ে তুলবে। দ্বিতীয়ত, চতুর্থ শ্রেণীর শহরের চেয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শহরের সংখ্যা কম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর শহর প্রায় নেই বললেই চলে—এ রকম একটা পরিস্থিতিও মেনে নিতে কষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু তথ্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই। এই তথ্য থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এক: পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে নগরভিত্তিক সমাজবিকাশের যেটুকু সুযোগসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার সবটাই কলকাতার কবজায়। দুই: ভারী শিল্পোদ্যম এবং যাতায়াতব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে দু-একটা মাঝারি আকারের শহর এই সুযোগের সামান্য মাত্র ব্যবহার করতে পেরেছে। তিন: ছোট গ্রাম থেকে বড় গ্রাম, বড় গ্রাম থেকে গঞ্জ গঞ্জ, থেকে শহর এবং শহর থেকে মহানগরী—নগরবিকাশের যে প্রক্রিয়ার কথা সচরাচর বলা হয়ে থাকে, পশ্চিমবঙ্গে সেই প্রক্রিয়া কার্যকরী

হয়নি। নইলে ষষ্ঠ শ্রেণীর শহরের সংখ্যা এত কম হত না। চার: গ্রামীণ উৎপন্ন দ্রব্যাদি এবং গ্রামীণ মানুষ ছোট আর মাঝারি শহর টপকে মহানগরীতে এসে পৌঁছায়, মহানগরী থেকে আধুনিক শিল্পজ ভোগ্যপণ্য এবং কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের উপাদান সরাসরি গ্রামে এসে হাজির হয়; হয়তো এই মাল ও মানুষ চলাচলের পথ ছোট ও মাঝারি শহরের বুকের উপর দিয়েই গেছে (অন্তত মানচিত্রে তাই দেখা যাবে), কিন্তু এই বিনিময়প্রথায় ফড়িয়াগিরি আর দালালি ভিন্ন ছোট আর মাঝারি শহরের কোন ভূমিকা নেই।

উপরের সিদ্ধান্তগুলো হয়তো অতিমাত্রায় সরলীকৃত এবং সরব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তাঁদের কয়েকটা বক্তব্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে নগরবিকাশের ধারাটা পাঠকের কাছে আরও বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তুলে ধরা যেতে পারে:

"১৯০১ সালে মোট শহরবাসী জনগণের এক-চতুর্থাংশের কিছু কম লক্ষাধিক জনসমৃদ্ধ শহরগুলোতে বাস করত। ১৯৬১-তে মোট শহরবাসীর প্রায় অর্ধেক এই ধরনের শহরে বাস করত, এবং ১৯৭১-এ এদের সংখ্যা মোট শহরবাসীদের অর্ধেকের বেশিও (৫২·৪১)। ছোট শহরের ক্ষেত্রে ছবিটা ঠিক উল্টো: যেখানে ১৯০১ সালে মোট নাগরিক অধিবাসীদের ৬.১৮ শতাংশ ৫ হাজারের কম জনসমৃদ্ধ শহরে বাস করত, সেখানে ১৯৭১ সালে মাত্র ·৮০ শতাংশ"। এই অধ্যাপক রায়বর্মনের উক্তি।

অধ্যাপক সুনীল মুন্সীর একটি বক্তব্য: "রাজ্যের ছোট শহরগুলো আশপাশের অঞ্চল থেকে দেশের অন্যত্র, বিশেষত কলকাতায় চালান দেবার জন্য কৃষিজ দ্রব্যাদি এবং কাঁচামাল সংগ্রহের কেন্দ্র হিসাবে প্রাক-শিল্পায়ন স্তরের গঞ্জের চেহারা বজায় রেখেছে।"

অধ্যাপক মুন্সী আরও বলেছেন যে শিল্পভিত্তিক জীবিকার একান্ত অভাবের ফলে এই শহরগুলো আঞ্চলিক অর্থনীতির স্বয়ম্ভর বিকাশকেন্দ্র না হয়ে কেবলমাত্র প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে বেঁচে আছে। এরা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে নেই; এখানেই পশ্চিম ইউরোপীয় এবং মার্কিনী নগরবিকাশপদ্ধতির সঙ্গে এই রাজ্যের মূল প্রভেদ।

জনজীবিকা প্রসঙ্গ

১৯৭১ সালের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে কোনরকম কাজকর্ম করে এমন লোকের সংখ্যা একশ জনে ২৮ জন মাত্র। এ ব্যাপারে ভারতের মোট একুশটা

রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান আঠারোটার পরে। কলকাতা ও দার্জিলিং বাদে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলো কর্মসংস্থানের দিক থেকে ভারতের গড় অবস্থা থেকে পশ্চাৎপদ। পশ্চিমবঙ্গের গড় অবস্থার তুলনায় অবশ্য বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া এবং জলপাইগুড়ির মান কিছুটা ভালো। এদেশের ছেলেমেয়ে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, ১৫ বছর বয়স হলেই কাজের লায়েক হয়ে ওঠে আর অন্তত ৬০ বছর অবধি কর্মক্ষম থাকে—একথা মোটামুটিভাবে মেনে নিতে বোধহয় খুব একটা অসুবিধে নেই। তাই যদি হয় তাহলে কর্মক্ষম জনসংখ্যার বেকারির একটা মোটা হিসাব দাখিল করা যেতে পারে :

১৫-৬০ বছরের লোকেরা সংখ্যায় শতকরা ৫২ জন,

কাজ করে এমন লোকেরা শতকরা ২৮ জন, তাহলে

কাজ পায়নি এমন কর্মক্ষম লোকেরা শতকরা ২৪ জন।

নারী-পুরুষ মিলিয়ে হিসাবটা একটু অতিরঞ্জিত হয়ে গেল। মেয়েদের দিকটা আলাদা করে দেখলে এই রকম দাঁড়ায় :

১৫-৬০ বছরের নারীর সংখ্যা শতকরা ৪৯ জন,

'কর্মী' নারীর সংখ্যা শতকরা ৪ জন,

কাজ পায়নি এমন কর্মক্ষম নারীর সংখ্যা শতকরা ৪৫ জন।

আসলে মেয়েদের ক্ষেত্রে 'কর্মী'র সংজ্ঞাটা একটু বদলে নেওয়া দরকার, কারণ, যে মেয়েরা অষ্টপ্রহর সাংসারিক দায়িত্ব বহন করে, তাদের বেকার আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। তাদের কাজকর্মকে কোনরকমেই বেফায়দা বলা চলে না। তাই শতকরা ৪৫ জন এই সংখ্যাটা নির্ভরযোগ্য নয়। বরং পুরুষদের অঙ্ক থেকে বেকারত্বের চেহারাটা প্রকৃত ধরা পড়ে। পুরুষদের হিসাবটা এইরকম :

১৫-৬০ বছরের পুরুষের সংখ্যা শতকরা ৫৪ জন, 'কর্মী' পুরুষের সংখ্যা শতকরা ৪৯ জন, তাহলে কর্মক্ষম বেকার পুরুষের সংখ্যা শতকরা ৫ জন। মেয়েদের ক্ষেত্রেও বেকারের সংখ্যাটা অনুরূপ হলে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় শতকরা ৫ জনের কর্মসংস্থান এখনও হয়ে ওঠেনি। এর উপরে মনে রাখতে হবে যে এই কর্মীবাহিনীর অনেকেই আধা-বেকার; কারণ, সেনসাসের কারসাজিতে লোকগণনার সময়ে কেউ এক সপ্তাহ কাজ করলেই তাকে কর্মী আখ্যা দিয়ে দেওয়া হয়। একটা সরকারী হিসাবমতে ১৯৭২ সালে পুরোপুরি কাজ করে এমন লোকের সংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ। আরেকটা হিসাব অনুযায়ী পুরোপুরি বেকারের সংখ্যা ছিল ৪৫ লক্ষ। সেনসাসের হিসাবের মোট ১ কোটি ২৪ লক্ষ 'কর্মী'র মধ্যে তাহলে

৯৬ লক্ষই আধা-বেকার। মোট কর্মী-সংখ্যাকে ১০০ ধরলে, পুরোপুরি কাজে নিযুক্ত আর আধা-চাকরিজীবীদের জীবিকার চেহারা হল :

	মোট	পুরুষ	নারী
কর্মীবৃন্দ	১০০	৯২·৫২	৭·৪৮
নিজচাষ	৩১·৯৭	৩১·০৯	·৯০
ক্ষেতমজুরি	২৬·৪৭	২৩·১৫	৩·৩২
পশুপালন, শিকার, বনজীবিকা	২·৯৪	২·০৬	·৮৮
খনিজ জীবিকা	·৯৩	·৮৮	·০৫
কুটীরশিল্প	২·৬৮	২·৩৩	·৩৫
বড শিল্প	১১·৩৬	১১·০০	·৩৬
নির্মাণকার্য	১·০০	·৯৮	·০২
ব্যবসা বাণিজ্য	৭·৯৩	৭·৭৬	·১৭
পরিবহণ ও সংরক্ষণ	৪·১৮	৪·০৮	·১৮
অন্যান্য চাকরি	১০·৫২	৯·২০	১·৩২

শহর প্রসঙ্গে জীবিকাব কথা এসে পডেছিলো, তাই প্রথমে শহরাঞ্চলের জীবিকা দিয়েই আঞ্চলিক চরিত্রটা দেখা যাক। শহরের মোট লোকসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত। জেলাওয়ারি হিসাবটা হচ্ছে :

মোট শহরবাসী কর্মী-সংখ্যার শতাংশ—হিসাবে ১৯৭১

জেলা	বড শিল্প	পরিবহণ ও সংরক্ষণ	ব্যবসা বাণিজ্য	অন্যান্য চাকুরি	কৃষি	কুটীর-শিল্প
দার্জিলিঙ	১০	২১	২৫	৩৩	৩	৫
জলপাইগুডি	৮	১৯	২৫	২৭	১২	৬
পুরুলিয়া	১৪	২৩	১৯	২৩	১৩	৬
মেদিনীপুব	১২	২৫	১৪	২৩	২১	২
কুচবিহার	১০	১২	২৭	৩৮	৫	৫
মালদা	১০	১১	২৫	৩৭	৫	৪
প. দিনাজপুর	৯	১০	২৯	২৯	১০	৪
মুর্শিদাবাদ	৯	৬	২১	২৫	১৭	১৪
নদীয়া	১৭	৯	২২	২৬	১০	১২
বাঁকুড়া	১১	১১	২০	২৬	১৪	১৫

বীরভূম	১৩	১২	২০	২৭	২২	৩
কলকাতা	২৭	১৪	২৯	২৭	০	১
বর্ধমান	৩৬	১৩	১৯	১২	৭	৩
হাওড়া	৪৭	১৩	১৯	১২	৩	৩
হুগলী	৪৮	৭	১৬	২১	৫	৫
২৪-পরগনা	৪৪	৮	১৬	২৩	৪	৩
পশ্চিমবঙ্গ	৩৩	১২	২১	২৪	৫	৩

উপরের বিভাগগুলো ছাড়া শহরাঞ্চলের আর একমাত্র উল্লেখযোগ্য জীবিকা হল নির্মাণকার্য। নির্মাণকার্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা মোট কর্মীদের ২ শতাংশ। বড় শিল্প, পরিবহণ ও সংরক্ষণ, কুটীরশিল্প এবং নির্মাণকার্য নিয়ে গঠিত যে শিল্পব্যবস্থা, সেখানে মোট কর্মীদের প্রায় অর্ধেকের কর্মসংস্থান হয়েছে, বাকি ৫০ শতাংশ শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে মোটেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। কলকাতা, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী এবং ২৪-পরগনা বাদে অন্যান্য জেলার কর্মসংস্থানরীতিতে শিল্পের ভূমিকা যে নিতান্ত সীমিত তাই-ই নয়, এই-সমস্ত জেলার শহরগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য চাকরির প্রাধান্যটা চোখে লাগার মতো। এমন কি এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মহানগরী কলকাতাও কম যায় না। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু কলকাতাকে যে 'অকাল-পরিণত মহানগরী' আখ্যা দিয়েছিলেন, এটা বোধহয় তার একটা কারণ। পরিবহণ ও সংরক্ষণের গুরুত্বটা মোটামুটি উল্লেখযোগ্য হলেও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে পরিবহণ-ব্যবস্থা স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের সহায়ক না হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করছে। আরও দুটো সিদ্ধান্ত পাঠকদের মনঃপীড়ার কারণ হতে পারে। প্রথমটা হল, অন্তত ছটা জেলার শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের দিক থেকে শিল্প অপেক্ষা কৃষির অবদান বেশি, এবং দ্বিতীয়টা হল কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও বাঁকুড়া জেলার শহরগুলোতে কুটীরশিল্পের ভূমিকা কিছুটা উল্লেখযোগ্য, অন্যান্য অঞ্চলে কুটীরশিল্পে দুর্দশার ছাপ প্রকট।

কুটীরশিল্পের অবস্থা গ্রামবাংলায় আরও খারাপ। মুর্শিদাবাদ বোধহয় একমাত্র জেলা যেখানে গ্রামীণ কুটীরশিল্পের কিছুটা উল্লেখযোগ্য সমাবেশ ঘটেছে। সুতির কাপড়, রেশম, তসর, কাঁসা, তামা, হাতির দাঁত, শোলা, বাঁশ, বেত প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গ্রামীণ শিল্প এখনও প্রাচীন ঐতিহ্যের বাহক হয়ে গ্রামবাংলার এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে—কিন্তু সবই অতীতের

ছিটেফোঁটা মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে পল্লী উন্নয়ন-গ্রামীণ শিল্পোন্নয়নের ধার দিয়েও যায়নি। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা বিশেষ ধারায় আমরা আজ পর্যন্ত যা করে উঠেছি তা হল বড় জমিদারি ভেঙে শাঁসালো একটা মধ্য-চাষী শ্রেণী সৃষ্টি, ছোট চাষীকে ধীরে ধীরে ক্ষেতমজুরির রাস্তা ধরানো, মাহিন্দার আর কিষানকে সরাসরি বেগার দিতে না বলে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলে মজুরি কমানো, অবস্থাপন্ন চাষীকে সেচের জল, সরকারী ঋণ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধের যোগান আর সেই সঙ্গে জায়গায় জায়গায় পাকা সড়ক, হিমঘর, যন্ত্রপাতি এবং প্রাযুক্তিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া। ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৭০-৭১ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অর্থনীতির পরিবর্তনের চেহারাটা মোটামুটিভাবে কয়েকটা নিরিখে ধরা যেতে পারে :

নিরিখ	৫০-৫১	১৯৭০-৭১
চাষে নিযুক্ত নীট জমি (মোট জমির শতাংশ হিসাবে)	৬০	৬২
গ্রামীণ লোকসংখ্যায় মাথাপিছু নীট জমি (একরে)	৬৩	.৪৭
দোফসলী নীট জমি (নীট জমির শতাংশ হিসাবে)	১৮	২৬
মোট ফসলী জমিতে সেচযুক্ত জমির শতাংশ	১৯	২৩
খালদ্বারা জলসেচ (মোট সেচপ্রাপ্ত জমির শতাংশ হিসাবে)	১৩	৫৯
নলকূপ দ্বারা সেচ (মোট সেচপ্রাপ্ত জমির শতাংশ হিসাবে)	০	৮
নীট একর প্রতি মোট উৎপাদনের দাম (চলতি দরে টাকায়) (অবশ্য টাকার মূল্য কমেছে সেটা মনে রাখা দরকার)	২২২	১১৩৯
গ্রামীণ কর্মী-সংখ্যায় নিজচাষে নিযুক্ত কর্মীর শতাংশ	৫০	৪৩
গ্রামীণ কর্মী-সংখ্যায় ভূমিহীন চাষীর শতাংশ	১৯	৩৫
গ্রামীণ জনসংখ্যায় সাক্ষরতার হার শতকরা	১৮	১৬

উপরের সংখ্যাগুলো সবই হয় সেনসাসের সূত্রে নয় কৃষিসংক্রান্ত সরকারী তথ্যের সূত্রে পাওয়া। গত তিন দশকে পল্লীগ্রামে লোকের ভিড় বেড়েছে জমি বাড়েনি, তাই মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমেছে—এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কেননা উৎপাদনও বেড়েছে পরিমাণে এবং টাকার অঙ্কে। জমির ঘাটতি পুষিয়ে দিয়েছে জয়া, পদ্মা, সোনালিকা প্রভৃতি 'ম্যাজিক' বীজ, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ফলিডল, এনড্রিন, খাল আর "শ্যালো"। 'সবুজ বিপ্লব' সত্তরের দশকে গ্রামবাংলার সবচেয়ে বড় স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ রকম অবস্থায় কৃষিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা না বেড়ে উপায় নেই, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে নিজচাষে নিযুক্ত

লোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমল কেন, কিংবা ক্ষেতমজুরের সংখ্যাই বা এভাবে বাড়ল কেন? আরও প্রশ্ন উঠতে পারে, যথা, চাষ-আবাদের হাল ফিরল কিন্তু তার ছাপ গ্রামীণ শিল্পে একেবারেই পড়ল না কেন? কৃষি-অর্থনীতির পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবেন। আমি কেবল কৃষি সম্বন্ধে অনিসন্ধিৎসু একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আরও কয়েকটা তথ্যানুসন্ধান করব। ১৯৫১ এবং ১৯৭১-এর সেনসাসে কি ভূমিহীন চাষীর সংজ্ঞা অপরিবর্তিত ছিল? উত্তর: না। ফলে, হিসাবে কিছুটা গলদ আছে। তাছাড়া ভাগচাষ প্রথা আইনত বন্ধ হয়ে যাবার পরে অনেক ভাগচাষী খাতায়-কলমে ক্ষেতমজুর হয়ে গেছে, কিছুটা ভয়ে, কিছুটা সন্দেহে, কিছুটা নিরুপায় হয়ে নইলে মালিক তাকে পত্রপাঠ জবাব দিতে পারে। ফলে এই ক্ষেতমজুরদের মধ্যে অনেকেই আসলে ভাগচাষী। হিসাবের গলদটা ধরে নিয়েও অনুমান করা যেতে পারে যে বেশ কিছুসংখ্যক ছোটচাষী নানা কারণে পৈতৃক জমিটুকু থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। শিল্পে তাদের জায়গা হয়নি, তাই তারা বাধ্য হয়ে চাষের কাজে এখনও বহাল। ক্ষেতমজুর বাহিনীর এই সংখ্যাধিক্য কি কৃষিতে ক্রমবর্ধমান শ্রমের চাহিদার ফল? বিভিন্ন জেলায় চাষের কাজে দিনমজুরির হার থেকে তা মনে হয় না। স্থানকালবিশেষে এই হারের তারতম্য আছে কিন্তু সাধারণভাবে পুরুষদের দিনমজুরি (১৯৭১-৭২) পুরুলিয়া জেলায় দু-আড়াই টাকা থেকে বাঁকুড়া জেলায় চার-পাঁচ টাকা, মেয়েদের ক্ষেত্রে দেড় টাকা থেকে চার টাকা, আর নাবালকের ক্ষেত্রে এক টাকা থেকে আড়াই টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। গড়ে একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দিনমজুরি কিলোদুয়েক চালের সমান। হারটা ১৯৪৭ থেকে খুব একটা বদলেছে বলে মনে হয় না।

নিজচাষে নিযুক্ত চাষী আর ক্ষেতমজুরের আঞ্চলিক বিন্যাসও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দার্জিলিঙ জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার জেলায় গ্রামীণ কর্মীদের প্রতি একশ জনে মাত্র ১০ থেকে ১৭ জন ক্ষেতমজুরের কাজ করে। পশ্চিম দিনাজপুরেও ক্ষেতমজুরের সংখ্যা খুব বেশি নয়। উত্তর বঙ্গের এই-সমস্ত জেলায় অনেক অংশে চাষবাস বেড়ে উঠে 'আধিয়ারি' ভাগচাষীদের কল্যাণে, যাদের অধিকাংশই হচ্ছে আধা-আদিবাসী; রাজবংশী, কোচ এবং পোলিয়া—এদের ঠিক জাতিও বলা যায় না, আবার উপজাতিও বলা যায় না। শিল্পবিকাশ কিংবা কৃষি-আধুনিকীকরণের আওতার বাইরে অনিশ্চিত প্রাকৃতিক পরিবেশে এখনও এরা জমি আঁকড়ে পড়ে আছে। ক্ষেতমজুরের সংখ্যাধিক্য দেখা যাবে বর্ধমান,

বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী এবং রাঢ় মুর্শিদাবাদের সমতল অঞ্চলে অর্থাৎ সবুজ বিপ্লবের এলাকায়। সম্ভ-গজিয়ে-ওঠা শাঁসালো বড় এবং মধ্য চাষীর সঙ্গে ভূমিহীন মজুরের সহবাস ঘটেছে এই অঞ্চলে। খুঁজে দেখলে এখানেও জায়গায় জায়গায় মাহিন্দারি, কিষানি এবং অন্য নানা রকমের বাঁধা লাগাড়ে মজুরের চিহ্ন এখনও পাওয়া যাবে, তবে অবস্থাটা আগের মতো সামন্ততান্ত্রিক নয়, একথা হলফ করে বলা যেতে পারে। বাগড়ি মুর্শিদাবাদ, নদীয়া আর উত্তর ২৪-পরগনায় ক্ষেতমজুরের সংখ্যা রাঢ়ের থেকে কম, আবার উত্তরবঙ্গ থেকে বেশি। ১৯৪৬ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ওপার বাংলার ঘরহারা লোকেরা দফায় দফায় এই অঞ্চলে এসে ঘর বেঁধেছে। মাটি-আঁকড়ে-থাকা ছোট চাষীদের একটা বড় অংশ হচ্ছে এই উদ্বাস্তু জনসমাজ। তা ছাড়া এ অঞ্চলের আদি অধিবাসী মুসলমান জনসমাজও প্রধানত নিজচাষের ভিত্তিতেই জীবিকা নির্বাহ করে। বীরভূমের সদ্‌গোপ, হুগলী-বর্ধমানের আগুরি এবং হাওড়া-মেদিনীপুরের মাহিষ্য চাষীরা ঐসব অঞ্চলের চাষবাসে যেমন আধিপত্য বিস্তার করেছে, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া আর উত্তর ২৪ পরগনার অনেক অংশে এই মুসলমান চাষী সম্প্রদায় প্রায় সেই রকম ভূমিকা নিয়েছে। পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশেও ক্ষেতমজুরের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু অবস্থা সুখকর নয়। স্বাধীনতার আগে এখানকার আদিবাসী এবং আধা-আদিবাসী ভাগচাষীরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল মালিকের ঘরে তুলে দিত, উৎপাদন যাই হোক না কেন। এখন অবশ্য আধাভাগি বন্দোবস্ত চলছে। কিন্তু সুদের ফাঁদ আরও ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে মজুরির অবস্থাও শোচনীয়।

নিজচাষ আর ক্ষেতমজুরি ছাড়া গ্রামবাংলায় অন্যান্য জীবিকার ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। শতকরা প্রায় ৩জন কর্মীর অন্নসংস্থান হয় ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে, আড়াই জনের কুটীরশিল্প থেকে আর প্রায় ৪ জন জীবিকা নির্বাহ করে পশুপালন, মাছধরা, শিকার এবং বনজ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। কুটীরশিল্পের কথা আগেই বলেছি। মুর্শিদাবাদ ছাড়া মালদা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, পুরুলিয়া আর বাঁকুড়ার হাল কিছুটা ভালো, কিন্তু যে হারে ধানকল, হাস্কিং মেশিন, সার বিক্রির আর কৃষি যন্ত্রপাতির দোকান বেড়েছে সে তুলনায়, হস্তশিল্পের প্রসার প্রায় নগণ্য। রেশম শিল্পের কথাই ধরা যাক। আমারই এক সহকর্মী শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামবাংলা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল লোক, ক্ষেতমজুরদের সংখ্যাধিক্যের কারণটা অনুসন্ধান করতে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে জানিয়েছেন কে

মালদার কালিয়াচকে এক বিঘে তুঁত বা পলু জমির দাম এখন প্রায় ৮০ হাজার টাকা। সারা ভারতে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রেশমী সুতো চালান দেয় কালিয়াচক। অথচ রেশম শিল্পীদের জীবন কাজের অভাবে প্রায় দুর্বিষহ। এর কারণ কী? বীরভূমে তেজহাটি গ্রামে আমি নিজের চোখে দেখেছি তুঁত চাষী, পলু চাষী, সুতো কাটার কারিগর, তাঁতী—এরা সবাই পাশাপাশি বাস করছে, কিন্তু পলু চাষীর ঘরের গুটি সুতো কাটার কারিগরের কাছে আসে মহাজন মারফত তাঁতীর ঘরে সুতো আসে মহাজন মারফত, তাঁতীর ঘরের রেশমী থান কাপড় ধোলাই আর ছাপানোর জায়গায় আসে মহাজন মারফত, শহরের আড়তে যায় মহাজন মারফত, খুচরো বিক্রেতার কাছে যায় মহাজন মারফত। লাভের কড়িতে এত জনের ভাগ থাকলে সে শিল্পের অবস্থা যা হতে পারে তাই হয়েছে। শুধু রেশম নয়, সুতির কাপড, মাটির পুতুল, ধাতুর কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, মাদুর তৈরি, শাঁখের কাজ—সর্বত্রই একই অবস্থা। শুধু কুটীরশিল্প নয়—মাছ ধরা, বনের মধু ও মোম কিংবা বিড়িপাতা সংগ্রহ করা, এমন কি দাঁতনকাঠি করার জন্য নিমডাল, গরুকে খাওয়ানোর জন্য মাঠের ঘাস—যাই হোক না কেন, এই মহাজনি দাদনি ব্যবস্থাকে এড়িয়ে চলা প্রায় অসাধ্য।

গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গে জাত ও বর্ণের সঙ্গে পেশার সম্পর্কটা বহুদিন ধরেই চলে আসছে। কামার, কুমোর, তাঁতী, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, ঢুলি ইত্যাদি জাতের নাম থেকেই তাদের পেশার হদিশ পাওয়া যায়, কিন্তু এ ব্যাপারে আরও গভীরে প্রবেশ করার মতো তথ্যাদির অভাব। নিজ চাষ ও ক্ষেতমজুরির ক্ষেত্রে জাত-ধর্মের প্রভাব হয়তো কিছুটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যদিও পরোক্ষভাবে। পশ্চিমবঙ্গের ১৫টা জেলার মধ্যে, (কলকাতা বাদে) আটটা জেলায় যেখানেই নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং উপজাতি সম্প্রদায় সংখ্যায় বেশি সেখানেই ক্ষেতমজুরির চেয়ে নিজ চাষীর সংখ্যা বেশি। এই আটটা জেলা হল দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হুগলী এবং হাওড়া। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই সব জেলার 'সিডিউলড কাস্ট' এবং উপজাতিরা নিজেদের জমিতেই কাজ করে, যদি না জমির পরিমাণ খুবই কম হয়। ছোট অথচ কিছুটা স্বাবলম্বী চাষীর সংখ্যা বেশি না হলে এই অবস্থার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং মেদিনীপুরে নিজচাষীর সংখ্যা ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের চেয়ে বেশি হলেও এ সমস্ত জেলায় তপশীলী সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা

খুব বেশি নয়। তার মানে এই যে এখানে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ছেলে মাঠে লাঙল ধরতে অভ্যস্ত। আসলে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং মালদায় মুসলমান চাষীদের প্রাধান্যের ফলেই নিজচাষীর সংখ্যা বেশি। মেদিনীপুরের কথা স্বতন্ত্র। মেদিনীপুরের পূর্বাঞ্চলের মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজচাষের ঐতিহ্য বহুদিন থেকেই চলে আসছে। ২৪ পরগনা, বর্ধমান এবং বীরভূমে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা খুবই বেশি। জলসেচের অগ্রগতির সঙ্গে বীরভূমের কিষানি পদ্ধতিতে জমিচাষের বৈশিষ্ট্য স্বাধীনতা-উত্তর কালে অনেক হ্রাস পেয়েছে। এখন মাঠে দিন-মজুরের সংখ্যাই বেশি। আর এই-সমস্ত দিনমজুরের অধিকাংশই আদিবাসী এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু। এরা অনেকেই বীরভূমের বাইরে থেকে ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে বীরভূমে এসেছিলো। বর্ধমানের অবস্থাও প্রায়ই এক। ২৪-পরগনার বিশেষত দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে যারা চাষ-আবাদের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল তাদের অনেকেই ফরিদপুর, খুলনা এবং যশোরের নমঃশূদ্র, পোদ এবং পশ্চিম প্রান্তের মালভূমি-প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের সাঁওতাল এবং মুণ্ডা। এই জেলাগুলোতে নিম্নবর্ণ হিন্দু ও আদিবাসী জনসমাজই ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বাহিনীর সিংহভাগ নিয়েছে। ১৯৭১ সালের গ্রামবাংলায় আঞ্চলিক কর্মসংস্থান এবং তার সঙ্গে জাত-ধর্মের সম্পর্ক নীচের সারণী থেকে কিছুটা অনুধাবন করা যেতে পারে:

	গ্রামীণ কর্মীসংখ্যা শতকরা					জনসংখ্যায় শতকরা		
জেলা	নিজ চাষ	ক্ষেত মজুরি	পশুপালন, মাছধরা, শিকার, বনবৃত্তি	কুটীর শিল্প	ব্যবসা বাণিজ্য	তফশিলী হিন্দু	তফশিলী উপজাতি	মুসলমান
দার্জিলিঙ	৪০	১২	৩৩	১	৩	১৩	১৪	৩
জলপাইগুড়ি	৪৩	১১	৩১	১	৪	৩৪	২৪	৯
কুচবিহার	৭২	১৭	১	২	২	৪৭	২	২১
পঃ দিনাজপুর	৬১	৩০	১	১	২	২৩	১২	৩৬
পুরুলিয়া	৪৮	৩৬	১	৩	২	১৫	২০	৫
বাঁকুড়া	৪৫	৪২	১	৩	২	২৮	১০	৫
হাওড়া	২৭	৩৭	১	৩	৭	১২	—	১৮
হুগলী	৩৬	৪১	১	৩	৫	১৯	২	১৩
নদীয়া	৪৬	৩২	৩	৪	৪	২১	১	২৩
মুর্শিদাবাদ	৪৩	৩৮	২	৬	৩	১২	১	৫৬

মালদা	৩৮	৩৬	৩	৩	৩	১৬	৮	১৩
মেদিনীপুর	৪৯	৩৬	১	৩	২	১৪	৩	৮
২৪ পরগনা	৫৮	৬২	১	২	৭	২৩	২	২৪
বর্ধমান	৩০	২৯	২	২	৩	২৫	৬	১০
বীরভূম	৫০	৫৭	১	১	১	৩০	৮	২৯
কলকাতা	—	–	—	—	—	৭	—	১৫
পশ্চিমবঙ্গ	৪৩	৩৫	১	৩	২	২০	৬	৪০

উপরের সংখ্যাগুলো থেকে মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম এবং ২৪ পরগনার স্বাতন্ত্র্য সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু বৃত্তি এবং জাতধর্মের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকলেও সেটা যে কোনো একসূত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা যায় না এটাও বোধহয় সুস্পষ্ট। এই সম্পর্ক হয়তো অনেকটা সরল হতে পারত যদি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরনের মানুষ তাদের আদি বাসভূমিতে অনড় এবং অচল থেকে জীবিকানির্বাহ করত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনসমাজ বহুদিন থেকেই অন্যান্য স্থানের মানুষকে পশ্চিমবঙ্গে স্থান দিয়েছে। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৬ শতাংশ লোক ছিল যাদের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গ নয়। এদের মধ্যে অনেকেই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু, কিন্তু উদ্বাস্তু জনসাধারণ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে এবং কিছু পরিমাণে বহির্ভারত থেকে অনেকে প্রধানত জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। আজকে এরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। এদের জীবিকাপদ্ধতি বৃত্তি এবং জাতধর্মের সম্পর্ককে বেশ কিছু পরিমাণে জটিল করে তুলেছে। আমরা যতদূর সংক্ষেপে পারা যায়, এই বহিরাগত জনসমাজের আঞ্চলিকতার দিকটা আলোচনা করব। ১৯৬১ সালে এদের আঞ্চলিক বন্টন ছিল নিম্নরূপ :

জেলা	লোকসংখ্যায় বহিরাগতের শতাংশ			প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা — মোট লোকসংখ্যায়			প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা — বহিরাগত লোকসংখ্যায়		
	গড়ে	গ্রামে	শহরে	গড়ে	গ্রামে	শহরে	গড়ে	গ্রামে	শহরে
দার্জিলিং	২৫	১৯	৪৩	৮৬৪	৯০৭	৭৩১	৬৬২	৭৪৫	৫৫১
জলপাইগুড়ি	৩১	২৯	৫১	৮৫৪	৮৬৩	৭৬৮	৭২০	৭২৩	৬৯৬
কুচবিহার	২৮	২৬	৫০	৮৯০	৮৯৯	৭৭৪	৭৩২	৭৭৮	৪৬৪
প. দিনাজপুর	১৮	১৫	৬০	৯০৬	৯১৪	৮২১	৮৫৬	৮৯৪	৭৪৯
কলকাতা	৪২	—	৪২	৬১২	—	৬১২	৪১২	—	৪১২

নদীয়া	৩১	২৮	৩৯	৯৪৮	৯৫৬	৯৩৩	৮৮৮	৯২৩	৭৮৫
২৪ পরগনা	১৮	৮	৩৯	৮৬৬	৯০২	৭৩৭	৭০৭	৮৫৬	৬৫৩
হাওড়া	১৪	৩	৩১	৮০৮	৯৪০	৬৪৪	৩৭০	৪৯৩	৩৬৬
বর্ধমান	১৪	১০	৩৩	৮৫৮	৮৯৮	৮৯৯	৫৫৫	৫৩৬	৫৮১
হুগলী	১৩	৫	৩৭	৮৯২	৯৪৮	৭৪৯	৫৫২	৫৭১	৫৪৫
মালদা	৮	৭	২৮	৯৬৫	৯৬৯	৮৭৩	১০৩২	১০৭২	৮১৯
পুরুলিয়া	৪	৩	২৫	৯৭৩	৯৭৯	৮০৩	১১৯১	১২৫৯	৫২৪
বীরভুম	৫	৪	১৮	৯৭৩	৯৮৪	৮৪৪	১০৮৭	১৩৭০	৫৬৬
মুর্শিদাবাদ	৪	৩	১৩	৯৭৭	৯৭৯	৯২০	৯০৪	৮০৮	৬৬৮
মেদিনীপুর	৩	২	১৭	৯৫২	৯৬৩	৮৮৯	১৮৯৩	২৪২৮	৯৯৪
বাঁকুড়া	২	১	৭	৭৭১	৯৮৭	৯০৫	৯৮১	১০৭৮	৬৭০
পশ্চিমবঙ্গ	১৬	৯	৩৭	৮৭৮	৯৩৭	৮০১	৬৮৪	৮০৯	৫২৪

উপরের জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান থেকে সরাসরি কয়েকটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। বহিরাগতদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ শহরে এসে বাসা বেঁধেছে। প্রত্যেক জেলাতেই গ্রামের তুলনায় শহরে এদের ভিড় অনেক বেশি। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এদের অধিকাংশই ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি এবং শিল্প-আশ্রয়ী। এদের অনেকেরই পরিবারবর্গ তাদের নিজস্ব মুলুকেই থেকে গেছে, পশ্চিমবঙ্গে বাস করছে প্রধানত 'কর্মী' পুরুষেরা। পুরুষ-নারীর অনুপাতের সংখ্যাগুলো থেকেও এইরকম ধারণাই জন্মে। তবে গ্রামাঞ্চলে ভিন রাজ্যের লোকেরা অনেক ক্ষেত্রেই যে সপরিবারে বসবাস আরম্ভ করেছে তার হদিশও পাওয়া যায় এই পুরুষ-নারী অনুপাতের আঞ্চলিক হেরফের থেকে। বীরভূম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের গ্রামীণ বহিরাগত লোকসংখ্যায় নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশি। এই জেলাগুলো আবার বাইরের লোক তেমন টানতে পারেনি যেমন টেনেছে কলকাতার কাছাকাছি শিল্পাঞ্চল এবং উত্তরবঙ্গ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই ছটা জেলায় শিল্পবিকাশ ঘটেছে খুবই কম, উপরন্তু পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এই অঞ্চলের কৃষিও খুব একটা উন্নতি করতে পারেনি। এই জেলাগুলোর গ্রামাঞ্চলে বহিরাগত জনসংখ্যায় নারীর প্রাধান্য একটা ইঙ্গিত দেয়। হয়তো প্রাথমিকভাবে ভিন রাজ্যের লোকেরা সপরিবারে এই সমস্ত অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করেছিলো, কিন্তু পরবর্তী কালে কাজের সন্ধানে পুরুষ কর্মীদের অধিকাংশ শহরাঞ্চলে এসে বসবাস

করছে আর মেয়েরা সংসার এবং টুকিটাকি জীবিকা নিয়ে পাকাপাকিভাবেগ্রামেং বাস করছে। এই অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে রাজ্যের জনসংখ্যার আভ্যন্তরিক পুনর্বন্টন-প্রক্রিয়ায় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত হল : বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর এবং নদীয়া থেকে (১৯৬১ সালের হিসাবে) লোক বেরিয়ে যাবার তাগিদ লক্ষ্য করা যায়; কলকাতা, হুগলী, বর্ধমান এবং হাওড়ায় আগমন এবং নির্গমন দুটোই বেশি, এবং দার্জিলিঙ, ‑লপাইগুড়ি, কুচবিহার, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া ও ২৪-পরগনায় গমনাগমন খুবই কম। ১৯৫১ সালে এই পরিস্থিতি একটু অন্যরকম ছিল এই অর্থে যে বাঁকুড়া ও বীরভূমে তার আগে পর্যন্ত লোক আগমন-নির্গমন দুই ই বেশি ছিল। ১৯৭১-এ পরিস্থিতির বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি।

আগেই বলেছি যে বহিরাগত লোকসংখ্যার একটা বিরাট অংশ নির্ধারণ করে পূর্ববঙ্গ-আগত উদ্বাস্তরা। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর থেকে ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পর্যন্ত পালে পালে মানুষ ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এসেছে। আজ পর্যন্ত এদের সংখ্যা ৪৫-৫০ লক্ষ। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের তথ্যানুযায়ী উদ্বাস্তু আগমনের হার :

১৯৪৬-১৯৫০ সাল পর্যন্ত ·········২০,৪২,০০০
১৯৫১-১৯৬০ সাল পর্যন্ত ···· ···১১,৩০,০০০
১৯৬০-১৯৭০ সাল পর্যন্ত·········১০,৩৭,০০০

১৯৫০ সাল অবধি উদ্বাস্তু আগমনের হার প্রবল মাত্রায় চলেছিল। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই ঘরছাড়া মানুষের দল কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো তার ছবিটা নিচে দিলাম :

জেলা	উদ্বাস্তু জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে	জেলা	উদ্বাস্তু জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যাব শতাংশ হিসাবে
২৪-পরগনা	৫,২৭,২৬২	১১.৪৪	মালদা	৬০,১৯৮	৬.৪২
কলকাতা	৪,৩৩,২২৪	১৭.০০	মুর্শিদাবাদ	৫০,১২৯	৩.৪২
নদীয়া	৪,২৬,৯০৭	৩৭.২৯	হুগলী	৫১,১৫৩	৩.২৯
প.দিনাজপুর	১,১৫,৫১০	১৬.০৩	মেদিনীপুর	৩৩,৫৭৯	১.০০
কুচবিহার	৯৯,৯১৭	১৪.৮৯	দার্জিলিঙ	১৫,৭৩৮	৩.৫৩
জলপাইগুড়ি	৯৮,৫৭২	১০.৭৮	বীরভূম	১১,৭৮৩	১.১০
বর্ধমান	৭৬,১০৫	৪.৩৯	বাঁকুড়া	৯,২৯৫	.৭০
হাওড়া	৬১,০৭৬	৩.৭৯	পশ্চিমবঙ্গ	২০,৯৯,০৭১	৭.৪৬

১৯৬১ এবং '৭১-এ পরিস্থিতি নিশ্চয়ই পালটেছে কিন্তু উত্তরবঙ্গ এবং নদীয়া, ২৪-পরগনা ও কলকাতার উদ্বাস্তুদের ভিড় বেড়েছে বৈ কমেনি। এই উদ্বাস্তু জনসাধারণকে স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার পরিসরে পুরোপুরি পুনর্বাসিত করা এখনও সম্ভব হয়নি। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৩ লক্ষ উদ্বাস্তু জনসাধারণকে পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যে এবং আরও প্রায় সাড়ে চার লক্ষকে অন্যান্য রাজ্যে পুনর্বাসিত করা সম্ভব হয়েছিল, বাকী ১৪-১৫ লক্ষের ব্যবস্থা তখনও হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা একটু বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুরা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ পেয়েছে, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পক্ষে আইনের এই সুযোগটা ছিল না। ক্ষতিপূরণের শর্ত এদের ক্ষেত্রে বলবৎ হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারী যারা দলিল-দস্তাবেজ বহু বছরের হতাশার ফলে ইতিমধ্যেই হারিয়ে ফেলেছে তাদের কাছে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটা অনেকদিন আগেই নিরর্থক হয়ে গেছে। তারা পিছনের পাট চুকিয়ে ফেলে শহরতলী আর মফস্বলে নতুন নতুন কলোনি গড়ে তুলেছে যেখানে চাষের সুযোগ সেখানে এরা মাটি আঁকড়ে রয়েছে, অন্যথায় কলকারখানা, অফিস-কাছারি ও টুকিটাকি ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই এরা নিজেদের পুনর্বাসিত করছে ধীরে ধীরে। প্রাথমিকভাবে শহরমুখী অভিপ্রায় থাকলেও প্রকৃত শহরে এদের অনেকেরই জায়গা হয়নি। দমদম, পানিহাটি, কামারহাটি, গার্ডেন রীচ, কলকাতার দক্ষিণ শহরতলী অঞ্চল, ট্যাংরা কসবা, তোপসিয়া, টালিগঞ্জ, গড়িয়া প্রভৃতি জায়গায় স্যাঁতসেঁতে, ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এখনও লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু নরনারী অর্ধাহার আর অশিক্ষার গ্লানি নিয়ে আত্ম-পুনর্বাসনের চেষ্টায় তৎপর। সারা পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু জনসাধারণের প্রায় ৬-৭ লক্ষের কোনও রুচিপূর্ণ কর্মসংস্থান এখনও হয়ে ওঠেনি। যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে (১৯৬১ সালের হিসাবে) শতকরা প্রায় ৩৪ জন কৃষিতে নিযুক্ত, ২৫ জন চাকরিতে, ২১ জন শিল্পে, ১৩ জন ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং প্রায় ৭ জন পরিবহণে। সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের আদি-অধিবাসীদের তুলনায় এরা চাষ-আবাদের চেয়ে শহরাঞ্চলের জীবিকা বেছে নিতেই বাধ্য হয়েছে। অবশ্য জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ায় চাষ-আবাদই এদের শতকরা ৪১-৭১ জনের অন্ন জোগায়। হাওড়া, হুগলী, এবং বর্ধমানে এরা প্রধানত (৪২-৬৬ শতাংশ) পরিবহণ এবং শিল্প-জীবী আর দার্জিলিঙ, বীরভূম, বাঁকুড়া, ২৪-পরগনা,

মেদিনীপুর এবং কলকাতায় শতকরা ৪৯ থেকে ৬১ জন চাকরিজীবী।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের বাদ দিলে বাইরে থেকে যারা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশেরই মাতৃভাষা বাংলা নয়। পশ্চিমবঙ্গের ভাষাগত বৈচিত্র্যের সমকালীন মানচিত্রটা পাওয়া সম্ভব নয়, এ ব্যাপারে যা কিছু বক্তব্য সবই ১৯৫১ সালের লোকগণনার ভিত্তিতে বলতে হবে। ১৯৬১ র হিসাব হাতের কাছে নেই। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৪·২০ ভাগ ছিল বাংলাভাষী, ৫·৪২ ভাগ হিন্দীভাষী, ৩·২১ ভাগ সাঁওতালীভাষী, ০·৬১ ভাগ ওড়িয়াভাষী এবং বাকী ৬·৫৬ ভাগ অন্যান্য ভাষাভাষী। মোট হিন্দী-ভাষীদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশই কলকাতা, ২০-পরগনা, হুগলী, হাওড়া এবং বর্ধমানের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী। ওড়িয়াভাষীদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা তবে উড়িষ্যার সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলাতেও ওড়িয়া-ভাষীদের সমাবেশ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে ছবিটা একটু আলাদা কারণ উল্লিখিত জেলাগুলোতে এদের মাত্র ৩৬ শতাংশের বাস। সাঁওতালী-ভাষীদের প্রায় ৯৩ শতাংশ পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদার অধিবাসী।

হিন্দী ও ওড়িয়াভাষীদের আঞ্চলিক বণ্টনের সঙ্গে যেমন শহুরে অর্থনীতির সম্পর্ক এক নজরেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তেমনই সাঁওতালী-ভাষার সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির যোগাযোগও অতিমাত্রায় সরল। বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া এবং সাঁওতালী ভিন্ন অন্যান্য ভাষাভাষীদের ভিড় হুগলী-দামোদরের আশপাশ ছাড়া উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদা জেলাতেও প্রবল। নেপালী এবং বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষাভাষীদের সমাবেশের ফলেই উত্তরবঙ্গের এই অবস্থা। এর মধ্যে দার্জিলিঙ জেলা সত্যিই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কেননা এই জেলার মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৮ শতাংশের মাতৃভাষা বাংলা। দার্জিলিঙ বাদে অন্য যে দুটো জেলায় বাংলাভাষী বাঙালীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম তারা হল কলকাতা (৬৪ শতাংশ) এবং জলপাইগুড়ি (৫৫ শতাংশ)।

১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিবাসী এবং উপজাতির লোক পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫·৭২ শতাংশ। ছোট বড় মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫১টা উপজাতীয় সম্প্রদায় আছে। এদের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (১,৩৭৬,৯৮০) আর বিরজিয়াদের সংখ্যা সবচেয়ে কম (১৬)। বাসভূমি, ভাষা, ধর্ম, জীবিকা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকে

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ থেকে এরা অনেকাংশে পৃথক। প্রথমত, মহানগরী কলকাতা থেকে উত্তরে এবং পশ্চিমে দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী এবং উপজাতীয় জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়—অতএব শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু থেকে এরা দূরে সরে আছে। ধর্মে এরা অধিকাংশ হিন্দু হলেও এখনও প্রায় শতকরা ২ জন প্রকৃতি এবং বিভিন্ন অপদেবতার উপাসক এবং শতকরা প্রায় ৩ জন খ্রীষ্টান। মুসলমান এবং বৌদ্ধ আদিবাসীও দেখা যায়, তবে তারা সংখ্যায় নগণ্য। ভাষার ব্যাপারে এদের প্রত্যেক গোষ্ঠীরই নিজস্ব ভাষা আছে যা প্রায় কোনক্ষেত্রেই পঠনপাঠনের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। তাই কাগজে-কলমে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকলেও আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার আজ পর্যন্ত নিতান্তই সীমিত। সারা পশ্চিমবঙ্গে যেখানে আদিবাসী ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সাক্ষরতার হার হাজারে ৩৫৬, সেখানে আদিবাসীদের মধ্যে হাজারে মাত্র ৮৯। এর মধ্যে আবার বর্ধমান, হুগলী, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের সবুজ বিপ্লব-তীর্থে গ্রামীন আদিবাসীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে কম। অথচ দার্জিলিঙ, বাঁকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ির অপেক্ষাকৃত অনুন্নত কৃষি অঞ্চলে আদিবাসী সাক্ষরতার হার তুলনামূলকভাবে বেশি। হয়তো দ্বিতীয় অঞ্চলের ভিটেমাটি ছাড়া অশিক্ষিত লোকগুলোই প্রথম অঞ্চলে দিনমজুরের চাহিদা মেটাচ্ছে বহুলাংশে। নগরসভ্যতা প্রায় সর্বতোভাবেই আদিবাসীদের আওতার বাইরে থেকে গেছে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৪·৭৬ শতাংশ শহরবাসী সেখানে আদিবাসী জনসংখ্যার মাত্র ২·২৬ শতাংশ শহরে থাকে। কিন্তু যে কোন অবস্থায় যে কোন জীবিকা নিয়ে দিন গুজরান করতে এরা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে যে আরও উদগ্রীব তার প্রমাণ হয় নিচের পরিসংখ্যান থেকে :

জনসংখ্যা কর্মীর সংখ্যা (শতকরা)

সম্প্রদায়	পুরুষদের মধ্যে			নারীদের মধ্যে			সাকুল্যে
	গ্রামে	শহরে	মোট	গ্রামে	শহরে	মোট	
আদিবাসী	৫৫	৫১	৫৪	২০	২২	২০	৩৮
অন্যান্য সম্প্রদায়	৪৮	৫০	৪৯	৩	৪	৩	২৭

জীবিকার চরিত্রের দিক থেকে একমাত্র দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, বর্ধমান, কুচবিহার ও হাওড়া ছাড়া অন্যত্র কৃষিই একমাত্র সম্বল। দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়িতে (এবং কিছু পরিমাণে) কুচবিহারে কৃষির সঙ্গে পশুপালন ও একটা

উল্লেখযোগ্য উপজীবিকা। জলপাইগুড়ির আদিবাসী সমাজের শতকরা ৫৬ জন কর্মীই পশুপালন থেকে জীবিকা সংগ্রহ করে। হাওড়ার আদিবাসীদের প্রায় অর্ধেক শিল্পব্যবস্থায় জড়িত এবং বর্ধমানে আদিবাসী কর্মীদের প্রায় একদশমাংশ কাজ করে আসানসোল-রানীগঞ্জের কয়লা-খনিতে। যারা কৃষিজীবী তাদের মধ্যে বাঁকুড়া বাদে দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য নটা জেলায় নিজচাষীর চেয়ে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বেশি।

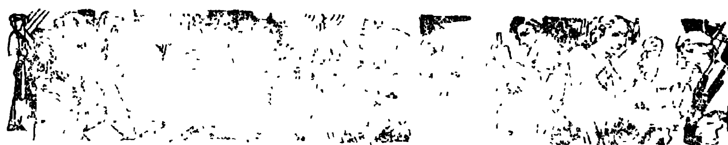
পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এবং জনজীবিকা নিয়ে আরও হয়তো অনেক কথাই বলা চলতো, কিন্তু স্থানাভাবে আর বেশি এগুনো সম্ভব নয়। মানচিত্র ও মানুষ সম্বন্ধে আর মাত্র কয়েকটা অভিমত জ্ঞাপন করে এই রচনার ইতি টানবো। আজকের পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক অগ্রসরতার মূল কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে কৃষি। প্রাক-স্বাধীনতা যুগ থেকে হয়তো উৎপাদন-ব্যবস্থায় অনেক বাহ্য পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু মূল সূত্রটা একই থেকে গেছে। হয়তো পশ্চিমবঙ্গের মূল সংস্কৃতিতেই এই ধারাটা গেড়ে বসে গেছে ঔপনিবেশিক আমল থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন গ্রামীণ কুটীরশিল্প কিংবা পশ্চিমের লালমাটি অঞ্চলের ধাতুশিল্প সমুদ্রপারের সস্তা মালের বন্যায় ভেসে গেল, রেল লাইনের স্লিপারের কাঠ যোগান দিতে ঘন শালবন পর্যবসিত হল ঊষর মরুপ্রায় ডাঁড় এবং ডাঙা জমিতে, তখন থেকেই এ অঞ্চল তার নিজস্ব অর্থনীতি হারিয়ে ফেলে বাংলার একটা অপ্রয়োজনীয় লেজুড় হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অথচ তসর, লাক্ষা, ধাতুশিল্প, দামী কাঠ, বাঁশ-পাথরের কাজ, জ্বালানি কাঠ নিয়ে এর একটা নিজস্ব অর্থনীতি ছিল—কৃষি এখানে ছিল গৌণ উপজীবিকা। কিন্তু এখন বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪-পরগনা, হাওড়া, পূর্ব বীরভুম প্রভৃতি উর্বর পাললিক অঞ্চলের কৃষি-অগ্রসরতার নমুনাটাই বোধহয় আমাদের মাথায় সর্বদা খেলা করে। তাই পুরুলিয়া, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর কিংবা পশ্চিম বীরভূমে চাষের জলের অভাব থাকলেও চাষ নিয়েই মাথাব্যথা, বিকল্প অর্থনীতির কথা হয়তো মনে আসে কিন্তু পাকাপাকিভাবে ঠাঁই পায় না। উত্তরবঙ্গে খরিফ খন্দে জলের আধিক্য, বন্যার প্রকোপ এবং ফলনের অনিশ্চয়তা থাকলেও বন্যার বাড়তি জল ধরে রেখে রবিচাষ জোরদার করার চিন্তাও একইভাবে উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যায়। বন্যা-নিরোধ, জলসেচ, সার, কীটনাশক, রাস্তাঘাট, হিমঘর, দো-ফসলী কিংবা তে-ফসলী চাষ—সবই এসে জড়ো হয় সেইসব জায়গায় যেগুলো আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগেও যথেষ্ট সমৃদ্ধিমণ্ডিত ছিল। কিন্তু পুরুলিয়া

কিংবা বাঁকুড়ার পাথুরে লালচে মাটিতে সবুজ ফসলের আশা দুরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। ওদিকে অরণ্য মৃতপ্রায়, কুটীরশিল্পের বাজার মন্দা, জীবিকার অভাব। অদৃষ্টের পরিহাসে লালমাটির দেশের খরা আর নাবাল অঞ্চলের বন্যা দীনদরিদ্রের কাছে জীবিকার পরিবর্ত হিসাবে শাপে বর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আর কিছু না থাকলে কি বছর খরাত্রাণ ও বন্যাত্রাণের করুণাটা অন্তত পাওয়া যাবে।

আরেকদিকে শিল্পোৎপাদন কিংবা নগরবিকাশের কথা ধরা যাক। আসানসোল-রানীগঞ্জের কয়লা আর কলকাতার বাজার ও বন্দরের সুযোগ-সুবিধার বাইরে প্রকৃতপক্ষে কতটা শিল্পোদ্যম হয়েছে? অথচ শহর-গঞ্জকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। এটাও ঐতিহ্য। উৎপাদনে ঘাটতি থাকলেও ব্যবসাতে ঘাটতি থাকলে চলবে না। ফড়িয়া বৃত্তি, দালালি, দাদনি, মহাজনি তাই অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। খয়রাতি দিতে হয় আদপে সেই শ্রমিককে। মাঠের কাজে দিনমজুরি তাই অনন্তকাল ২ কিলো চালের বেশি ওঠে না। বড় কারখানার শ্রমিকেরা আন্দোলন করবে মজুরি বাড়ানোর জন্য, তাই বড় শিল্পের মাল তৈরি হয় কারখানার বাইরে ব্যাঙের ছাতার মতো অজস্র ক্ষুদে কারখানায় যেগুলোতে ৫-৬ জন শ্রমিক নামমাত্র মাইনেতে মুখ বুজে কাজ করতে রাজী। কোন প্রাকৃতিক কিংবা কোন্ সাংস্কৃতিক পরিবেশে কী মাল তৈরি হবে, কী মাল বিক্রি হবে তা নির্ধারিত হয় বুড়ো আঙুলের বিচারে। পাঠকগণ আমার শেষ পর্বের শ্লেষোক্তি মার্জনা করবেন। কিন্তু সমকালীন পশ্চিমবঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহাররীতি, তদ্ভুত জীবিকার ধারা, তৎপ্রভাবিত জন-সমাজ এবং সেই জনসমাজের মানচিত্র আমার কাছে, 'তেলা মাথায় তেল ঢালা' প্রক্রিয়ার নামান্তর। বিভিন্ন সংখ্যা এবং সংজ্ঞা দিয়ে হয়তো একথা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু নানা ধরনের জটিলতার মধ্যে থেকেও ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই পাঠকদের মনে কয়েকটা ধারণা দানা বেঁধেছে—একদিকে অনুন্নত কারা, তারা কী কাজ করে, কোথায় থাকে, অপরদিকে উন্নয়ন কোথায় হয়েছে, সেখানকার লোকের জীবিকা কী, সেখানে কারা থাকে। দুটো ছবি পাশাপাশি মিলালে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র আমীরি আর গরিবি—দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এ দুয়ের একটা বস্তুত আরেকটারই উল্টো পিঠের ছবি।

শিক্ষার ক্রমবিবর্তন

জ্যোতি ভট্টাচার্য



এই বিষয়ে বিচার-বিবেচনার প্রথম সমস্যা তথ্য নিয়ে। সরকারী সূত্রে যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের কারণ আছে। সাধারণ সন্দেহ ছাড়াও বিশেষ সন্দেহের কারণ হল, তথ্যগুলি পরস্পর সঙ্গতিবিহীন এবং এক সরকারী সূত্রের তথ্যের সঙ্গে একই বিষয়ে আরেক সরকারী সূত্রের তথ্য মেলে না। গুরুতর গরমিলের এ-রকম একটি কুখ্যাত দৃষ্টান্ত হল বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা সম্বন্ধে ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাব ও ভারতসরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের হিসাবে গরমিল।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের হিসাব অনুসারে ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে ভারতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মোট সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭০ হাজার। ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাবে এই সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার। এই গরমিলটার চেয়েও বড় গরমিল দেখা যায়—শিক্ষামন্ত্রকের হিসাবে বিদ্যালয়গুলির ১ম-৮ম শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মোট সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১৬ লক্ষ ৯০ হাজার; লোকগণনার হিসাবে

দেখা যায় ঐ সময়ে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছাত্রছাত্রীর [এদের বেশির ভাগই ১ম ৮ম শ্রেণীতে পড়বার কথা] মোট সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ। শিক্ষামন্ত্রকের হিসাব যে গুরুতরভাবে ফাঁপানো (inflated) তাতে সন্দেহ নেই। [Review article by A. R. Kamat, Economic and Political Weekly, April 29, 1972]

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার যেসব হিসাব সরকারী দপ্তরে পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে যে অনেকখানিই ভেজাল—এ কথা প্রায় সর্বজনবিদিত। শুধু ভারত নয়, এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলির প্রায় সর্বত্র এ-রকম তথ্যের হিসাবে গরমিল এবং কারচুপি প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীদের পর্যন্ত পদে পদে বিড়ম্বিত করে থাকে। দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলিতে সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসঙ্গে গনার মির্ডাল মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন—'পরিসংখ্যান অত্যন্ত নিম্নস্তরের', এবং 'এ অঞ্চলে সাক্ষরতার সম্বন্ধে প্রদত্ত তথ্যগুলি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়', ["Extremely poor quality of the statistics", "The data on literacy in the region are completely unsatisfactory"—Gunnar Myrdal, Asian Drama, Abridged by S. S. King, Allen Lane Penguin Press, 1971, Ch. 25] এবং, "তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ফাঁপিয়ে দেখানোর ঝোঁক সবচেয়ে বেশি দেখা যায় অত্যন্ত দরিদ্র দেশগুলিতে, যথা, ভারত, পাকিস্তান,...... ।" ["This bias towards inflation of the statistics on enrolment is most accentuated in the very poor countries...such as Pakistan, India,...," Ibid, Ch. 26]

তথ্যপরিবেশন ও পরিসংখ্যানের এই দুর্দশা চিরকাল ছিল না, সব দেশেও দেখা যায় না। স্মরণ করা যেতে পারে যে কার্ল মার্কসের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডাস কাপিট্যাল'-এর অনেকখানি অংশ ব্রিটেনে ফ্যাক্টরি ইনস্পেকটরদের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। মার্কস স্বয়ং কাপিট্যাল গ্রন্থের প্রথম জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধে ইংলণ্ডের ফ্যাক্টরি ইনস্পেকটর, মেডিকাল রিপোর্টার, তদন্ত কমিশনারদের উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন ["...if it was possible to find for this purpose men as competent, as free from partisanship and respect of persons as are the English factory-inspectors, her medical reporters on public health, her commissioners of inquiry into the exploitation of women and children, into housing and

food."—Karl Marx, Capital, Vol. I, 'Preface to the First German Edition', Foreign Languages Publishing House, Moscow, n. d., p 9]।

স্মরণ করা যেতে পারে যে রুশদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্বন্ধে লেনিনের বিখ্যাত গ্রন্থের অনেকখানি জারশাহী শাসনের অধীনেই আধা সরকারী 'জেমস্তভো'-প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত পরিসংখ্যান।

তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে ফাঁকিবাজি, কারচুপি এবং আলস্য-ঔদাসীন্য-প্রসূত অকর্মণ্যতা,—এটাই এদেশে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মূল ব্যাধির একটা লক্ষণ। যে শিক্ষাব্যবস্থা দেশের উচ্চতম প্রশাসনিক পর্যায়েও বৈজ্ঞানিক তথ্য-নিষ্ঠা, সততা, আদর্শানুরাগ ও কর্মনৈপুণ্য জাগাতে পারে না, সে শিক্ষাব্যবস্থা স্বয়ং-ধিকৃত।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ক্রমবিবর্তনের পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমেই এই বিশাল ব্যর্থতা চোখে পড়ার কথা। পরিসংখ্যানের অঙ্কের আড়ালে এই কথাটা কিন্তু সচরাচর চাপা পড়ে যায়। সাক্ষরদের শতকরা হার কিছুটা বেড়েছে, গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীদের সংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ টাকার অঙ্কে বেড়েছে, ইত্যাদি অনেক কিছু বেড়েছে। কেউ বলবেন, বৃদ্ধির হার অত্যন্ত কম, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের তুলনায় অগ্রগতি এত শ্লথ যে কার্যত পেছিয়ে যাওয়া হচ্ছে; উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির হার ও সরকারী খরচের পরিমাণের তুলনায় প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির হার ও সরকারী খরচের পরিমাণ অনেক কম; ইত্যাদি। সরকারী মহল বলবেন, এসব কম হলেও বেশ কিছু অগ্রগতি হচ্ছে, কিছু উন্নতি হচ্ছে, যা হচ্ছে গরিব দেশের পক্ষে তা খুব সামান্য নয়, ইত্যাদি। যে কথা চাপা পড়ে যায় তা হল মর্যাদাসম্পন্ন মনুষ্যত্বের ক্ষয় হচ্ছে, শিক্ষার প্রাণস্বরূপ যে আদর্শবোধ সেই আদর্শবোধ উবিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমান কালের ভারতে শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাঁরা অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে জে পি নায়েক নিশ্চয়ই প্রথম সারির লোক। ১৯৬৫ সালে জে পি নায়েক ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতি সম্পর্কে

লিখেছিলেন, "গত ১৬ বছর ধরে যা করা হয়েছে তা হচ্ছে পূর্বতন ব্যবস্থারই আয়তন বৃদ্ধি ; শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে সামান্য কিছু প্রান্তিক পরিবর্তনই মাত্র করা হয়েছে" [What has happened in the last sixteen years is merely an expansion of the earlier system with a few marginal changes in content and techniques"—quoted by Myrdal, op. cit., Ch 26]। ১৯৬৪-৬৬ সালের শিক্ষাকমিশনে জে পি নায়েক ছিলেন সেক্রেটারি। শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টেও বলা হয়েছিল—"প্রায় এক শতাব্দী আগে আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ; সাম্প্রতিককালের কয়েক বৎসরে আমরা সেই শিক্ষাব্যবস্থার অনেক প্রসার ঘটিয়েছি ; এই শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলি এক শতাব্দী আগে যা ছিল এখনও মূলত তাই-ই আছে।" [' during recent years, we have greatly expanded a system which continues to have essentially the same features it had at its creation about a century ago."—Report of the Education Commission, 1961-66, Ministry of Education, Govt. of India, 1966, p. 6, para 1·19]। এসব কথা ১৯৬৪-৬৬ সালে যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনই সত্য। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর থেকে একটি বিষয়ে গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে, যেটি জে পি নায়েক বা শিক্ষাকমিশন উল্লেখ করেননি। সরকারী কোন দলিলে তার উল্লেখ প্রত্যাশাও করা যায় না। এই পরিবর্তনটি শিক্ষার অন্তঃপ্রেরণা আদর্শবোধের ক্ষেত্রে। বিদেশী শাসনের সময়ে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অনুচর-[illegible] তৈরি করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে ব্যবস্থা যে খর্বচরিত্র, পঙ্গু ও হীনদশাগ্রস্ত ছিল সেকথা আমরা সবাই জানি ও বারবার বলে থাকি। কিন্তু সেই সময়েই যে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার সজীব কল্পনাও গড়ে উঠেছিল, সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরেও একটি প্রতিবাদী প্রায়-স্বাবলম্বী ধারা সৃষ্টি হচ্ছিল সে কথাটাকে আমরা সবসময় খেয়াল রাখি না। দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাকামী, মুক্তিসন্ধানী, মর্যাদাবান মনুষ্যত্বের কল্পনায় অনুপ্রাণিত বহু শিক্ষানুরাগী সে সময়ে আদর্শবোধের এই ধারাকে বহন করেছেন, নানাজনে নানাভাবে তাকে পুষ্ট করেছেন। এই প্রতিবাদী ধারার ফসলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী এবং গান্ধীজী ও জাকির হোসেনের ওয়ার্ধা প্রকল্প সুপরিচিত। কিন্তু আরো অনেক প্রয়াস ছিল, যেগুলো তেমন বহু-প্রচারিত নয়। ভুলে গেলে চলবে

না যে সে আমলে শিক্ষার আলোক অনেক ক্ষেত্রে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গে পরিণত হত, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের অনেকেই তখনকার শিক্ষিত সমাজ থেকেই এসেছিলেন। যে আদর্শবোধ তখনকার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও নানাভাবে সক্রিয় ছিল, ১৯৪৭ সালের পর থেকে সেই আদর্শবোধের ধারা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আজ প্রায় অবলুপ্ত। শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের যে স্তরটি এই ধারাটির উৎসস্বরূপ ছিল, সমাজ-ইতিহাসে সেই স্তরের ভূমিকা যেমন নিস্তেজ, ক্ষীণ ও অবসন্ন হয়ে এসেছে, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সেই আদর্শবোধও তেমনি ক্ষীণ ও অবসন্ন হয়েছে।

কথাটা আরেকভাবে বলা যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে সর্বত্র একটা আদর্শ ছিল একটা লক্ষ্য ছিল—দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। এই অনুপ্রেরণায় বহু মানুষ চলত। শিক্ষাক্ষেত্রেও বহু মানুষ দেখা যেত যাঁরা দারিদ্র্য দুর্দশা সহ্য করেও নিজের নিজের সাধ্যমতো শিক্ষাবিস্তারের কাজকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। যে শিক্ষক স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে সৈনিক হতে পারেননি তেমন শিক্ষকও একটা আদর্শবোধের সঙ্গে তাল রেখে চলার চেষ্টা করতেন। শিক্ষার কাজটা মানুষ গড়ার কাজ এবং মানুষ গড়ার কাজটাও দেশের কাজ- এমন কথা সবাই জানতো। যতই অস্পষ্ট হোক, যতই ভ্রান্তি-কন্টকিত হোক, একটা চিন্তাদর্শ তখন সক্রিয় ছিল। সে চিন্তাদর্শের ঐতিহাসিক উৎস ছিল পেটিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ। এই চিন্তাদর্শ একদিকে নানাবিধ সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ঘটিয়েছে, শিক্ষাপ্রসারে ও পল্লী-উন্নয়নে তাগিদ দিয়েছে, সততায়-সাহসে-দৃঢ়তায় চরিত্রবলে বলিষ্ঠ মানুষ তৈরি করার কল্পনা করেছে; আরেকদিকে এর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তখনকার বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আগ্রহ। সে আমলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির যোগসূত্র রচনা হয়েছে এই সাধারণ লক্ষ্য ও আদর্শবোধের দ্বারা।

১৯৪৭ এর পর এই পেটিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আর দেওয়ার মতো কিছু রইল না। 'স্বাধীনতা তো এসেই গেল', অতএব আগেকার চিন্তাদর্শও এখন অতীতের স্মৃতি হয়ে গেল অনেকের কাছে। সে জায়গায় নতুন কোন চিন্তাদর্শ এল না, অন্তত এমন কোনো চিন্তাদর্শ এল না যা বহুজনকে এক আদর্শবোধে অনুপ্রাণিত করতে পারে। কমিউনিজমের আদর্শে যাঁদের অনুপ্রাণিত হবার কথা,

যাঁরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিলেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে নানা বিভ্রান্তির জালে জড়িয়ে গেলেন।

এর পর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে চিন্তাদর্শের অনেক টুকরো বুকনি জড়ো হয়েছে বটে, 'ভালো ভালো কথা' অনেক বলা হয়েছে এবং সেই সব 'ভালো কথা' জুড়ে জুড়ে অনেক প্রস্তাব রিপোর্ট প্রকল্প পরিকল্পনা রচিতও হয়েছে. কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পাওয়া গেছে ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও ক্ষুদ্রস্বার্থের দিশাহারা এলোমেলো টানাপোড়েন, যা ক্রমাগত এক বিশৃঙ্খলা ও অসঙ্গতির সমাধান খোঁজে আরেক বিশৃঙ্খলা ও অসঙ্গতি সৃষ্টি করে।

এখন দেশে শিক্ষার লক্ষ্য কী? লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? সে প্রশ্নের উত্তরে আমরা সকলেই মুখর হয়ে উঠতে পারি। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষার লক্ষ্য বলে গৃহীত হয়েছে যা সে সম্বন্ধে প্রকাশ্য আলোচনায় আমরা অনেকেই খানিকটা থমকে যাব। আমাদের কণ্ঠস্বরে হতাশা, তিক্ত ঘৃণা, নিরুদ্যম শৈথিল্যের সুর বেজে উঠবে; আর, নিভৃত কথাবার্তায় শোনা যাবে চতুর সুবিধাবাদী লোলুপতার সুর, ফাঁকি-বাজির পরামর্শ, ধূর্ত আত্মরক্ষার উপদেশ।

অথচ বহুজনমান্য একটা লক্ষ্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ চিন্তাদর্শ 'আইডিওলজি' ছাড়া বিশ্বের কোথাও কোন শিক্ষাব্যবস্থা চলে না। শিক্ষার প্রথম উদ্দীপনাই চিন্তাদর্শগত।

ভারতে বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের যুগে পশ্চাৎপদ দেশের বুর্জোয়া চিন্তাদর্শের সঙ্গেই তাল রেখে চলেছে। বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে পল বারান "লুমপেন বুর্জোয়া" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। "লুমপেন বুর্জোয়া" তারা যারা বুর্জোয়া সমাজে উৎপাদন-কর্মের সঙ্গে লিপ্ত না থেকে তার আশপাশ থেকে নানা প্রক্রিয়ায় সম্পদের ভাগ লুটে নেয়। ফাটকাবাজি, দালালি, চোরাকারবারি, টাউটগিরি প্রভৃতি অসংখ্য উপায়ে এরা সমাজদেহকে শোষণ করে। বারান লিখেছিলেন, "সমাজের সবচেয়ে দক্ষ এবং চালু লোকদের একটা অংশ 'লুমপেন বুর্জোয়া'র অন্তর্ভুক্ত; আবার এই 'লুমপেন বুর্জোয়া' একই সঙ্গে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য যে সম্পদ—মানুষের সৃজনশীল প্রতিভা—সেই সম্পদেরই এক বিশাল পরিমাণকে অপচয় করে, দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং ধ্বংস করে" ["The 'lumpen bourgeois' absorbs some of societies' most capable and dynamic individuals, at the same time wastes, corrupts, and destroys a vast quantity of what

is perhaps one of the scarcest productive resources of all—creative human talent"—Paul Baran, The Political Economy of Growth, People's Publishing House, New Delhi, 1958, p. 191]।

বর্তমান ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে 'লুমপেন বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা' বললে খুব ভুল হবে না। ব্যাপক দুর্নীতিগ্রস্ত, শঠতা-পূর্ণ, শ্লথগতি, ক্ষুদ্রস্বার্থচালিত এই শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গ এখন পরস্পরদ্রোহী ও অন্তর্ঘাতী হয়ে উঠছে।

তথ্যের নানা গরমিল। তথাপি সরকারী তথ্য থেকেই কয়েকটি ছবি পরিষ্কার দেখা যায়, যেগুলো আমাদের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার হাল সম্পর্কে সে রকম কিছু তথ্য এখন দেখা যেতে পারে।

১৯৭১ সালের লোকগণনার হিসাবের প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে সাক্ষরতার শতকরা হার সম্বন্ধে নীচের সারণীটি পাওয়া যাচ্ছে :—

সারণী—১

পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৭১/জনসংখ্যার অনুপাতে সাক্ষরতার শতকরা হার

	মোট জনসংখ্যার মধ্যে	পুরুষদের মধ্যে	মেয়েদের মধ্যে
(১)	(২)	(৩)	(৪)
পশ্চিমবঙ্গ—	৩৩'০৫	৪২'৮৪	২২'০৮
জেলা :—			
দার্জিলিঙ —	৩২'৯০	৪২'০৫	২২'৫৪
জলপাইগুড়ি —	২৪'২২	৩২'৩৮	১৫'০৩
কুচবিহার —	২১'৯৯	৩১'৪৩	১১'৭১
পশ্চিম দিনাজপুর—	২১'৯৫	৩১'২৪	১১'৯৩
মালদহ —	১৭'২৫	২৫'০৭	৯'০৫
মুর্শিদাবাদ —	১৯'৫৭	২৬'৮১	১২'০৬
নদীয়া —	৩১'৩১	৩৯'২৮	২২'৯২
২৪ পরগনা —	৩৭'৯৮	৪৮'১৬	২৬'৪১

(১)		(২)	(৩)	(৪)
হাওড়া	—	৩৯·৬৭	৪৯·৪২	২৮·০১
কলকাতা	—	৬০·৩৫	৬৪·১৫	৫৪·৪০
হুগলী	—	৩৮·৬০	৪৭·৮৬	২৮·৩২
বর্দ্ধমান	—	৪ ৪৯	৪৩·২৫	২৪·৫১
বীরভূম	—	২৬·৩৯	৩৫·৭২	১৬ ৭৭
বাঁকুড়া	—	২৬·২১	৩৮·০৭	১৩ ·৭
মেদিনীপুর	—	৩২ ৮৮	৪৫ ৬২	১৯ ৩৮
পুরুলিয়া	—	২১ ৮৮	৩৫·১০	৮·১৮

[Source : Census of India 1971, Series 18, Paper I of 1971, p 31]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে গোটা অবস্থা নিম্নগ্রস্ত। তার মধ্যেই আবার বেশ তারতম্য আছে। উত্তরদিকে জলপাইগুড়, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর মালদহ ও মুর্শিদাবাদ, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া—এই কটি জেলায় গাঢ় অন্ধকার। তার মধ্যে মেয়েদের সাক্ষরতা প্রায় অদৃশ্য, মালদহে শতকরা ৯ জন পুরুলিয়ায় শতকরা ৮ জন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জেলা মেদিনীপুরে আবার বিচিত্র অবস্থা: জেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষরতার শতকরা হার (৩২ ৮৮) রাজ্যের গড় হারের থেকে কিছু কম, কিন্তু পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার (৪৫ ৬২) রাজ্যের গড়পড়তা হারের চেয়ে বেশি হলেও মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার শতকরা মাত্র ১৯ ৩৮।

গোটা রাজ্যের সর্বত্র মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুটি সংখ্যার পার্থক্য ১৫ থেকে ২০ বা তার কাছাকাছি। একমাত্র কলকাতায় এই পার্থক্য ১০-এর কাছে। মেদিনীপুরে এই পার্থক্য ২৬-এর বেশি। পুরুলিয়ায় প্রায় ২৭, বাঁকুড়ায় ২৪ এর বেশি।

একই রাজ্যের মধ্যে সাক্ষরতার হিসাবে এই যে গুরুতর আঞ্চলিক বৈষম্য এবং স্ত্রী-পুরুষে বৈষম্য, এই বিশিষ্ট ছবিটি ইংরেজ আমলেও প্রায় এই একই রকম ছিল। ১৯২১, ১৯৩১ এবং ১৯৪১ সালের লোকগণনার হিসাব থেকে আমরা নীচের সারণীটি পাই [স্থানাভাবের জন্য পুরো সারণীটির কয়েকটি দৃষ্টান্তস্থলই উল্লেখ করা হল] :—

সারণী—২

সাক্ষরতার শতকরা হিসাব

		মোট জনসংখ্যার মধ্যে	পুরুষদের মধ্যে	মেয়েদের মধ্যে
(১)		(২'	(৩)	(৪)
পশ্চিমবঙ্গ	১৯২১	১২'২৮	২০'৯৯	২'৪৮
	১৯৩১	১২'৬৫	২০'৪১	৩'৭৫
	১৯৪১	১৯'৭১	২৯'৩৩	৮'২৯
জলপাইগুড়ি	১৯২১	৬'৫৪	১'২৮	০'৮৫
	১৯৩১	৫'৬৫	৯'১০	১'৩০
	১৯৪১	১০.১১	১৬ ০৭	২'৮২
মালদহ	১৯২১	৫'৫১	১০'২৮	০'৭০
	১৯৩১	৩'৭৮	৬'৮২	০'৭২
	১৯৫১	৮'৬১	১৪'৭৭	২'৪৮
কলকাতা	১৯২১	৫৫'০৩	৫২'৯৮	২৭'১৪
	১৯৩১	৪৩'২৩	৪৭'৫৮	৩৩ ২৯
	১৯৪১	৫৭'৭১	৬১'১৮	৪৯'৬১
বাঁকুড়া	১৯২১	১২'৪৬	২৩'৭৩	১'১১
	১৯৩১	৯'৮৯	১৮'৪৯	১'২৪
	১৯৪১	১৪'৩৪	২১'০৬	৪'৪১
পুরুলিয়া	১৯২১	৫'৯০	১০'৫৫	০'৮৩
	১৯৩১	৫'৫১	৯'৬৫	০'৯৭
	১৯৪১	১২'৪২	২১'২৭	২'৬১
মেদিনীপুর	১৯২১	১১'৬২	২১'৮২	১'২৬
	১৯৩১	১৭'৫২	৩১'১৬	৩'৪১
	১৯৪১	১৯'২৭	৩২'৬৯	৫'১৯

[Source ; Census of India 1961, Vol. XVI, Part 1-A, Bk (ii) pp 108-9]

ইংরেজ আমলে সাক্ষরতার স্বল্পতা ও বৈষম্যের যে ছাঁদ তৈরী হয়েছিল, ১৯৭১ সালেও সেই ছাদ বজায় আছে। আঞ্চলিক বৈষম্য ও স্ত্রী-পুরুষে বৈষম্যের সঙ্গে জড়িত আছে বৈষম্যের আরো কয়েকটি রূপ। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের বৈষম্য এতই স্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত যে তার কোন বিশদ পরিসংখ্যান উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কয়েকটি নমুনাই যথেষ্ট। মালদহ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলাগুলিতে প্রায় সবটাই গ্রাম, সেখানে সাক্ষরতার হার কম হবে, এটা হিসাব না দেখেও বলা যায়। একই জেলার মধ্যে এবং একটি থানার মধ্যে গ্রাম-শহরের তারতম্যের পরিধি দেখা যায় ১৯৬১ সালের লোকগণনার বিবরণীতে। ওই বিবরণী অনুসারে নীচের সারণীটি পাওয়া যায় :—

সারণী—৩

থানার নাম	সাক্ষরতার শতকরা হার	
	গ্রামাঞ্চলে	শহর এলাকায়
(১)	(২)	(৩)
২৪ পরগনা জেলা		
সন্দেশখালি	১৮·৫৬	—
বারাসত	২৭·৮৬	৬১·১০
জয়নগর	২৪·১৪	৬১·৩২
টালিগঞ্জ (কলকাতার বাইরে)	৪৭·৩৩	৭২·৪৭
ক্যানিং	১৯·১৭	৪১·০৬
হুগলী জেলা		
চুঁচুড়া	৪৮·১৬	৬৮·৯৭
শ্রীরামপুর	৩৯·৫৬	৫৯·১৪
হাওড়া জেলা		
হাওড়া শহর	—	৫৭·৯৬
শিবপুর (হাওড়া শহরের বাইরে)	২০·১৩	—
মুর্শিদাবাদ জেলা		
বহরমপুর	১৯·২৫	৬৩·৪২

(১)	(২)	(৩)
মুর্শিদাবাদ	১৩'৪৪	৪৮'৭৩
মালদহ জেলা		
মালদহ	১৩'৫২	৫৬'৮১
ইংরেজ বাজার	১৯'৮৯	৫৫'১৫
পশ্চিম দিনাজপুর জেলা		
বালুরঘাট	২৩'৪৮	৬৯'৩১
ইসলামপুর	১১'৫৮	৩০'০৯
কুচবিহার জেলা		
কুচবিহার	২৫'৫১	৬৬'৯২
মাথাভাঙ্গা	১৮'৮৭	৬২'৮৫
জলপাইগুড়ি জেলা		
জলপাইগুড়ি	২৫'২৩	৬৭'৬৬
আলিপুরদুয়ার	১৯'২৭	৫৬'১৯
দার্জিলিঙ জেলা		
দার্জিলিঙ	৩০'৮৪	৬১'৮০
শিলিগুড়ি	২৩'১৩	৬১'৬৩
বর্ধমান জেলা		
রানীগঞ্জ	২৬'৫৫	৫২'৬৭
আসানসোল	৩১'৮৬	৬৩'২৩
বর্ধমান	৩৩'২৪	৫৮'৩৬
নদীয়া জেলা		
কৃষ্ণনগর	২৭'৬৩	৬২'৬৭
নবদ্বীপ	২৫'২০	৬০'৪৯
বীরভূম জেলা		
সিউড়ি	২৫'৬৩	৬০'৫৯
বোলপুর	২৭'৯৭	৫১'৬০
বাঁকুড়া জেলা		
বাঁকুড়া	২৬'৪০	৫২'৪৬
বিষ্ণুপুর	২৫'১৯	৪৮'৫৮

(১)	(২)	(৩)
মেদিনীপুর জেলা		
মেদিনীপুর	২১·০১	৬০·০২
খড়্গাপুর	২৬·৭০	—
খড়্গপুর শহর	—	৫৪·৩১
পুরুলিয়া জেলা		
পুরুলিয়া মফঃস্বল	১৭·২৫	—
পুরুলিয়া শহর	—	৫৭·০৬
কাশীপুর	২০·১৩	৬৯·২২
বলরামপুর	১৫·৩৭	৪০·২৬

[Source Census of India, 1961, Vol XVI Part I-A, Bk (ii), pp 116-118]

দেখা যায় যে প্রত্যেকটি শহরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে অক্ষরপরিচয়-বঞ্চিত একপাল নরনারী ও শিশু। শিক্ষিত অঞ্চলের সংস্পর্শে শিক্ষা চতুষ্পার্শ্বে ব্যাপ্ত হয়নি। বোলপুর ও রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালাতে পারেনি। ইংরেজ আমলের এ বৈষম্য অনড় হয়েই আছে।

আরেকটি গভীর বৈষম্য ধরা পড়ে তথাকথিত তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়গুলির ও আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির দিকে তাকালে। এটা নিতান্ত কাকতালীয় সংযোগ নয় যে পেছিয়ে-পড়া জেলাগুলির পেছিয়ে-পড়া অঞ্চলে তথাকথিত নিম্নবর্ণ ও আদিবাসী গোষ্ঠীর বসবাস আপেক্ষিকভাবে বেশি। এরা বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চলেই থাকে, এবং গ্রামাঞ্চলের অবহেলিত অংশেই এরা থাকে। এদের মধ্যেই আবার মেয়েদের সাক্ষরতার শতকরা হার নিদারুণভাবে কম। ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাবে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়গুলির সাক্ষরতার শতকরা হার পুরুষদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ছিল ২১·০, শহরাঞ্চলে ২৮·৩; মেয়েদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৮, শহরাঞ্চলে ১২·৮। তফসিলভুক্ত আদিবাসীদের পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল গ্রামাঞ্চলে ১০·৮, শহরাঞ্চলে ২৪·৮; মেয়েদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ১·৬, শহরাঞ্চলে ৯·৬ [Ibid, p. 135, 137]।

১৯৭১ সালের লোকগণনার হিসাব থেকে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ছিল ৮৮ লক্ষ ১৬ হাজার; তাদের মধ্যে

গ্রামবাসীর সংখ্যা ৮০ লক্ষ ৯৩ হাজার। তফসিলভুক্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ ৩৩ হাজার, তাদের মধ্যে গ্রামবাসীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৩৬ হাজার। সাক্ষরতার দিক থেকে পেছিয়ে-পড়া জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া —এই কয়টি জেলায় মোট লোকসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ ২৭ হাজার; এই জেলাগুলিতে বাসিন্দা তফসিলী সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ৩৩ লক্ষ ২ হাজার, আদিবাসীদের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৩৮ হাজার [Census of India, 1971, Part II-A (iii), p. 278-79]। অর্থাৎ, এই কয়টি জেলায় তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসীরা মিলে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৯·৪ ভাগ। শিক্ষার দুর্বল ইমারতের দুর্বলতম কাঠামো এখানে।

মালদহ, মুর্শিদাবাদ পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় গ্রামাঞ্চলে মুসলিম পরিবারগুলিতে মেয়েদের সাক্ষরতা অর্জনের পথে এখনো নানারকম বাধার প্রাচীর তোলা আছে। পর্দাপ্রথার উৎপাত এখনো প্রবল। তার ওপরে আছে দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাব। স্কুলে যাবার মতো কাপড় জোটে না বলে মেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না --একথা বহু জায়গায় শোনা যায়, উত্তরবঙ্গের দরিদ্র মুসলিম গ্রাম-পরিবারে একটু বেশি শোনা যায়।

মোট কথা, শিক্ষাব্যবস্থার বনিয়াদে কোনও ক্রমবিবর্তন ঘটেনি, ইংরেজ আমলে যা ছিল, কাঠামোর অঙ্গগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও অনুপাত মোটামুটি তাই-ই আছে। জে পি নায়েক এবং শিক্ষাকমিশনের মন্তব্য সত্য, পুরনো ব্যবস্থাটারই আয়তন একটু বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়তনবৃদ্ধির পরিমাণও এমন নয় যাতে বলা যায় যে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ফলে সাক্ষরতার দ্রুত প্রসার ঘটেছে। ১৯৬১ সালের লোকগণনার বিবরণীতেই লেখা হয়েছিল যে ১৯০১ থেকে ১৯৩১-পর্যন্ত প্রতি দশকে সাক্ষরতার শতকরা হার বৃদ্ধি পাচ্ছিল ১, ২ বা ৩ করে; ১৯৩১-১৯৪১ দশকে সাক্ষরতার প্রসার শুরু হয়,—শতকরা হারের বৃদ্ধির পরিমাণ ৭। দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ত্রিশ বৎসরে বৃদ্ধির পরিমাণ সে তুলনায় বেশি নয়। ইংরেজ আমলের শেষ দিকে যে বেগে সাক্ষরতার প্রসার ঘটছিল, সরকারী অবহেলা সত্ত্বেও, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে সরকারী প্রয়াসের এবং অর্থব্যয়ের আড়ম্বর সত্ত্বেও, মোটামুটি সেইরকম বেগেই সাক্ষরতার প্রসার ঘটছে।

সারণী—৪

সাক্ষরতার শতকরা হার : পশ্চিমবঙ্গ, ১৯০১—১৯৬১

১৯০১	—	৯·৮৩
১৯১১	—	১০·৮২
১৯২১	—	১২·২৮
১৯৩১	—	১২·৬৫
১৯৪১	—	১৯·৭২
১৯৫১	—	২৪·৪২
১৯৬১	—	৩৪·৪৬

[Census of India, 1961, Vol. XVI, Part 1-A, Bk (ii), pp. 108-9]

১৯৭১ সালের লোকগণনার হিসাবের যে প্রাথমিক বিবরণী আমরা পেয়েছি তাতে সাক্ষরতার শতকরা হার নির্ণয় করা হয়েছে ০-৪ বৎসর বয়স্ক শিশুদের নিয়ে মোট জনসংখ্যার ওপর। ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাবের বিবরণীতে সাক্ষরতার শতকরা হার নির্ণয় করা হয়েছিল মোট জনসংখ্যা থেকে ০-৪ বৎসর বয়স্ক শিশুদের সংখ্যা বাদ দিয়ে। ১৯৭১ সালের হিসাবপদ্ধতি অনুসারে ১৯৬১-৭১ দশকে পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার শতকরা হার পরিবর্তন হয়েছে নিম্নরূপ :

১৯৬১	—	২৯·২৮
১৯৭১	—	৩৩·০৫

দেখা যাচ্ছে, ১৯৩১-৪১ দশকে বৃদ্ধির সূচক সংখ্যা ছিল ৭·০৭ [১৯·৭২—১২·৬৫], ১৯৪১-৫১ দশকে ৪·৭০, ১৯৫১-৬১ দশকে ১০·০৪। তারপর, ১৯৬১-৭১ দশকে যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে বৃদ্ধির সূচক সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৪·২৩ [৩৩·০৫—২৯·২৮]। সারা ভারতের চেহারাটাও এইরকম। ১৯৫১ সালে সাক্ষরতার শতকরা হার ছিল ১৬·৬, ১৯৬১ সালে ছিল ২৪·০, এবং ১৯৭১ সালে ২৯·৩। ১৯৫১-৬১ দশকে বৃদ্ধির সূচক ৭·৪ [২৪·০—১৬·৬], এবং ১৯৬১-৭১ দশকে বৃদ্ধির সূচক ৫·৩ [২৯·৩—২৪·০]। [Report of Education Commission, p. 423, para 17·7 ; India, Pocket Book of Economic Information, 1971, Govt. of India, Ministry of Finance, Table 1·10]। ১৯৬১-৭১ দশকে সাক্ষরতার শতকরা হার বৃদ্ধির বেগ কমে যাচ্ছে।

অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথাটা স্মরণ রাখতে হবে। ১৯৩১ সাল থেকে

১৯৭১ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। জনবসতির ঘনত্বের তুলনামূলক হিসাব দেখলে ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার হবে।

সারণী—৫

জনবসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) : পশ্চিমবঙ্গ, ১৯০১—৬১

১৯০১	—	৪৯৫
১৯১১	—	৫২৬
১৯২১	—	৫১১
১৯৩১	—	৫৫৩
১৯৪১	—	৬৭৯
১৯৫১	—	৭৬৯
১৯৬১	—	১,০২১

[Census of India, 1961, Vol. XVI Part 1-A, Bk (i), p.114]

দেখা যাচ্ছে ১৯৩১-৪১ দশকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধির বেগ বেড়ে যায়, এবং ১৯৫১-৬১ দশকে বৃদ্ধির পরিমাণ প্রতি বর্গমাইলে ২৫২। ১৯৭১-এর হিসাবে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার হিসাব দেখা যাচ্ছে :—

১৯৬১	—	৩৯৮
১৯৭১	—	৫০৭

[Census of India, 1971, Series 18, Paper I, p. 49]

সহজ অঙ্কেই পাওয়া যায় যে জনসংখ্যার অনুপাতে সাক্ষরদের সংখ্যার বৃদ্ধির হার কম হলেও, সাক্ষরদের মোট সংখ্যার বৃদ্ধির হার তার চেয়ে বেশি। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক বিচারের মানদণ্ড জনসংখ্যার অনুপাতে সাক্ষরদের সংখ্যা। সেই মানদণ্ডে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার উদ্যম, আয়োজন ও প্রশাসন অবিমিশ্রভাবে নিন্দনীয়।

ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সার্বজনীন সাক্ষরতা অর্জন করা কি সম্ভব ছিল? সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এর চেয়ে অনেক কম সময়ে সার্বজনীন সাক্ষরতা, অথবা শতকরা ৯০ থেকে ৯৯ ভাগ সাক্ষরতা অর্জন করা গেছে। ভারত ধনতান্ত্রিক দেশ, অতএব এখানে তা করা সম্ভব নয়—এই কথাটা সত্য হলেও কথাটার বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আজকাল ধনিকশ্রেণীর রাজনৈতিক

মুখপাত্ররাও এই কথাটা ব্যবহার করে থাকেন উদ্যমহীনতা ও আদর্শহীনতার সপক্ষে অজুহাত হিসাবে, নিজেদের সাফাই হিসাবে। এবং বামপন্থী সমাজতন্ত্র-বাদীরা বা কমিউনিস্টরা কথাটা বলে থাকেন এ বিষয়ে আর চিন্তাভাবনা করার দায় এড়াতে।

পেছিয়ে পড়া দেশে, দরিদ্র দেশে, বহুকালের পুঞ্জীভূত ব্যাপক নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা-কুশিক্ষার জঞ্জাল মুক্ত করতে হলে সেই লক্ষ্যে উদ্দীপিত ব্যাপক গণ-উদ্যম প্রয়োজন। একটা বিশাল আন্দোলন সৃষ্টি করতে না পারলে এবং একাগ্র দৃঢ়তার সঙ্গে সে আন্দোলনকে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে না পারলে এই অবশ্যকর্তব্য কর্ম সাধিত হয় না।

এই সাধারণবোধ্য কথাটা আমরা বললে যাঁরা কান পাতবেন না, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো গনার মির্ডাল-এর কথায় কান পাতবেন। এদেশে এখনো সাহেব-পণ্ডিতদের বেশ মান। অতএব, মির্ডাল-এর কথাই শুনুন:—

"দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ এবং দরিদ্র দেশগুলিতে অবস্থা বিশেষভাবে সঙ্কটজনক, আমাদের মতে এসব দেশে সমগ্র জনসাধারণকে যত দ্রুত সম্ভব সাক্ষর করে তোলার জন্য এক বিশাল উদ্যমের প্রয়োজন। কিছু কিছু প্রান্তিক উন্নতি দিয়ে ফল হবে না। ...সাক্ষরতার জন্য যে প্রয়াস তাকে অবশ্যই একটা 'আন্দোলন' ও একটা অভিযান'-এর চরিত্র গ্রহণ করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে 'শিক্ষার জন্য তৃষ্ণা' আছে বলে যে কথাটা বলা হয় সেটার অনেকটাই উচ্চশ্রেণীর লোকেদের বানানো কল্পকথা।...যে কোন শিক্ষামূলক কর্মপ্রচেষ্টার প্রথমেই করণীয় কাজ হল জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার জন্য সাড়া জাগানো —প্রচারের দ্বারা এবং স্থানীয় দৃষ্টান্তের দ্বারা। শিক্ষালাভের সুযোগকে জনসাধারণ যাতে সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানাতে পারে সেজন্য জনসাধারণকে তৈরি করা চাই।" [In the particularly precarious situation of the larger and poorer countries of South Asia, there is, in our opinion, need for a massive effort to make the whole population literate as rapidly as possible. A marginal advance will not suffice. ...The literacy drive must have the character of a 'movement' and a 'campaign'. The reputed 'hunger for knowledge' in the villages...is largely an upper-class myth...

The beginning of any educational activity must be in the creation of this response, by propaganda and by local example. People have to be conditioned to welcome educational opportunities."—Gunnar Myrdal, op. cit., Ch. 25]

শিক্ষার জন্য এ রকম ব্যাপক গণ-আন্দোলন ও গণ-উদ্যম সৃষ্টি করা এ দেশে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরিত্রবিরোধী কর্ম। ১৯৪৭ সালে যে নেতৃত্ব ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেন, তাঁরা যে-কোনও প্রকার গণ-আন্দোলনকেই বিপজ্জনক বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁরা ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহকেও পছন্দ করেননি, শ্রমিক ধর্মঘটের জোয়ারকেও পছন্দ করেননি। ১৯৪৭ সালের পর গ্রামাঞ্চলে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে কোনও গণ-আন্দোলন হয়েছে, তা তাঁদের আক্রমণের শিকার হয়েছে। জনসাধারণ সজাগ হবে, সচল হবে, নিজেরা দেশের পরিবর্তন ঘটাবে—এই সম্ভাবনা তাঁদের কাছে আতঙ্কজনক হয়েছে। তাঁরা বারবার যা বলেছেন তার নির্গলিতার্থ—জনসাধারণকে কিছুই করতে হবে না। শুধু শান্ত ও ধৈর্যশীল হয়ে থাকতে হবে, এবং শাসকদলকে সমর্থন করে যেতে হবে ; দেশের কল্যাণ যা করার, সরকার ও শাসকদল তা ওপর থেকে আইন করে ও প্রশাসনিক আয়োজন করে সম্পন্ন করবেন।

পক্ষান্তরে বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্বও ট্রেড ইউনিয়ন, কিসান আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতিতে যত উৎসাহ দেখিয়েছেন, শিক্ষাপ্রসারের জন্য আন্দোলনে তার শতাংশের একাংশও দেখাননি। তাঁরা শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলনে সাহায্য সমর্থন জুগিয়েছেন, উচিত ভাবেই। কিন্তু শিক্ষা যে সমাজপরিবর্তনের একটা অন্যতম প্রধান অস্ত্র সে বিবেচনার বদলে তাঁরা শিক্ষক ও ছাত্রকে শুধু নিজ নিজ দলবৃদ্ধির উপাদান ও ভোট-সংগ্রহের যন্ত্র হিসাবেই দেখেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন আদর্শবোধকে তাঁরা সঞ্চাত করার প্রচেষ্টা করেননি, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার জন্য আগ্রহ ও উদগ্র দাবি তাঁরা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেননি।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, স্বাধীনতা-সংগ্রামের কালে পেটিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ শিক্ষার আদর্শবোধকে উদ্দীপিত করেছিল। 'পেটিবুর্জোয়া' শব্দটি এখানে নিন্দার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে না, ঐতিহাসিক ভূমিকা ও শ্রেণীচরিত্র নির্ণয়ের জন্যই ব্যবহার করা হচ্ছে। পেটিবুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের

পেটিবুর্জোয়া বলে জানতেন না, সচেতনভাবে মতলব করে পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ অনুযায়ী কথা বলতেন না। তাঁরা নিজেদের দেশপ্রেমিক জনকল্যাণবাদী হিসাবেই জানতেন। এ প্রসঙ্গে মার্কসের উক্তিটি সর্বদা স্মরণীয় :

"এ রকম সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ধারণা করা উচিত নয় যে পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী, নীতি হিসাবেই তাদের নিজস্ব আত্মসর্বস্ব শ্রেণীস্বার্থ চাপিয়ে দিতে চায়। বরং, পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী মনে করে যে তাদের নিজেদের মুক্তিলাভের বিশেষ শর্ত-গুলিই হচ্ছে আধুনিক সমাজকে উদ্ধার করার ও শ্রেণীসংঘর্ষ এড়াবার সাধারণ শর্ত। ঠিক যেমন একথা মনে করা উচিত নয় যে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা সকলেই বাস্তবে দোকানদার বা দোকানীদের সপক্ষে উৎসাহী প্রবক্তা। তাদের শিক্ষাগত ও ব্যক্তিগত অবস্থানে তাদের পরস্পরের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকতে পারে। যে জন্য এরা পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হয় তা হল এই যে পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী বাস্তব জীবনে যে সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে না, এই প্রতিনিধিরা নিজেদের মানসিক জগতে সেই সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে না; ফলে এরা চিন্তা ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে সেইসব সমস্যার দিকে ও সমাধানের দিকেই তাড়িত হয় যেসব সমস্যা ও সমাধানের দিকে পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী তাদের বাস্তব স্বার্থ ও সামাজিক অবস্থানের দ্বারা বাস্তব জীবনে চালিত হয়। একটা শ্রেণী এবং সেই শ্রেণীর রাজনৈতিক ও নিবন্ধলেখক প্রতিনিধিদের মধ্যে সম্পর্কটা সাধারণভাবে এই।"

[“...One must not form the narrow-minded notion that the petty-bourgeoisie, on principle, wishes to enforce an egoistic class interest. Rather, it believes that the special conditions of its emancipation are the general conditions within the frame of which alone modern society can be saved and the class struggle avoided. Just as little must one imagine that the democratic representatives are indeed all shopkeepers or enthusiastic champions of shopkeepers. According to their education and their individual position they may be as far apart as heaven from earth. What makes them representatives of the petty bourgeoisie is the

fact in their minds they do not get beyond the limits which the latter do not get beyond in life, that they are consequently driven, theoretically, to the same problems and solutions to which material interest and social position drive the latter practically. This is, in general, the relationship between the political and literary representatives of a class and the class they represent."— Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Section III, Selected Works, 3-Vol. Edn., Progress Publishers, Moscow. 1969, p. 424]

রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি শিক্ষানুরাগীরা জ্ঞানত কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেননি। তাঁদের মানসিক জগতের সীমারেখা ও বৈশিষ্ট্য ইতিহাস দ্বারা নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁরা গোটা দেশের সব মানুষের পক্ষে কথা বলছেন বলে তাঁদের যে প্রত্যয় ছিল সেই প্রত্যয়ে ছিল তাঁদের আদর্শবোধের উৎস।

বর্তমান কালের বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্বও শ্রেণীচরিত্রে পেটিবুর্জোয়া। কিন্তু এঁরা পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর ও বুর্জোয়াতন্ত্রের ধ্বংসকালীন সঙ্কটের কালের পেটিবুর্জোয়া। পূর্ববর্তী কালের পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর প্রবক্তাদের প্রত্যয় বা আদর্শবোধ এঁদের নেই, ঐতিহাসিক কারণেই তা থাকা সম্ভব নয়। ফলত এঁরা চতুর স্বল্পদর্শী সুবিধাবাদী এবং আদর্শবিহীন রাজনীতি চর্চারই বাহক। এঁদের পক্ষেও শিক্ষাক্ষেত্রে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। শিক্ষার নতুন চিন্তাদর্শ বা নতুন আদর্শবোধ উপস্থিত করাও এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এঁরাও যা আছে তারই প্রান্তিক আয়তনবৃদ্ধির কার্যসূচী পর্যন্তই ভাবতে পারেন, তার বেশি ব্যাপক বা মৌলিক চিন্তা এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সাক্ষরতা শিক্ষার ব্যাপক বনিয়াদ বলে গণ্য হলে, বিশেষ বনিয়াদ প্রাথমিক শিক্ষা। এখন পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যানগুলি বিবেচনা করা উচিত। শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যানগুলির একটি বড় সূত্র সারা ভারতে ১৯৫৭

সালের ও ১৯৬৭ সালের শিক্ষাসমীক্ষার বিবরণী [First & Second All Indin Educational Survey]। যে কোন কারণেই হোক, ১৯৫৭ সালের সমীক্ষা পশ্চিমবঙ্গে করা হয়নি। ১৯৬৭ সালের দ্বিতীয় সমীক্ষার বিবরণীতে ১৯৬৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের অবস্থারই বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। নীচের তথ্য ও পরিসংখ্যানগুলি তার থেকে পাওয়া যায়।

সারণী—৬

পশ্চিমবঙ্গ : প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে (১ম ৫ম শ্রেণী)
তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, ১৯৬৫

(ক) গ্রামাঞ্চলে

শ্রেণী ১ম	—	১৩,৩২,২২১	
২য়	—	৫,৬৩,৫৬৮	
৩য়	—	৪,৭৩,৫৫৪	
৪র্থ	—	৩,১৪,৩২৪	
৫ম	—	২,২৬,১৬৭	
মোট	—		২৯,০৯,৮৩৪

(খ) শহর এলাকায়

শ্রেণী ১ম	—	২,৬৪,৯৭১	
২য়	—	১,৭৬,১৭৭	
৩য়	—	১,৭৪,০১১	
৪র্থ	—	১,৩৪,৯৫৫	
৫ম	—	১,২৮,৩৫৭	
মোট	—		৮,৭৮,৪৭১
সর্বসমেত	—		৩৭,৮৮,৩০৫

[Second All India Educational Survey, NCERT, pp. 190-3]

জনসংখ্যার প্রতি ১০ হাজারে প্রাথমিক স্তরে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার হিসাব নিম্নরূপ :

সারণী—৭

		ছেলে	মেয়ে	মোট
১।	সারা ভারতে গড়	৬৭১·০৭	৩৫৭·৯৭	৯৮৯·০৪
২।	পশ্চিমবঙ্গ	৫৯৮·৩৯	৩৪৯·৯৮	৯৪৮·৩৭
৩।	কেরল	৮০৩·৫৩	৭০৭·৯০	১৫১১·২৩
৪।	মহারাষ্ট্র	৭২২·৮৭	৪৫৯·৮৮	১১৮২·৭৫
৫।	মাদ্রাজ	৭১৩·১০	৫১১·৪৬	১২২৪·৫৬

[Ibid, p. 194]

প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী হিসাবে যাদের সকলের তালিকাভুক্ত হবার কথা সেই ৬+বৎসর থেকে ১০+বৎসর বয়স্ক শিশুদের মোট সংখ্যার অনুপাতে প্রাথমিক স্তরে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার শতকরা হার এই স্তরে শিক্ষার পরিস্থিতির একটা সূচক হিসাবে ধরা হয়। এটা খুব ভালো সূচক নয়, এবং এটার ব্যবহারে অনেকের বিভ্রান্তি ঘটে। সেজন্য পরিষ্কার করা দরকার যে এই হার ১০০% হলে তার অর্থ এই হবে না যে ৬+থেকে ১০+ বৎসর-এর শিশুরা সবাই বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্ত হয়েছে। বিদ্যালয়ের ১ম-৫ম শ্রেণীতে যারা তালিকাভুক্ত তাদের সকলেরই বয়স ৬+ থেকে ১০+ সীমানার মধ্যে নয়, এর চেয়ে বেশি বয়সের ছেলেমেয়েও ওই তালিকায় থাকে। কাজেই ৬+ থেকে ১০+ বয়ঃসীমানার সমস্ত শিশু তালিকাভুক্ত হলে সূচকটি ১০০%-এর চেয়ে অনেক বেশি হওয়াই সম্ভব, কত বেশি হওয়া উচিত তা বলার কোনও উপায় নেই। অতএব এই সূচকটি একটি দুর্বল নির্দেশক। এটি দেখে অবস্থাটা খানিকটা আন্দাজ করা যায়, এবং এই সূচকের ওঠানামা বা হেরফের দেখে শিক্ষার গতি অনুমান করা যায়, তার বেশি কিছু নয়। সেই সূচকের হিসাব নিম্নরূপ :

সারণী—৮

৬+/১০+ বয়ঃসীমানার জনসংখ্যার তুলনায় প্রাথমিক স্তরে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার শতকরা হার ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্য কয়েকটি রাজ্যে।

১।	সারা ভারত	—	৭৪·৩৬%
২।	পশ্চিমবঙ্গ	—	৭০·৫৭%
৩।	কেরল	—	১১৬·৫৭%
৪।	মহারাষ্ট্র	—	৯০·৬৯%
৫।	মাদ্রাজ	—	১০১·৮৩%

[Ibid, p. 182]

সারণী ৭ ও সারণী ৮ থেকে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কেরল, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজের চেয়ে অনেক নীচে, এমন কি দরিদ্র ভারতের মোট গড়পড়তা অবস্থার চেয়েও বেশ খানিকটা নীচে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও নীচে আছে কিছু রাজ্য—কিন্তু সেই কথা নিয়ে সান্ত্বনালাভ করতে পারে পরমমূর্খরাই। উল্লেখযোগ্য যে উচ্চশিক্ষাস্তরে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ভাবছে সবার সেরা। শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় জনসংখ্যার প্রতি ১০ হাজার জনে উচ্চশিক্ষাস্তরে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :—

সারণী—৯

জনসংখ্যার ১০,০০০ প্রতি উচ্চশিক্ষাস্তরে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা

১।	সারা ভারত	—	২৫
২।	পশ্চিমবঙ্গ	—	৪০
৩।	কেরল	—	২৬
৪।	মহারাষ্ট্র	—	২৮
৫।	মাদ্রাজ	—	২১

[Report of the Education Commission, p. 126]

শিক্ষার স্তরভেদে আবার এই যে আনুপাতিক সংখ্যার বৈষম্য—এটিও পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থার আরেকটি লক্ষণ।

এবার আমরা সারণী ৬-এর দিকে আরেকবার তাকাই। দেখা যাচ্ছে (১) তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ম শ্রেণীর পর থেকে ওপরের দিকে ক্রমাগত কম হচ্ছে, (২) এই হ্রাসের গতিবেগ শহর এলাকার তুলনায় গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশি, এবং (৩) ১ম শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীর মধ্যেই বিপুলভাবে সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

এই চেহারাটা সারা ভারতে সর্বত্র দেখা যায়, অনেকদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে, এবং বর্তমানকালে এই ব্যাপারটি নিয়ে বিচার-বিবেচনা যাঁরা করেছেন তাঁরা সকলেই এ সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এর একটা আংশিক কারণ আন্দাজ করা যায়—তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ফাঁপিয়ে দেখানোর কারচুপি গ্রামাঞ্চলে দারুণ ব্যাপক আকারে চলে, এবং ১ম শ্রেণীর সংখ্যাতেই কারচুপিটা বেশি হয়। আরেকটি কারণ আন্দাজ করা যায়, ১ম শ্রেণীতে যারা ভর্তি হয় তাদের বেশ খানিকটা অংশ ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারে না। কিন্তু এসব কারণ ছাড়াও গুরুতর ঘটনা ঘটে থাকে—ছেলেমেয়েরা

এবং তাদের পিতামাতারা ১ম শ্রেণীর পর আর পড়াশুনা চালাতে চায় না, তারা সরে যায়। সংক্ষেপে এই ব্যাপারটাকে 'ড্রপ-আউট' বলা হয়ে থাকে। যে ছেলেমেয়েরা ১ম শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে না পেরে পড়াশুনা ছেড়ে দেয় তারাও এক হিসাবে ড্রপ-আউটের মধ্যেই পড়ে। আর গোটা ব্যাপারটা একটা বিশাল সামাজিক অপচয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই অপচয়ের আরেকটা সূচক পাওয়া যায় প্রাথমিক স্তরে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাগুলিকে বিদ্যালয়ের শ্রেণী অনুসারে শতকরা অংশের হিসাবে সাজালে। সেরকম হিসাব দ্বিতীয় শিক্ষাসমীক্ষার বিবরণীতে পাওয়া যায়।

সারণী—১০

১ম-৫ম শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার প্রতি একশতে শ্রেণী অনুসারে বিন্যাস (Percentage Distribution of Enrolment)

	সারা ভারত			পশ্চিমবঙ্গ		
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট
গ্রামাঞ্চলে						
১ম শ্রেণীতে	৩৭·৭৫	৪৫·৩৭	৪০·৩৬	৪৩·৫৯	৪৯·৯০	৪৫·৭৮
২য় ,,	২০·৮০	২১·২১	২০·৯৪	১৯ ৩৮	১৯·৩৫	১৯·৩৬
৩য় ,,	১৬·৮১	১৫·১৭	১৬·২৫	১৬·৭৭	১৫ ৩৩	১৬·২৭
৪র্থ ,,	১৩·৭৪	১০ ৯০	১২ ৭৭	১১·৫৯	৯·০১	১০·৮০
৫ম ,,	১০·৮৯	৭·৩৪	৯ ৬৮	৮·৬৬	৬ ১০	৭ ৭৭
শহর এলাকায						
১ম শ্রেণীতে	২৭·৮৪	২৯·৪২	২৮·৫৩	২৯·৬৫	৩০·৮১	৩০·১৬
২য় ,	২০·৩২	২১·১৮	২০·৬৯	১৯·৭৪	২০·৪৫	২০·০৫
৩য় ,	১৮·৭২	১৮ ৮১	১৮·৭৫	১৯·৭১	১৯ ৯৪	১৯·৮১
৪র্থ ,,	১৭·২২	১৬·৫০	১৬·৯১	১৫·৩৮	১৫·৩৩	১৫·৩৬
৫ম ,,	১৫·৯০	১৪·০৮	১৫·১১	১৫·৫২	১৩·৪৭	১৪·৬১
মোট						
১ম শ্রেণীতে	৩৫·৮২	৪১·২০	৩৭·৭৭	৪০·৭৪	৪৪·৫৯	৪২·১৬
২য় ,,	২০·৭১	২১·২১	২০·৮৯	১৯·৪৫	১৯·৬৫	১৯·৫৩

৩য়	,,	১৭·১৮	১৬·১২	১৬·৮০	১৭·৩৭	১৬·৬১	১৭·০৯
৪র্থ	,,	১৪·৪২	১২·৩৬	১৩·৬৭	১২·৩৭	১০·৯৯	১১·৮৬
৫ম	,,	১১·৮৭	৯·১০	১০·৮৭	১০·০৬	৮·১৫	৯·৩৬

[Source : Second All India Educational Survey, Table 58, p. 126-7]

দেখা যাচ্ছে, সারাভারতের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্তরে স্কুলে যত ছাত্রছাত্রীর নাম লেখানো হয় তাদের মধ্যে ৫ম শ্রেণীতে দেখা যায় শতকরা মাত্র ৯-১০ জনকে। আর পশ্চিমবঙ্গে তার চেয়েও কম,—শতকরা মাত্র ৭·৮ জন ৫ম শ্রেণীতে পড়ে। সারণীর শেষ সারিটা—মোট ছাত্রছাত্রী-সংখ্যার শতকরা কতজন ৫ম শ্রেণীতে পড়ে—দেখলে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ এই সারিতে সবকটা ঘরেই সারাভারতের গড়পড়তা হাবের চেয়ে পেছনে। অন্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ 'কৃতিত্ব' হল, গ্রামাঞ্চলে ৫ম শ্রেণী স্তরে ছেলেদের শতকরা হারে পশ্চিমবঙ্গের অঙ্ক (৮·৬৬) সবার চেয়ে নীচে। এই কথাটা শিক্ষাসমীক্ষার বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে [Ibid, p. 3, paragraph 80]।

এই স্তরে শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলে অপচয় বেশি, মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে অপচয় আরো বেশি। সহজেই বোঝা যায়, দরিদ্র ও অবজ্ঞাত স্তরের পরিবারগুলিতে এই অপচয় বিপুল পরিমাণে হয়।

শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টে এই ব্যাপারটা নিয়ে যথেষ্ট বেদনা আক্ষেপ ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। রিপোর্টে এ বিষয়ে অনেক পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বলা হয়েছিল, "নিম্ন প্রাথমিক স্তরে এই অপচয়ের (wastage) হার ছেলেদের ক্ষেত্রে শতকরা ৫৬ ভাগ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে শতকরা ৬২ ভাগ।" [Report of Education Commission, p. 157]। এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে কমিশন যেসব কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য হল—

১। অপচয়ের শতকরা ৬৫ ভাগই হল দারিদ্র্যের কারণে। দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারে ছেলেমেয়ের বয়স ৯/১০ বছর হলেই বাপ-মা তাদের কাজে লাগাতে চায়, জীবিকা সংগ্রহের কাজেই হোক বা ঘরের কাজে বাপ-মাকে সাহায্য করার কাজেই হোক। বিশেষত, এসব সংসারে মেয়ের বয়স ৯-১০ বছর হলেই তার মা তাকে ঘরের কাজে টেনে নেয়। (Ibid, p. 159)

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দুরবস্থা। শ্রীহীন নিরানন্দ স্কুলঘরে

ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে ১ম শ্রেণীর পাঠচর্চা, একান্ত অনুপযোগী পাঠ্যসূচী, অযোগ্য শিক্ষকের দ্বারা অনুপযুক্ত পদ্ধতিতে পড়ানোর চেষ্টা। [Ibid, p. 157, 160]

শিক্ষাকমিশন এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণী বা ৫ম শ্রেণীতে শেষ হয়ে যায়, সেখানে ছাত্রছাত্রীরা বা তাদের পিতামাতারা পরের শিক্ষান্তরটি চোখের সামনে দেখে না; সেই কারণেও ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা চালিয়ে যাবার কোন তাগিদ থাকে না। [Ibid, p. 159]

মনে রাখা দরকার যে যেসব ছেলেমেয়ে ৪র্থ শ্রেণী বা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা চালিয়ে গিয়ে তারপর পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় তারা যেটুকু শিক্ষা পেল সকলে সেটুকুকে ধরে রাখতে পারে না। অক্ষরপরিচয়টুকু যারা ধরে রাখতে পারে, তারা সবাই বই পড়তে পারে বা কোনরকম কার্যকরী সাক্ষরতা বজায় রাখতে পারে এমন মনে করা ভুল। আরো মনে রাখতে হবে পাটীগণিতের প্রাথমিক জ্ঞান (numeracy) 'কার্যকরী সাক্ষরতা'র (functional literacy) মধ্যেই পড়ে, ওই জ্ঞান যার নেই তাকে 'সাক্ষর' বলা চলে না।

এই হারিয়ে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া বিদ্যার পরিমাণ হিসাব নিতে পারলে দেখা যাবে এদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় অপচয় হচ্ছে বিপুলভাবে।

এই অপচয়ের সঙ্গে জড়িত আছে একটি ব্যাপক ও গভীর দুর্নীতি। ব্যাপারটা সারা ভারতেই আছে, পশ্চিমবঙ্গেও বেশ প্রবলভাবে আছে। সরকারী নিয়ম অনুসারে ৪০টি ছাত্রছাত্রীকে তালিকাভুক্ত দেখাতে পারলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বীকৃতি পাবে, এবং প্রতি ৪০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ১ জন করে শিক্ষকের মঞ্জুরি মিলবে, সেই শিক্ষকটির বেতন সরকারী তহবিল থেকে দেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রীর তালিকা ফাঁপানোর প্রথম প্রক্রিয়া এখানে শুরু হল। প্রাথমিক স্তরে যথার্থ শিক্ষক নিশ্চয়ই কিছু আছেন, যাঁরা দারিদ্র্য ও বাধাবিঘ্নের মধ্যেও শিশুদের কিছুটা বিদ্যাদান করার চেষ্টা করে থাকেন, কিন্তু সন্দেহ হয় যে এঁদের সংখ্যা খুবই কম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষক ও সংগঠকরা দুর্নীতি অবলম্বন করেন, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ফাঁপিয়ে দেখান। দুর্নীতির পরবর্তী পর্যায় সরকারী পরিদর্শকের সঙ্গে ও আমলাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত—তাঁদের কিছু সন্তোষবিধান করতে হয়। এই সন্তোষবিধান-পর্বের উচ্চতর পর্যায় হল জেলা স্কুল বোর্ডের সদস্য, বিধানসভা সদস্য, স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক মাতব্বর প্রভৃতির

সন্তোষ-বিধান। এই দুর্নীতি-প্রবাহের এক সীমায় অস্তিত্বহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরকারী অনুমোদন লাভের জন্য এবং প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি পাবার জন্য খোলাখুলি টাকা দেওয়া নেওয়া। আরেক সীমায় প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরির জন্য ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাশের জাল সার্টিফিকেট দাখিল করা ও গ্রহণ করা।

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের যে অবস্থা তাতে 'অপচয়' সম্বন্ধে আরেকটি ভাবনাও এসে পড়ে। ছেলেমেয়েরা যদি পুরো ৫ বৎসর এসব বিদ্যালয়ে কাটায়, তাহলে সেটাও সম্ভবত খুব অপচয়ই হবে। একটু তাজা ধরনের ছেলেমেয়েরা, যাদের খানিকটা বিচারবোধ থাকে, তারা এসব বিদ্যালয়ে দুই-এক বৎসরের বেশি থাকবে কেন?

প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই একমাত্র বিচার্য নয়। ওই স্তরে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, বা শিক্ষা দেওয়ার নাম করে যে কর্ম বাস্তবে করা হয়, তার গুণাগুণ বিচার করাও অবশ্যকর্তব্য। শিক্ষা কমিশন অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিষ্প্রভ চরিত্র এবং ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করতে বা ধরে রাখতে তাদের অক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন['the dull character of most of the schools and their poor capacity to attract students and retain them"—Report of Education Commission, p. 160, paragraph 7·33]। এই অবস্থা শোধরাবার জন্য শিক্ষা কমিশন খুব মৃদুভাবে এবং প্রায় ভরসাহীনভাবে (—কারণ, দারিদ্র্য ও অভাব) যেসব সুপারিশ করেছিলেন, সেগুলির প্রতি কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিতরা কেউ বিশেষ কর্ণপাত করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আসলে শিক্ষা কমিশনের গোটা রিপোর্টটিই পণ্ডশ্রম হয়েছে, কারণ ওটির কোন গুরুত্বপূর্ণ কথাকে কার্যক্ষেত্রে কোন আমল দেওয়া হয়নি।

আমরা আবার সেই আদর্শবোধ, শিক্ষানুরাগ ও সততার কথাতেই ফিরে আসছি। অপচয় ও দুর্নীতির এই বিশাল পাহাড় ঠেলে সরাতে হলে ব্যাপক সচেতন গণ-আন্দোলন, সজাগ গণ-উদ্যম এবং আপসবিহীন সংগ্রামী নেতৃত্বের সংগঠন প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে শিক্ষার 'ক্রমবিবর্তনে' বিপরীত ছবিই প্রকট হয়েছে—প্রাথমিক স্তরে সেই বিপরীত ছবি সবচেয়ে প্রকট।

প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যান-কথা এখনো শেষ হয়নি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যার হিসাব দেখা দরকার।

দ্বিতীয় শিক্ষাসমীক্ষার বিবরণী অনুসারে ১৯৬৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে 'জনবসতি'র (habitations) মোট সংখ্যা ছিল ৬৭,৭০৩। 'গ্রাম' বলা যেত, কিন্তু যেহেতু সরকারী দপ্তরে 'গ্রাম' বলতে যা বোঝায় তা জনশূন্যও হতে পারে, এবং একটি 'গ্রাম'-এর মধ্যে আসলে কয়েকটি গ্রাম থাকতেও পারে, সেইজন্য 'জনবসতি' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। এই ৬৭,৭০৩টি 'জনবসতি'র শতকরা ৭২·৭২ ভাগই ক্ষুদ্রায়তন, এদের প্রত্যেকটির জনসংখ্যা ৫০০-র নীচে। এই ৬৭,৭০৩টি জনবসতির মধ্যে ২,০৬৪টির কাছাকাছি (এক মাইলের মধ্যে) কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। জনসংখ্যার হিসাবে শতকরা ৯৭·৫৫ জন লোকের কাছাকাছি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এই অঙ্কগুলো দেখতে খারাপ নয়। দ্বিতীয় শিক্ষাসমীক্ষার বিবরণীতে বলা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ আরেকটু সামান্য চেষ্টা করলেই জনসংখ্যার শতকরা ১০০ জনেরই ভৌগোলিক নাগালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় পৌঁছে দিতে পারবে। [Second All India Educational Survey, p. 22-3, paragraph 30]।

কিন্তু এই হিসাবটা কোন কাজের হিসাব নয়: এক মাইল দূরত্বের মধ্যেই হোক আর একেবারে পাড়ার মাঝখানেই হোক, যে প্রাথমিক বিদ্যালয় নামেই মাত্র বিদ্যালয়,যে বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীকে আকর্ষণ করতে পারে না, যে বিদ্যালয় বিদ্যাদান করে না—সেরকম বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি শুধু নিরর্থক নয়, অপচয়ও বটে।

সেরকম বিদ্যালয়ের কথা ছেড়ে দিয়ে আরেক রকম বিদ্যালয়ের কথা ভাবা যাক। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক যথার্থ শিক্ষক, বিদ্যালয়ে বিদ্যাদান করা হয়, এবং ছাত্রছাত্রীরা আকৃষ্টও হয়। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের স্থানাভাব—৫০/৬০টির বেশি ছাত্রছাত্রীর মাথার ওপর ছাউনি দেওয়ার অবস্থা এই বিদ্যালয়ের নেই, এবং ১ জন মাত্র শিক্ষক এই ৫০/৬০টি শিশুকে ১ম শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত সবটাই পড়ান। ৩০০/৪০০ লোকের গ্রামের মধ্যে এইরকম বিদ্যালয় একটি থাকলেও সব কটি শিশুর স্কুলে যাওয়া হবে না।

দ্বিতীয় শিক্ষাসমীক্ষার বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গে মোট প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ছিল (গ্রাম শহর মিলিয়ে) ৩৭,৪৩৮টি। এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির

প্রাথমিক শাখাগুলিকে ধরা হয়েছে। এই ৩৭,৪৩৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪,৪০.টিতে মাত্র একজন করে শিক্ষক ছিলেন, দুই জন করে শিক্ষক ছিলেন ১২,০৮৩টিতে এবং তিন জন করে শিক্ষক ছিলেন ১০,৩০৯টিতে। পশ্চিমবঙ্গের ৩৭৮টি প্রাথমিক শাখায় ওই তারিখে একজনও শিক্ষক কর্মরত অবস্থায় ছিলেন না। এই শিক্ষকশূন্য বিদ্যালয়ের ব্যাপারটি দেখা গিয়েছিল দুটি মাত্র রাজ্যে—পশ্চিমবঙ্গে এবং বিহারে। পশ্চিমবঙ্গের আরেকটি 'কৃতিত্ব' বলতে হবে।

এ রকম 'কৃতিত্ব' আরো আছে। এ রাজ্যে (অন্যান্য রাজ্যেও নিশ্চয়ই) কংগ্রেস আমল থেকে একটি প্রক্রিয়া চলে আসছে। কংগ্রেস দল প্রত্যেকটি নির্বাচনের সময়ে গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছুসংখ্যক নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় সৃষ্টি করতেন, এবং কয়েক হাজার লোককে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি পাইয়ে দিতেন। গ্রামাঞ্চলে ভোটসংগ্রহের কাজে এবটি বাহু এইভাবে প্রসারিত হত। এই প্রক্রিয়াটি মনে রেখে নীচের সারণীটি প্রণিধান করা যাক। পশ্চিমবঙ্গে সরকার-অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যার এই সারণীটি আমরা পাচ্ছি শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বাধীনে ১৯৭৪ সালে সংস্থাপিত "রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষৎ" [State Planning Board] কর্তৃক ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত পর্ষতের কার্যবিবরণীর সঙ্গে সংলগ্ন পরিসংখ্যান থেকে।

সারণী—১১

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা [জুনিয়র বেসিক ও নার্সারী সহ]

১৯৭০-৭১	—	৩৫,২৭৩
১৯৭১ ৭২	—	৩৬,৮১২
১৯৭২-৭৩	—	৩৯,৪০০
১৯৭৩-৭৪	—	৩০,৬৩১
১৯৭৪ ৭৫	—	৪১,৫৮১

[Source : State Planning Board, West Bengal, 1974-76, p. 512, Table 9·1.]

একটু থমকে যাওয়ার মতো পরিসংখ্যান। ১৯৭৩-৭৪ সালে এক বছরে প্রায় ৯০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় উবে গেল, পরের বছরে আবার প্রায় ১১০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় গজিয়ে উঠল! এই চমকপ্রদ দক্ষতার কোনো ব্যাখ্যা ওই দলিলের কোথাও নেই। দলিলটিতে শিক্ষা সম্বন্ধে আর কোনো তথ্যও নেই। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বিপুল অপচয় শিক্ষাকমিশনের বেদনা ও উদ্বেগ সঞ্চার

করেছিল, সেই বেদনাবোধ বা উদ্বেগের লেশমাত্রও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষতে বা সরকারী উচ্চ মহলে দেখা যায় না।

'রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষৎ' ওই ১৯৭৬ সালেই আরেকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন—West Bengal Today। এই পুস্তিকাটির লেখক তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রী শঙ্কর ঘোষ। ১৩৪ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটিতে শিক্ষার উল্লেখ আছে ২টি পৃষ্ঠায় (১১২—১৬), সেখানে শিক্ষার প্রসার নিয়ে বেশ সন্তোষের সুরেই কয়েকটি অঙ্ক দেওয়া হয়েছে। তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে "লুমপেন বুর্জোয়া" ফাঁকিবাজির একটি ছোট দৃষ্টান্ত হিসাবে এই অঙ্কগুলি দেখা যেতে পারে। যথা, মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ১৯৭১-৭২ সালে শিক্ষাখাতে রাজ্য সরকারের বরাদ্দ ছিল ৭৬·৩৬ কোটি টাকা,১৯৭৬-৭৭ সালে সেই বরাদ্দের পরিমাণ হল ১২৯·৭৩ কোটি টাকা [Shankar Ghose, West Bengal Today, State Planning Board, West Bengal, 1976—p. 115]। আর কিছু না বলে শুধু এইটুকু বলা কি রকম ফাঁকি তা ধরা পড়ে অন্যত্র উল্লেখিত কিছু তথ্য মনে রাখলে। যথা, মূল্যবৃদ্ধির হারের হিসাব—এটা টাকার দাম কমার হিসাবও বলা চলে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ দপ্তরের প্রদত্ত হিসাব অনুসারে সারাভারতে সমস্ত সামগ্রীর মোট পাইকারী দরের সূচক ১৯৭০-৭১ সালে ১০০ ধরে নিম্নরূপ ছিল :—

১৯৭১-৭২	—	১০০
১৯৭২-৭৩	—	১১৯
১৯৭৬-৭৭	—	১৭৯

[Economic Survey, 1978-79, Govt. of India, p. 98]

এই অনুসারে মোটা হিসাবে পাওয়া যায় যে ১৯৭১-৭২ সালের ৭৬ কোটি টাকা ১৯৭৬-৭৭ সালের ১৩২ কোটি টাকার সমতুল। অর্থাৎ, ১৯৭১-৭২ সালে শিক্ষাখাতে রাজ্যসরকারের বরাদ্দ যা ছিল সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হলে ১৯৭৬-৭৭ সালে বরাদ্দ হওয়া উচিত ছিল ১৩২ কোটি টাকা। শ্রী শঙ্কর ঘোষের হিসাব অনুসারেই বলতে হয় তাঁদের রাজত্বে টাকার অঙ্কে বরাদ্দ বাড়লেও শিক্ষার জন্য আসল বরাদ্দ কমানো হয়েছিল।

এই হিসাবটা আরেক রকমেও দেখা যায়। ওই পুস্তিকারই অন্যত্র লেখক সরকারী তহবিলে আয়বৃদ্ধির অঙ্ক দিয়েছেন। তাতে দেখা যায় বিক্রয়কর বাবদে রাজ্যসরকারের আদায় ১৯৭১-৭২ সালে ছিল ৭৪·১৮ কোটি টাকা (১৯৭১-৭২

সালের শিক্ষাখাতে বরাদ্দের চে" ২ ১৮ কোটি টাকা কম), ১৯৭৫-৭৬ সালে আদায় হয়েছিল ১৫৪ ৫৪ কোটি টাকা ।১৯৭৬-৭৭ সালের শিক্ষাখাতে বরাদ্দের চেয়ে ২৪·৮১ কোটি টাকা বেশি। [Ibid, p. 50]

বিক্রয়কর সহ সমস্ত রকম কর থেকে রাজ্য সরকারের আদায়ের পরিমাণও এই ছবি দেখায়। ১৯৭১-৭২ সালে মোট কর আদায় হয়েছিল ১৪৬ ০৪ কোটি টাকা, ১৯৭৪-৭৫ সালে ২২৪·৮৪ কোটি টাকা। ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে কর আদায়ের আনুমানিক হিসাব দেওয়া হয়েছিল ২৩৬ ৫৮ কোটি টাকা Ibid, p 51)। কর আদায়ের পরিমাণ যে বেগে বেড়েছে, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির বেগ তার চেয়ে অনেক কম।

এসব কথা উল্লেখ না করে শুধু শিক্ষাখাতে বরাদ্দের অঙ্ক দুটি জাহির করে বাহাদুরি দেখানো লুম্পেন চরিত্রের পক্ষেই সম্ভব

এই লুম্পেন চরিত্রেরই আরেক প্রকাশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির ঘোষণায়। ১৯৭৪-৭৫ সালে ৪১ ৫৮১টি বিদ্যালয়ের ১১০০০টি ওই বৎসরে সৃষ্টি করা হয়, সে হিসাব আমরা উল্লেখ করেছি। শ্রী শঙ্কর ঘোষের পুস্তিকায় ঘোষণা আছে যে ১৯৭৫ ৭৬ সালে আরো ,০৫০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে (Ibid, p 11-)।

'প্রাথমিক বিদ্যালয়' ব্যাপারটি একটি ব্যাপক জুয়াচুরির কারবারে পরিণত হয়েছে। সরকারী শাসকদলের প্রসাদ বিতরণের একটি প্রণালী এখানে। বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কংগ্রেস-বিরোধী অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলিও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারটিকে এই একইভাবে দেখেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরকারী বেতনভোগী শিক্ষকদের সম্বন্ধে যদি কোন গভীর সমীক্ষা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে এঁদের অনেকেই শিক্ষক নন। তাঁরা আসলে গ্রামাঞ্চলে জোতদারি-মহাজনি আড়তদারি-দোকানদারি করেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজটুকু কদাচিৎ করেন, সেই বেতনটি তাঁদের নির্দিষ্ট বাড়তি আয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়টির সরকারী অনুমোদন বজায় রেখে নিজের মাসিক বেতন-প্রাপ্তি রক্ষা করা—এইটুকুই এঁদের লক্ষ্য। শিক্ষার প্রসার বা উৎকর্ষ সাধন এঁদের লক্ষ্যও নয়, সাধ্যও নয়।

গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলিতেও অনেক জায়গায় এই একইরকম অবস্থা দেখা যাবে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও মূলত একই চরিত্র, কিন্তু সেই স্তরের বৈশিষ্ট্য হল প্রকাশ্যে জোতদারি-মহাজনি-দালালি বৃত্তির জায়গায়

শিক্ষার উচ্চস্তরের বিশেষ ধরনের কালোবাজার—অসাধু উপায়ে পরীক্ষায় পাশ-ফেল করানো, প্রাইভেট কোচিংয়ের ঢালাও দোকানদারি ব্যবসা, ছাত্রছাত্রীদের নির্বোধ মুখস্থবাজি, নকলবাজি এবং ফাঁকিবাজি শেখানোর বন্দোবস্ত। এসব কারবারের কোনো তথ্য বা পরিসংখ্যান নেই কিন্তু এগুলো সর্বজনবিদিত। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারে নানাবিধ দলীয় ও গোষ্ঠীগত পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপোষণ, ক্ষমতাসীন কর্তৃক রাজপ্রসাদ-বিতরণ, অযোগ্যের সমাদর ও যোগ্যের অনাদর, ইত্যাদি ধরনের বহু ঘটনা ঘটে থাকে। এসবের ফলে শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকদেরই মধ্যে অবজ্ঞা বৃদ্ধি পায়, ক্ষীণ আদর্শানুরাগ আরো ক্ষীণ হয়ে যায়, এবং দুর্নীতির সংক্রামক ব্যাধি মহামারীর আকার ধারণ করে।

শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তর সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা উচিত হলেও এখানে তার স্থানাভাব, এবং নানা পরিসংখ্যানের ভিড়ে মোটা কথাগুলো হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও আছে। আপাতত কয়েকটি তথ্যই মাত্র উল্লেখ করব।

উচ্চশিক্ষার স্তরে জনসংখ্যার অনুপাতে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ ভারতে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল (প্রতি দশ হাজারে ৪০ জন) এ তথ্য আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আমরা এই স্তরে অপচয়ের চিত্রটিই তুলে ধরতে চাই।

সাধারণ দৃষ্টিতেই এই স্তরে অপচয়ের তিন রকম চেহারা ধরা পড়ে :—

১। যেসব ছাত্রছাত্রী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তাদের একটা বড় অংশ এই স্তরের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে না। তারা অনেকে পরীক্ষায় 'ফেল' করে, আর বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী মাঝপথে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। সম্প্রতিকালে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে পরীক্ষায় ফেল-করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বিপুল। প্রতিবৎসরই এসব পরীক্ষায় মোটামুটি শতকরা ৫০ জন পরীক্ষার্থী ফেল করে, কোন কোন পরীক্ষায় ফেল-এর হার শতকরা ৭০-৮০ পর্যন্ত দেখা গেছে। এটা যে একটা বড় অপচয় তাতে সন্দেহ নেই। এই অপচয় এড়াবার উপায় কী? অবশ্যই, পঠনপাঠনের উন্নতিবিধান, পরীক্ষাব্যবস্থার ও পাঠ্যসূচীর উন্নতিবিধান, ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক

ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিবিধান। কিন্তু সেই দুরূহ কর্মের দায় এড়িয়ে এ দেশের শিক্ষাবিধাতারা একটা সহজ উপায় খুঁজেছেন পরীক্ষার মান নামিয়ে, পাঠ্যসূচীকে তরল করে ও কমিয়ে, ঢালাও ভাবে নম্বর বাড়িয়ে, এবং কৃত্রিমভাবে 'পাশ'-এর সংখ্যা বাড়িয়ে। শিক্ষা ও পরীক্ষার গোটা ব্যাপারটাকে প্রহসনে পরিণত করে এঁরা সহজে নিস্তার পাবার পথ নিয়েছেন। পরিণাম অবশ্যই ভয়ানক।

২। দ্বিতীয় ধরনের অপচয় দেখা যায় শিক্ষাপ্রাপ্তদের প্রাপ্ত শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন কাজে নিয়োগ। ১৯৪৭-এর পর বেশ কিছুকাল রব শোনা যেত,—বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবল আর্টস গ্র্যাজুয়েট তৈরি করে বেশি সংখ্যায়, বিজ্ঞান ও বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং এবং যন্ত্রবিদ্যায় বিদ্বান গ্র্যাজুয়েট তৈরী করা উচিত। বলা বাহুল্য একজন আর্টস গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে সমাজ রাষ্ট্র ও পরিবারের তহবিল থেকে যে খরচ করতে হয়, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং বা টেকনলজি বিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে খরচ তার চেয়ে অনেক বেশি। এখন এই ইঞ্জিনীয়ারিং গ্র্যাজুয়েট যদি ইঞ্জিনীয়ারের কাজ না করে সাধারণ কেরানির কাজই করেন, অথবা কৃষিবিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট যদি কয়লার কন্ট্রাক্টরি বা আড়তদারিতেই নিমগ্ন থাকেন, বা কেমিস্ট্রির এম এস সি মহিলা যদি সংসারের রান্নাবান্না ও প্রসাধনের কর্মেই ব্যস্ত থাকেন—তাহলে সেগুলো বড়ো অপচয়।

সারা ভারতে এরকম অপচয় অনেক, পশ্চিমবঙ্গেও অনেক। পশ্চিমবঙ্গে এরকম অপচয়ের কোনো হিসাব দেখতে পাইনি, কিন্তু সারা ভারতে এই অপচয়ের একটা নমুনা-সমীক্ষা করা হয়েছিল। সেই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে কর্মনিরত ৭৫,৪৪৫ জন সায়েন্স-গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে শতকরা মাত্র ২৮ জন বিজ্ঞান সম্পর্কিত টেকনিকাল কাজে নিযুক্ত ছিলেন; শতকরা ৩২·৪ জন বিজ্ঞানশিক্ষকের কাজ করছিলেন, এবং শতকরা ৩৯·৬ জন লিপ্ত ছিলেন এমন কাজে যার সঙ্গে তাঁদের বিজ্ঞানের ডিগ্রীর কোন সম্পর্ক নেই [B. Dey, 'Scientific and Technical Personnel', Economic & Political Weekly, 1969, No. 4]। পশ্চিমবঙ্গেও এই চেহারা দেখা যাবে বলেই মনে হয়।

৩। কিন্তু এসবের চেয়েও বড়োরকম অপচয় দেখা যায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধিতে। ম্যাট্রিকুলেশন এবং তদূর্ধ্ব পরীক্ষায় [এম এ, এম এস সি, পি এচ ডি সহ] পাশ করা যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রদত্ত হিসাবে দেখা যায় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের 'লাইভ রেজিস্টারে' তালিকাভুক্ত কর্মহীন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

সারণী—১২

তালিকাভুক্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা : পশ্চিমবঙ্গ

	সংখ্যা	বৃদ্ধির হার
১৯৭৬ (৩১শে ডিসেম্বর) (১)	৫,৩৩,৮৬৯	
১৯৭৭ (৩১শে ডিসেম্বর) (১)	৬,২০,৫৩৮	১৬·৩%
১৯৭৭ (৩০শে জুন) (২)	৬,৩২,৩৫২	
১৯৭৮ (৩০শে জুন) (২)	৭,৮৬,৬৫২	২৪·৪%

[Source : (1) Labour in West Bengal, 1977, Dept. of Labour, Govt. of West Bengal, p. 89, 96. (2) Labour in West Bengal, 1978, Dept. of Labour, Govt. of West Bengal, p. 93]

১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৭৮ সালের দুই বৎসরের মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এরকম শিক্ষার প্রসারে সমাজের কোন উপকার হতে পারে?

কিছুকাল আগেও রব শোনা যেত যে যেহেতু শিক্ষিত বেকাররা অধিকাংশই শুধু কেরানি হবার যোগ্য সেইজন্যই তাদের কাজ দেওয়া যায় না। ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনলজি শেখা লোকেদের কাজের অভাব নেই। সে সময়ে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে আসন বৃদ্ধি করা হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গে সে সময়ে অনেক অর্থব্যয় করে বেশ কয়েকটি 'পলিটেকনিক' ও 'জুনিয়র টেকনিকাল স্কুল' স্থাপন করা হয়। ১৯৬৭ সাল নাগাদ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা এমন বৃদ্ধি পেতে থাকে যে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর এক নির্দেশ দিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা অর্ধেক করে দেন। পলিটেকনিক ও জুনিয়র টেকনিকাল স্কুলগুলির সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা খুব কম ছেলেরই কাজে লেগেছে, এবং এগুলি এখন শূন্যগর্ভ হয়ে পড়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক বাজারের ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান

মন্দা, এবং চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা শিক্ষাক্ষেত্রে দারুণ বিকৃতি ঘটাচ্ছে। বেকার-সমস্যার জন্য প্রথমত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভিড় বাড়ছে দ্রুতবেগে। যেসব ছেলেমেয়েদের এই স্তরে বিদ্যাচর্চা করার কথা নয়, যারা খানিকটা সন্তোষজনক জীবিকার সন্ধান পেলে সেখানেই চলে যেত, তারা অগত্যা ছাত্রাবস্থা প্রলম্বিত করছে। বেকার-সমস্যার আসল চেহারা এতে খানিকটা ঢাকা থাকে। এই ঘটনা ঘটছে বেকার-সমস্যা-পীড়িত সব দেশে, শুধু ভারতে নয়। মার্কিন দেশে বেকারসমস্যা এখন বেশ প্রবল, ১৯৭৭ সালেও সেখানে ৬৭ লক্ষ ৭৩ হাজার৷ তালিকাভুক্ত বেকার ছিল [The Economist, London, Nov. 5, 1977] সেই দেশেরই একজন সমাজবিজ্ঞানী মন্তব্য করেছিলেন, '৩৭ বৎসর মেয়াদী কলেজগুলো বেকার-সমস্যার আবরণ" ["... two-year colleges are institutions of masked unemployment .."— Stanley Arohowitz, False Promises, Mcgraw Hill Book Co, New York, 1973, p. 87]। বেকার-সমস্যার ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় বাড়ছে, আবার শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত করেও ছেলেমেয়েরা অনেকে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এই অপচয়ের হিসাব করাই কঠিন।

এখানেও এদেশের শিক্ষাবিধাতারা সহজ রাস্তা খুঁজছেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমানোর পথে। একথা কি সত্য যে যতসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত মানুষ দেশের বাস্তব প্রয়োজন সে তুলনায় আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি? এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে প্রয়োজন নির্ধারণের মানদণ্ডের ওপর। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সবকিছুরই নিয়ামক হল বাজারের দর, চাহিদা ও জোগানের হিসাব। কিন্তু বাজারের চাহিদা আর সমাজের বাস্তব প্রয়োজন এক নয়। মন্দা-গ্রস্ত অর্থনীতিতে বাজারের চাহিদা বাস্তব প্রয়োজনের অনেক নীচে পড়ে থাকে। যেমন ধরুন, আমাদের দেশে প্রত্যেকটি নরনারী ও শিশুকে যদি সভ্য ও স্বাস্থ্যবান সমাজের উপযুক্ত কাপড় পরাতে হয় তাহলে দেশে যে পরিমাণ কাপড় এখন তৈরি হয় তাতে কুলোবে না। অথচ যা তৈরি হচ্ছে তারই সবটা কেনবার ক্ষমতা দেশের মানুষের নেই, একটা অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বাজারে চাহিদার হিসাব করলে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি, কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনের কথা ভাবলে এই সংখ্যা যৎসামান্যই মনে হয়। এ বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে তুলনা করার অঙ্ক, ভারত সরকারের প্রদত্ত হিসাব অনুসারে, নিম্নরূপ :—

জনসংখ্যার প্রতি এক হাজারে উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠরত
ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা

১।	চীন	(১৯৬২)	১২২
২।	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	(১৯৬৯)	৩৯
৩।	সোভিয়েত ইউনিয়ন	(১৯৬৯)	১৯
৪।	জাপান	(,,)	১৬
৫।	পোল্যাণ্ড	(,,)	১০
৬।	মিশর	(,,)	৬
৭।	ভারত	(১৯৬৫)	২

[Source : India, Pocket Book of Economic Information, 1972, Ministry of Finance, Govt of India, Table 16.18]

দেখা যাচ্ছে যে সভ্যতার মানদণ্ড অনুযায়ী উচ্চশিক্ষাস্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যায় ভারত বেশ পশ্চাৎপদ। পশ্চিমবঙ্গের এই অঙ্কটা ভারতের গড়পড়তা অঙ্কের চেয়ে বেশি, প্রতি হাজারে ৪, তাহলেও সেটা বিশেষ উচ্চমানের নয়।

উচ্চশিক্ষা সমাপন করে যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে তারা কী করে? তাদের অনেকে বেকার অবস্থায় থাকে বেশ কিছুদিন, কেউ কেউ স্থায়ী বেকার হয়ে জীবন শেষ করে, যারা কাজ পায় তারা অনেকে তাদের শিক্ষার সমতুল বা উপযোগী কাজ পায় না, অথবা তাদের বিশেষ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হাল্কা কাজই পছন্দ করে নেয়; আর, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট অনুসারেই যারা কাজ পায় তাদের অনেকে আলস্য-শৈথিল্য-ফাঁকিবাজি-দুর্নীতি-চালাকির বিস্তৃত জালের সামিল হয়ে যায়।

যারা বেকার হয়ে থাকে, তাদের এক অংশ লুমপেন প্রলেতারিয়াতের সংখ্যা বাড়ায়। যারা কাজ পায় তাদের এক অংশ সেই স্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে যে স্তরকে পল বারান 'লুমপেন বুর্জোয়া' আখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ 'লুমপেন পেটিবুর্জোয়া' নামে আরেকটি মধ্যবর্তী স্তরকে চিহ্নিত করেছেন [P.C. Joshi, 'The Cultural Dimension of Economic Development', Towards a Cultural Policy (Ed. Satish Saberwal), Vikas, Delhi, 1975, p. 59]। এই লুমপেন পেটিবুর্জোয়া স্তর—অসাধু, ফাঁকিবাজ, অতিচতুর, শিক্ষাসংস্কৃতির অন্তঃসারশূন্য, আস্ফালনসর্বস্ব, সুবিধাবাদী, স্বার্থপর,

ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রদৃষ্টি 'বাবু'-শ্রেণী—এদের বিশাল বৃদ্ধি এবং ক্ষমতার বিভিন্ন ধাপে এদের ক্ষুদ্র প্রভাবের প্রসার, ১৯৪৭-এর পর থেকে ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ক্রমবিবর্তনের এটা একটা বড় অঙ্গ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানত এদেরই সেবা করে থাকে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকরী পরিচালনাও এদের হাতে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে যদি বাঘ, নেকড়ে ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে এদের বলতে হয় ওইসব হিংস্র জন্তুর সহচর শৃগাল ফেরুপাল।

শিক্ষাক্ষেত্রের ক্ষমতামঞ্চের বিন্যাসে এদের স্থান অনেকখানি জায়গা জুড়ে। দক্ষিণপন্থী বামপন্থী সবরকম রাজনৈতিক দলের শিক্ষা-রাজনীতির এরা উপাদান উপায় ও নিয়ন্তা। সুবিধাভোগী পরগাছা শ্রেণীর অন্তর্গত এরা, এদের কল্পিত সমস্ত রকম শিক্ষা-সংস্কার সেই সুবিধাভোগী পরগাছা শ্রেণীর অবস্থানকেই রক্ষা করে, অথবা তাকে পুষ্ট করে। শিক্ষা বিষয়ে যে-কোন বৃহৎ কল্পনাকে এরা কার্যক্ষেত্রে হাস্যকর প্রহসনে পরিণত করে দিয়ে থাকে। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, এদের ভণ্ড পুষ্পাঞ্জলি পেয়ে থাকেন; মার্কস বা মাও-সেতুঙের গুণগানেও এরা পিছপা হয় না। সবকিছুকেই নিজেদের জারকরসে জারিয়ে, অন্তঃসারশূন্য করে দেবার ক্ষমতা এদের আছে। সম্প্রতিকালে সংবাদপত্র পত্রিকা, সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও ইত্যাদির মারফতে এদের সেই জারকরসের বিস্তার অনেকদূর বেড়েছে।

অন্যরকমও আছে, সে কথাটা এড়িয়ে গেলে অন্যায় হবে এবং গুরুতর ভুল করা হবে। শিক্ষার দুর্দশা, অব্যবস্থা ও দুর্নীতিগ্রস্ত অপচয়মূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ক্ষোভ, ক্রোধ, প্রতিবাদ আছে। সংখ্যায় স্বল্প হলেও, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এমন মানুষ আছে যারা অসাধু ফাঁকিবাজ সুবিধাভোগী পরগাছা হতে চায় না। এমন ছাত্রছাত্রী আছে যারা সততাকে শ্রদ্ধা করে, শিক্ষাকে সম্মান করে, চালাকির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে।

এই অন্য দিকটা আছে বলেই এসব আলোচনার প্রয়োজন আছে। তা না হলে এসব আলোচনা নিরর্থক হয়ে যেত।

পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যে ইংরেজ আমলে তৈরি করা শিক্ষাব্যবস্থারই খানিকটা বর্ধিত-স্ফীত চেহারা একথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এ শিক্ষাব্যবস্থার মূল কাঠামো ঔপনিবেশিক।

স্বভাবতই স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা অঙ্গীকার ছিল,—শিক্ষাব্যবস্থাকে 'ঢেলে সাজা' (overhaul) হবে। সেই 'ঢেলে-সাজা'র বুকনি আমরা সবাই

ক্রমাগত আউড়ে চলছি। সরকারী শিক্ষাবিধাতারা ১৯৪৭ সালের পর থেকে ঢেলে-সাজার নাম করে কিছুদিন পরপর যেসব পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তাতে মূল কাঠামোর গায়ে আঁচড় পড়েনি, শুধু অসঙ্গতি বিশৃঙ্খলা এবং অপচয় বেড়েছে।

ইংরেজ আমলে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এবং সমান্তরালে যে প্রতিবাদী ও অগ্রগামী ধারা বহমান ছিল, তার সামান্য উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি। সেই অগ্রগামী ও প্রতিবাদী ধারা সম্বন্ধে আরো কয়েকটি ক।। এখানে সংক্ষেপে স্মরণ করা কর্তব্য।

প্রথমে ধরা উচিত রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের কথা। সম্প্রতিকালে কেউ কেউ এঁদের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দি রূপে চিত্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। শিক্ষাব্যবস্থার পত্তনে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ভূমিকাকেও সেই প্রসঙ্গে একইভাবে নিন্দা করা হয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ও তাঁদের মতো আরো কিছু লোকের সাহায্যে সমর্থনে ও প্ররোচনায় ইংরেজ শাসকরা এদেশে দেশীয় শিক্ষাকে বর্জন করে ইংরেজী শিক্ষাই প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল, —এবং এইভাবে ঔপনিবেশিক পরভাষানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠল, যার যন্ত্রণা আমরা এখনো ভোগ করছি—মোট কথাটা এইরকম দাঁড়ায়।

এই মোট কথাটা অনৈতিহাসিক, ভুল, এবং সংকীর্ণ-অবিচার-প্রসূত। প্রথমত রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের কালে এ প্রশ্ন ছিল না যে, শিক্ষাদান ইংরেজী ভাষায় হওয়া উচিত না মাতৃভাষায়—বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায়—হওয়া উচিত। সে সময়ে বাঙলা ভাষা প্রাথমিক স্তরের ঊর্ধ্বে কোন স্তরে শিক্ষাদানের পক্ষে নিতান্ত অপরিণত ছিল। আমাদের সর্বদা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা উচিত যে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর বাঙলা গদ্যের পথনির্মাতা, এই গদ্যকে উচ্চশিক্ষাব বাহন করে তোলার কাজে তাঁদের দান অনেকখানি। তা ছাড়া, ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত বাঙালী শিশু মাতৃভাষায় প্রথম পাঠ করত যে বর্ণপরিচয়, সেটি বিদ্যাসাগরেরই রচনা, এবং মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য তাঁর উদ্যমটা নেহাত কথার কথা ছিল না।

'ইংরেজী না বাঙলা'—এঁদের কাছে সে প্রশ্ন ওঠেনি, উঠতে পারত না। এঁদের সময়ে প্রশ্ন ছিল, 'ইংরেজী না সংস্কৃত'। সেই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় যেসব গ্রন্থ ছিল এবং যেসব চর্চা হত, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে এঁরা আধুনিক শিক্ষার দিকেই তাকিয়েছিলেন। ইংরেজী ভাষার চেয়েও এঁদের কাছে মূল্যবান ছিল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, অষ্টাদশ শতকের ব্রিটেনের উচ্চশিক্ষিত স্তরে যুক্তিবাদের

চর্চা, ভূগোল-ইতিহাসের জ্ঞান, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রযুক্তিবিজ্ঞান। এই জ্ঞানভাণ্ডারকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে, এই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এঁদের প্রতিবাদ ছিল প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন বন্ধ্যা বিদ্যার বিরুদ্ধে। যাঁরা মনে করেন যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটিমাত্রই লক্ষ্য থাকা উচিত ছিল—বিদেশী শাসনের অবসান, এবং পূর্ববর্তী কালের বাদশাহ-নবাব-সামন্ত-পুরোহিত-কাজী-মোল্লার শাসন ও মধ্যযুগীয় শিক্ষাসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ ছিল না—তাঁরা ভুল করেন।

অবশ্যই রামমোহন বা বিদ্যাসাগর বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম করেননি, বিদেশী শাসনের প্রত্যক্ষ সমর্থনই করেছেন। শিক্ষার জন্য তাঁদের প্রয়াস বিদেশী শাসনের কাঠামোর মধ্যেই 'যতটুকু করা সম্ভব ততটুকু' করার প্রয়াস। তাঁরা বিপ্লবী বা বিদ্রোহী ছিলেন না, তাঁরা সংস্কারের রাস্তায় চলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা চলতে শুরু করেন। তাঁদের সেইটুকু চলাই তখনকার কালে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, প্রাচীন স্থাবরপন্থীদের আক্রোশ জাগিয়েছিল।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি কিছু মানুষকে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে, প্রায় সমান্তরালভাবে, এক বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার কল্পনা ও প্রয়াস করেছিলেন। বিবেকানন্দের চিঠিপত্রে এরকম একটা উদ্যমের ঝলক দেখা যায়—যেখানে তিনি গ্রামে গ্রামে কর্মরত কৃষকদের মাঝে চারণ-শিক্ষকদের স্বপ্ন দেখছেন, যারা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের কিছু কথা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে।

"(১) মনে কর কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—কোন কাজ করে?—তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী—গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বলে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না।···গরীবেরা এত গরীব, তারা স্কুলে পাঠশালে আসতে পারে না, (২) ধরুন, যদি আমরা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিতে সক্ষমও হই তথু দরিদ্রঘরের ছেলেরা সে-সব স্কুলে পড়িতে আসিবে না; তাহারা বরং ঐ সময় জীবিকার্জনের জন্য হালচাষ করিতে বাহির হইয়া পড়িবে। ···যদি পর্বত মহম্মদের নিকট না-ই আসে, তবে মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যাইতে হইবে। দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে, তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যাইতে হইবে।···"

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭১, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১২, ৪৩৬। ১৮৯৪ সালে মার্কিন দেশ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে লেখা বেশ কয়েকখানি চিঠিতে বিবেকানন্দ এই পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন,—পত্রসংখ্যা ৮৪, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ১০২, দ্রষ্টব্য]

প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে ভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের আরেকটি কল্পনা আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছিলাম। তাঁর কল্পিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সর্বাঙ্গীণভাবে-বিকশিত ও প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা পুষ্ট মানবিক ব্যক্তিত্বকেই লক্ষ্য করা হয়েছিল। "আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকলরকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্যে যেসকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন… যেসকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সব-গুলিরই সমবায়…" [রবীন্দ্রনাথ, "বিশ্বভারতী", বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৮, পৃ ১৪৮-৪৯] শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে এই ভাবনা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিদ্রোহী ভাবনা। তার সঙ্গে ছিল "বিশ্বপ্রকৃতির শিক্ষকতার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন শিক্ষা" এবং "মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয় কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি" দেওয়ার শিক্ষার কথা [ঐ, পৃঃ ৪৯, ৮৩]। অতিসম্প্রতি কালে এসব কথা নতুন গুরুত্ব ও জরুরী তাগিদ নিয়ে হাজির হচ্ছে অগ্রসর পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে।

এই সকল মহৎ কল্পনার সঙ্গে একটা খুব প্র্যাকটিক্যাল কথাও ছিল। স্কুল করতে হলে বাড়িঘর দরকার, অনেক টাকা দরকার—অথচ দরিদ্র এবং পরাধীন দেশে শিক্ষার জন্য টাকার সংস্থান অতি সামান্য। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন বাড়িঘর ইমারতের খরচা বাদ দিয়ে। গাছতলায় পাঠচর্চা শুধু তপোবন-আদর্শের জন্যই নয়, কাব্যিক আবেগের জন্যও নয়। বাড়িঘর নির্মাণের অপেক্ষায় বসে না থেকে গাছতলা মাঠ ঘাট যেখানে পারা যায় ছোট প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলার দিকে ব্যাপক উদ্যোগ সৃষ্টি করার একটা কল্পনা তাঁর ছিল। গাছতলা হলেই যে দীনহীন চেহারা হওয়া একান্ত অনিবার্য নয়, একটু পরিশ্রম করলে সেখানেও যে পরিচ্ছন্নতা এবং কিছুটা সৌন্দর্য রক্ষা করা যায় তাও তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন।

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু স্বাধীনতার পর [illegible] [illegible] [illegible] থেকে

এক অত্যন্ত ব্যয়বহুল ফ্যাশন চর্চার মডেল হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা সারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার এক প্রান্তে একটি মনোরম দ্বীপ মাত্র হয়ে আছে।

ভারতে শিক্ষাবিষয়ে অন্যভাবে ভাবতে যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন, গান্ধীজী তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান নাম। স্বাধীনতার পরে শিক্ষাবিধাতারা গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষা-পরিকল্পনার কথা বারবার উল্লেখ করলেন। বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তারের নাম করে প্রভূত সরকারী অর্থব্যয়ও হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা শূন্যগর্ভ হয়ে রইল।

গান্ধীজীর পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্য অনেক আপত্তি জাগায়। আপত্তিগুলি উল্লেখ করার পূর্বে কিন্তু একথা উল্লেখ করতে হয় যে গান্ধীজী প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি প্রধান ও মৌলিক ত্রুটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন। এই শিক্ষাব্যবস্থা যে অপচয়মূলক, কায়িক শ্রম ও উৎপাদনকর্মের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এবং জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এই শিক্ষাব্যবস্থা যে 'বাবু'ই তৈরি করে, মানুষ তৈরি করে না—এ কথাগুলো তিনি বলেছিলেন।

আপত্তি হল গান্ধীজীর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। গান্ধীজীর পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল প্রাক্-ধনতান্ত্রিক গ্রামসমাজের উপযোগী সাধারণ মানুষ— যারা কৃষিতে ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত হস্তশিল্পে ও কুটীরশিল্পে শ্রম জোগাবে। বুনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কোন একটি কারিগরি কাজ—প্রধানত চরখা দ্বারা সুতো কাটার কাজ। এই কল্পনার পশ্চাৎদমুখিতা এখন খুব স্পষ্ট। ভারত বা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এখন কতজন চরখা চালায়?

আমরা যদি চরখার জায়গায় বাইসাইকেলকে বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু করে ভাবি তাহলে ছবিটা অন্যরকম হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী—উভয়েরই শিক্ষাপরিকল্পনার প্রধান সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে তাঁরা রেলওয়ে লোহাকয়লার খনি এবং ইস্পাত কারখানার অর্থনীতি থেকে অনেক দূরে তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্থাপনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী এবং পূর্ববর্তী শিক্ষাগুরুরা না হয় সকলেই নিজ নিজ সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থাগুলি না হয় গ্রহণযোগ্য হল না। কিন্তু পরবর্তী কালে যাঁরা শিক্ষার খোল-নলচে বদলে ঢেলে সাজার কথা অনেক বললেন, তাঁরা কার্যক্ষেত্রে কী করলেন? শিক্ষার ক্রমবিবর্তনের পর্যালোচনায় এ প্রশ্নটা খুব পীড়াদায়ক, কারণ এর উত্তরে শূন্যতা অথবা নেতিবাচক সমালোচনা ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে একধরনের একটা প্রতিবাদ উঠছিল ১৯৫০ সাল থেকেই। এর একদিকে ছিল শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির আন্দোলন, আরেকদিকে ছিল ছাত্রছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও তিক্ত হতাশা। শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি হয়েছে বটে, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির বাজারে সেই বৃদ্ধি বাস্তবে খুব সামান্যই মনে হয়। ছাত্র-অসন্তোষ বাড়তে বাড়তে ১৯৬৯-৭০-৭১ সাল নাগাদ একটা অন্যরকম জটিল বিভ্রান্তির মধ্যে দিশা হারিয়ে ফেলে।

নকশালপন্থীরা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থার ঢালাও নিন্দা করছিলেন। তাঁদের কার্যসূচী কিন্তু কোন বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা পত্তন করার দায়দায়িত্ব নেয়নি। তাঁরা দীর্ঘমেয়াদী সশস্ত্র গৃহযুদ্ধের কথা বলেছিলেন, সেজন্য 'মুক্ত অঞ্চল' সৃষ্টি করার কথাও বলেছিলেন, কিন্তু মুক্ত অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রার কোনো কাঠামোর কথা আদৌ ভাবেননি এবং সেরকম ভাবনার প্রচেষ্টাকেও কোন আমল দেননি। চীনের গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে 'মুক্ত অঞ্চল' বিকল্প উৎপাদনপদ্ধতি উৎপাদনসম্পর্ক শিক্ষাব্যবস্থা চিকিৎসাব্যবস্থা ইত্যাদির মডেল মানুষ দেখতে পেত,—তার আকর্ষণেও অনেক লোক কুওমিনটাঙ এলাকা ছেড়ে মুক্ত এলাকায় চলে যেত। এদেশে নকশালপন্থীরা স্কুল কলেজ ভাঙা জ্বালানো-পোড়ানো এবং অচল করে দেওয়ার পথই কার্যক্ষেত্রে নিয়েছিলেন। পরিণামে শুধু যে তাঁরাই পরাজিত হলেন এবং বহু প্রাণ বিসর্জন দিলেন তাই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এবং প্রশাসনের মধ্যে ব্যাপক ফাঁকিবাজি ও অসাধুতার অজুহাতও তৈরি করে দিলেন। 'শান্তভাবে পরীক্ষা হচ্ছে', এই কথা জাহির করবার প্রয়োজনে শিক্ষক-প্রশাসকরা গণ-টোকাটুকি ও ঢালাও জুয়াচুরিতে প্রশ্রয় দিতে থাকলেন। শিক্ষার প্রহসনের মধ্যে আরেক প্রহসন হতে থাকল। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ক্রমবিবর্তনে এই পর্বটির জের এখনো মেটেনি।

মোট কথা, স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ক্রমবিবর্তনে দিশাহারা অবস্থাই প্রকট। যা আছে তা যথেষ্ট খারাপ। এর বদলে কী করতে হবে সে কথাটা পরিষ্কার নয়। সেজন্য প্রথম প্রয়োজন শিক্ষার নতুন চিন্তাদর্শ এবং তার সঙ্গে সমন্বিত কার্যসূচী। কতকগুলো টুকরো টুকরো ভালো কথা দিয়েই এই প্রয়োজন মেটানো যাবে না।

বাঙালী বুদ্ধিজীবী ঃ চারিত্র্য: বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা

অরবিন্দ পোদ্দার



সব আরম্ভের আগেই কিছু না কিছু কথা থেকে যায়, যা নতুন আরম্ভকে চিহ্নিত করে, এর ঐতিহাসিক ভূমিকা নিরূপণ করে, এবং ভবিষ্যতের অন্য এক আরম্ভের দিকে একে টেনে নিয়ে যায়, এর অঙ্গাবরণের বৈচিত্র্য উন্মোচিত করে।

তেমনি, স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য জানার জন্য স্বাধীনতা-পূর্ব আমলের, অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে সাম্রাজ্যবাদী-ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক-রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। কারণ, আধুনিক কালের বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের পূর্বগামীদের মানসপ্রকরণ, বোধ-উপলব্ধি ও মননের অধিকার লাভ করেছেন ; আর, ঐতিহ্য যাঁদের অর্থাৎ পূর্বগামীরা ছিলেন ঐ রাষ্ট্রকাঠামোর মানসসন্তান। সুতরাং, তাঁদের ঊনবিংশ-শতকীয় মনোভঙ্গি, আচরণ, বিশ্ববোধ ইত্যাদি থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধের, নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিচরণশীল বুদ্ধিজীবীদের কিছু কিছু গোত্রগত পরিচয় লাভ করা সম্ভব হবে। আর, আমার দৃঢ় অভিমত, বিশ্লেষণের পক্ষেও তা সহায়ক।

সমাজবিজ্ঞানের পণ্ডিতবর্গ সাধারণভাবে এ বিষযে সকলেই একমত যে, অর্থ নৈতিক উৎপাদনে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা নিযে যখনই কোন সামাজিক শ্রেণী ইতিহাসের কোন স্তরে আবির্ভূত হয়, এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামোয় তার আধিপত্য বিস্তার করে, তখন প্রায় একই সঙ্গে এক বা একাধিক গোষ্ঠী বুদ্ধিজীবীরও আবির্ভাব ঘটে। এঁরা এই অর্থনৈতিক শ্রেণীর আবির্ভাবের ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতার কথা বলেন, মানবিক বিকাশের তৎকালীন পরিবেশে তাব প্রগতিশীল ভূমিকাব কথা প্রচার করেন, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে তার ভাবাদর্শ বিশ্লেষণ ও এর প্রতি সমর্থন জানান, এবং এভাবে তার সামাজিক-রাজনৈতিক আধিপত্যের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় করেন। শুধু যে আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই এঁদের বিচরণ সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও আদর্শের ক্ষেত্রেও ঐ বুদ্ধিজীবীর দল সেই শ্রেণীকে আত্মসচেতনতার বোধে সমৃদ্ধ করেন এবং তার আপেক্ষিক প্রগতিশীলতার বাণীকে করেন সংহত। ইতিহাসের আরম্ভের কাল থেকেই কাল থেকে কালান্তরে প্রবেশের লগ্নে এই বুদ্ধিমার্গীয় বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। এই বৈশিষ্ট্যের কথা উপলব্ধি করার জন্য সুদূর অতীতে না গিযে আমাদের ধরাছোঁযার কালের মধ্য থেকে এর নজীর উপস্থাপন করা যাক।

আধুনিক কালের ধনিকশ্রেণীর অভ্যুদযের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শ, অর্থনীতি, সমাজদর্শন, আইন, সাহিত্যসংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর তাত্ত্বিক প্রবক্তা পণ্ডিতবর্গেরও আবির্ভাব ঘটেছিল। পারস্পরিক সম্পর্কের আত্মিক ঐক্যের মাধ্যমে এঁরা একটি সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টি সৃষ্টি কবেছিলেন যা অপ্রতিরোধ্য গতিতে বিশ্বময ছড়িযে পড়েছিল, এবং আজও যার ঐতিহ্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে বহমান। আরও স্পষ্ট করে বলা যায, অর্থ ও মেধা, এই দুটি প্রধান স্তম্ভের উপর দাঁড়িযে ধনিকশ্রেণী তার তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদার, গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতার আদর্শের বাণী প্রচার করেছিল। আর, ধনতন্ত্রের বিকাশের ইতিহাস থেকে এটাই নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে যে, শুধু অর্থেরই নয, সামাজিক রূপান্তরে, স্থিতিরক্ষায় এবং নতুন রূপান্তরের প্রবাহে মেধারও একটা অতিশয় কার্যকর ভূমিকা থাকে; আর, অর্থের সঙ্গে মেধাও সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতার এক নতুন নির্ণায়করূপে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু, একথাও সত্য যে, সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামোর উপাঙ্গে যে-সব ভাবরাশি বিচরণ করে, মানুষের চিন্তামননকে প্রভাবান্বিত করে, এবং

নানাপ্রকার সংঘাতের সৃষ্টি করে, মৌল কাঠামোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সরল-রেখানুগ অথবা দুয়ে দুয়ে চার-এর মতো প্রত্যক্ষ বা যান্ত্রিক নয়। অথবা, একটিকে অপরটির অবিকৃত প্রতিফলন রূপেও গ্রহণ করা যায় না। তার প্রধান কারণ, সামাজিক উৎপাদনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ধনিক, শ্রমিক বা কৃষকের মতো সরলরেখানুগ নয়; তা নানান ধরনের পারস্পরিক সূক্ষ্ম সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ, অতএব অনেকটা দূরবর্তী। সে জন্য, ইতিহাস এই সাক্ষ্যও বহন করছে যে. একই সমাজের আন্তর সম্পর্ক থেকে উদ্ভিন্ন এবং একই উৎপাদন-কাঠামোর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীদের সব গোষ্ঠী চিন্তায় অনুভবে আদর্শে সামাজিক মূল্যবোধে ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকেনি। কিছু কিছু গোষ্ঠী স্বেচ্ছায় সেরূপ থেকেছে, আবার অন্যান্যরা এই বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর সীমার মধ্যেও অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচিন্তার স্বাক্ষর রেখেছে, এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্য আদর্শে উপনীত হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা, সমাজবিপ্লবে আস্থাশীল বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক সংগ্রামের অসংখ্য নেতা। এই বৈশিষ্ট্য ও আদর্শগত বৈপরীত্যের দরুন বুদ্ধিজীবীদের, সামগ্রিকভাবে, সমস্বার্থের চেতনায় আবদ্ধ একটি আর্থনীতিক শ্রেণীরূপে গ্রাহ্য করা যায় না। তাঁদের কারও কণ্ঠ স্থিতাবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের সপক্ষে, কারও কণ্ঠ এর রূপান্তরের সপক্ষে উচ্চারিত হয়।

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পথে, তেমনি, এদেশে বিপুলসংখ্যক উপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী ছিল। বিজেতার ভূমিকায় ঐ শাসনব্যবস্থা যেসব আপাত প্রগতিশীল মনোহর অঙ্গাবরণ ধারণ করেছিল, দেশীয় বুদ্ধিজীবীরা তার সম্মোহে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন; খুব কম লোকই ঐ সম্মোহের জাল ছিন্ন করে সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার আসল স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অধিকাংশই এর গুণকীর্তনে, এর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহে, সোচ্চার হয়েছিলেন। অধ্যাপক টয়েনবি ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাবগত বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করে বলেছিলেন, কোন সমাজে যখন আধুনিক বুদ্ধিজীবীর আত্মপ্রকাশ ঘটে তখন বুঝতে হবে যে দুটি পরস্পর-বিরোধী সংস্কৃতি সংযোগ-বিয়োগের সম্পর্কে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, এবং একটি সাংস্কৃতিক আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এই আবর্তে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা হল ট্রান্সফরমারের ভূমিকা। একটি ট্রান্সফরমার যেভাবে ভিন্নশক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎবাহী যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ গ্রহণ করে, এই বুদ্ধিজীবীর দলও তেমনি সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষাসংস্কৃতির ভুবন থেকে ধ্যানধারণা আহরণ করে, এবং পুনরায়

তা দেশীয় সমাজের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অন্য এক ভুবনে সঞ্চারিত করে। এই অর্থে ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী হল মানবীয় ট্রান্সফরমার। আর,এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তাঁরা সাধারণভাবে শাসকগোষ্ঠীর বশংবদতা স্বীকার করে নেয়।

এঁদের উন্মেষকালীন বৈচিত্র্যময় পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের স্মরণে উপস্থিত রাখা আলোচ্য বিশ্লেষণের জন্যই অপরিহার্য। এর প্রথমটি হল নব-গঠিত শহর কলকাতার গুরুত্ব এবং বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায় মননে এর প্রভাব। ঐশ্বর্যশীল আন্তর্জাতিক মহানগরে পরিণত হওয়ার পথে কলকাতা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। ইংরেজী বলাকওয়ায় দক্ষ. ইংরেজের সাহচর্যে বিত্তবান, দেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠনে ইংরেজের সহায়ক, এবং ইংরেজী আইনকানুনে পারদর্শী দেশীয় পণ্ডিতরা কলকাতায় ভিড় জমাতে থাকেন। ইন্দ্রিয়-সংবেদ্য জীবন যাপনের উপকরণ এই শহরে যেমন ছিল অপর্যাপ্ত, তেমনি সেকালে কলকাতাই ছিল প্রগতিশীল ইউরোপীয় চিন্তার কেন্দ্রস্থল। এখানে বসবাস করেই বুদ্ধিজীবীর দল লণ্ডন অথবা প্যারীর নাগর জীবনের আস্বাদ লাভ করতে পেরেছেন। ফলে, তাঁরা সর্বদাই কলকাতার প্রতি অদ্ভুত এক আকর্ষণ ও ভালবাসা অনুভব করেছেন, যা তাঁদের চিন্তা আর মননকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছে। তাদের মানসিক পরিধির সীমাও কলকাতাই চিহ্নিত করেছে। এই নগর-ভিত্তিক মনন বর্তমান কালের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্ত্যের প্রেয়োবাদী জীবনদর্শন ও সভ্যতাকে ভারতীয় সভ্যতা ও জীবনদর্শন অপেক্ষা উন্নততর বলে গ্রহণ করায় আমাদের বুদ্ধিজীবীরা সব সময়েই এক দুঃসহ গ্রাম্যতা ও হীনম্মন্যতার বোধে সংকুচিত হয়েছেন। সেই গ্রাম্যতার বোধ থেকে মুক্তিলাভের জন্য তাঁরা নানাভাবেই সচেষ্ট ছিলেন। পোশাক-আশাক, খানাপিনা, রুচির অভিব্যক্তি, ইংরেজদের উচ্চারণমত নাম আর বংশগত উপাধি বিকৃত করা ইত্যাদি ধরনের আত্মাবমাননাকর কাজের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের ইউরোপীয়দের নিকট গ্রহণযোগ্য করার উদ্যম গ্রহণ করেছিলেন। ঐ কার্যক্রমের আরেকটা দিক ছিল, ইংরেজ কবিদের কাব্য-নাটক ইত্যাদি আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ রাখা, এবং ইংরেজী সাহিত্য থেকে পাওয়া ইংল্যাণ্ডের আঞ্চলিক ভূগোল নখদর্পণে রাখা,—যেন, চিন্তায় অনুভবে ইংল্যাণ্ডকে মাতৃভূমির আসনে বসিয়ে ইংরেজের সাযুজ্যলাভ করার চেষ্টা। বিগত শতাব্দীতে এর অতিশয়তা রবীন্দ্রনাথের ঘৃণার উদ্রেক করলেও, এর ধারা কিন্তু আজ পর্যন্তও বহমান। আজ

কয়েক বছর আগে জনৈক বাঙালী অধ্যাপকের একটি পুথির আলোচনায় ম্যালকম ম্যাগারিজ বিরক্ত হয়ে লিখেছিলেন, আজকাল খাঁটি ইংরেজ শুধু ভারতবর্ষেই দেখতে পাওয়া যায়। ঐ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাই সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য আজও দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

তৃতীয়ত, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতা বুদ্ধিজীবীদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যাকে সমাজতত্ত্ববিদগণ বলেন, ওদের মূলধন, বৈষয়িক প্রতিষ্ঠালাভের মূলধন। শিল্পক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করার মতো ব্যবহারিক জীবনে এই মূলধন খাটিয়ে এঁরা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন; রক্তে চেনা মাতৃভাষা ও মাতৃভাষা-আশ্রিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভুলতে চেয়েছিলেন। ফলে, দেশ ও দেশের জনসমষ্টির জীবন থেকে এঁরা বিচ্ছিন্ন হযে পড়েছিলেন। কিন্তু, এটা তাঁদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হযনি যে, বিচ্ছিন্নতা কোন অর্থেই সৃষ্টিশীল মনোভঙ্গি বা সম্পর্ক নয। যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে তাদের পক্ষে যেমন নয, তেমনি যে দেশ বা জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তাদের পক্ষেও নয়। এটা এমন এক মনোভঙ্গির জন্ম দেয় যা না ঘরের নয় ঘাটের। তুলনীয জওহরলাল নেহরুর স্বীকারোক্তি, "আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তোর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ, সর্বত্রই বেমানান, কোথাও আমার স্থিতি নেই। আমার জীবনদর্শনকে প্রাচ্য না বলে পাশ্চাত্ত্য বলাই অধিকতর সংগত, কিন্তু তথাপি নানাভাবে ভারতবর্ষ আমার অঙ্গ জড়িযে আছে, যেমন করে সে জড়িয়ে আছে তার আর সব সন্তানের অঙ্গ। ...পশ্চিমে আমি বিদেশী এবং বিচ্ছিন্ন। আমি তার সন্তান হতে পারি না। কিন্তু, আমার নিজ দেশেও সময় সময় নিজেকে পরদেশী বলে বোধ হয়।" এই উক্তি সাধারণভাবে গত শতাব্দীর বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে যেমন সত্য, তেমনি স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাঙলার বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী সম্পর্কেও সত্য।

ঐ মনোভঙ্গি যে রাজনৈতিক আচরণের জন্ম দেয়, তার পরিচয় গ্রহণ করাও প্রাসঙ্গিক; কারণ, তা আমাদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে। ইংরেজদের সাহচর্যে লাভবান রামমোহন রায় আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন, ইউরোপীয়রা আরও বেশি সংখ্যায় ভারতে এসে বসবাস করুক; সেজন্য সভাসমিতি এবং স্মারকলিপি পাঠানো ইত্যাদির আয়োজনও হয়েছিল, যদিও তাঁর কণ্ঠ থেকে স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান শোনা গিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে একটি স্মারকলিপিতে তিনি ইংল্যাণ্ড ও 'খ্রীষ্টান' 'ইংরেজীভাষী'

ভারতবর্ষের চিরস্থায়ী ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। 'খ্রীষ্টান' এবং 'ইংরেজীভাষা' শব্দ দুটির ব্যবহার এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। এই শব্দ দুটির ব্যবহারকে যদি শুধুমাত্র একটি কূটনৈতিক চাল হিসাবে গ্রহণ না করা হয়, এবং যদি একে তাঁর আন্তরিক বাসনা বলে গ্রহণ করা হয় তাহলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, রামমোহন ভেবেছিলেন পরাধীন এবং অনুন্নত ভারতবর্ষ একদিন শাসকগোষ্ঠীর ধর্ম ও ভাষা দুই-ই গ্রহণ করে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আত্মিক সত্যে মিলিত হবে! নানাভাবে স্বদেশের আশ্রয়ে স্থিত থাকলেও ভূদেব মুখোপাধ্যায় অন্য কোন জাতির অধীন না হয়ে ইংরেজদের অধীন হওয়াকে সৌভাগ্য বলে গণ্য করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন ভিকটোরিয়াকে মাতৃসম্বোধনে কৃতার্থ বোধ করেছেন। আর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮৭ সনের মতো বিলম্বিত লগ্নেও ইংল্যাণ্ডের মহারানীকে মানবপ্রকৃতির সমস্ত সদগুণের আধার বলে চিহ্নিত করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছেন।

পরাধীনতার অভিশাপ বঙ্কিমচন্দ্র তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি স্বয়ং সরকারী চাকুরি ত্যাগ করে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগদান করার কথা কখনও চিন্তা করেননি; বরং, আনন্দমঠে 'সাহেবরা চটেছে' বলে ঝাঁসির রানী সম্পর্কে একটি উপন্যাস রচনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত স্বদেশপ্রেমিকের কর্তব্য এইভাবে নির্ধারণ করেছিলেন. তাকে দেশের স্বার্থের জন্য 'সংগ্রাম' করতে হবে, আবার ব্রিটিশ শাসনের চিরস্থায়িত্বের জন্যও সচেষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু, এর মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড স্ব-বিরোধ থেকে যাচ্ছে তা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি।

অধ্যাত্মশক্তির জোরে বিশ্ববিজয়ের কার্যক্রম ঘোষণা করলেও বিবেকানন্দ কিন্তু তাঁর কাজকর্মে রচনায় চিন্তায় রাজনীতির সংস্পর্শ আবিষ্কার না করার জন্য বারবার সকলকে সচেতন করেছেন, বলেছেন, 'হোয়াট ননসেন্স'। রবীন্দ্রনাথ সমকালীন কংগ্রেসী রাজনীতির সংকীর্ণতা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আকুলিবিকুলি করেছেন সত্য, কিন্তু, তিনি ১৮৯০ সনে রচনা করেছিলেন 'মন্ত্রী-অভিষেক' নিবন্ধ, যার ইংরেজস্তুতি রবীন্দ্রনাথ নামের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। এমন কি, স্বদেশী সমাজ পরিকল্পনার সময়েও, যখন তিনি রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছেন, স্বদেশী সমাজপতিকে করদানের কথা বলেছেন, গ্রামীণ শাসনব্যবস্থা নিজেদের হাতে গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছেন, তখনও ইংরেজের সঙ্গে একটা 'ভদ্র সম্পর্ক' স্থাপনের কথা বলে নিজের রাজনৈতিক বোধ ও আদর্শকে খণ্ডিত করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন যে, ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতীয়রা ইতালীয় অথবা গ্রীকদের মতো তুচ্ছ প্রাণী নয়, কারণ তারা ব্রিটিশ প্রজা। তাঁর মতে, স্বাধীনতার জননী ইংল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা ভারত কি কখনও কল্পনাও করতে পারে? সুতরাং, সেকালের বিচ্ছিন্নতাবাদী চরমপন্থী নায়ক বিপিনচন্দ্র পালের বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ নিয়ে তিনি ১৯০৭ সনে লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশপ্রেম লজ্জা পায়নি। আবার ইতিহাসের কী কৌতুক, সেই বিচ্ছিন্নতাকামী বিপিনচন্দ্রই স্বদেশী যুগের অবসানে, ১৯১১ সনে, ইংল্যাণ্ডে একটি ভাষণে বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করেন, স্বয়ং ঈশ্বরও যদি ডান হাতে পূর্ণ স্বাধীনতা আর বাঁ হাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন মর্যাদাশীল উপনিবেশের বর নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হন, তাহলেও তিনি বাঁ হাতের বরটিই চাইবেন, ডান হাতের পূর্ণ স্বাধীনতা নয়।

সেই আমলের অরবিন্দ ঘোষের কথাও স্মরণ করা যায়। তিনি তাঁর 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় ঘোষণা করেছিলেন, রাজনৈতিক দিক থেকে মৃত জাতি নিছক একটি অপদার্থ; যারা নিজেদের দেহের ভার অন্যের হাতে তুলে দেয়, তারা নিজেদের আত্মার দখলও বেশিদিন বজায় রাখতে পারে না। বিদেশীদের হাতে দেহটা তুলে দিয়ে আমরা আত্মিক উন্নতি সাধন করব—এই ধারণার মতো বিভ্রান্তিকর আর কিছুই হতে পারে না। অথচ, তিনিও ভারতবর্ষের দেহটাকে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের হাতে রেখে দিয়ে অধ্যাত্মসাধনার জন্য রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, অনুশীলন বা যুগান্তরের মতো বিপ্লবী সংস্থার কিছু কিছু সদস্যও কোন একটি স্তরে পৌঁছে অকস্মাৎ হয় সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন অথবা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বশংবদতা স্বীকার করে বিপ্লবের পথ বর্জন করেছেন।

অবশ্য, এসব কথার পুনরাবৃত্তি করার অর্থ এ নয় যে সমাজরূপান্তরের জন্য বুদ্ধিজীবীদের যে স্বীকৃত ভূমিকা—অর্থাৎ অগ্নিবর্ষণের ভূমিকা—তা তাঁরা কোনভাবেই পালন করেননি। নিশ্চয় করেছেন; সকলে সংঘবদ্ধ বা সমভাবে না হলেও কেউ কেউ এককভাবে, কেউ কেউ কিছুটা বা সংঘবদ্ধ ভাবেও, সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে দু-চারটে নাম আপনা থেকেই মনে আসে। যেমন, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'নীলদর্পণের' দীনবন্ধু মিত্র, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ, যাঁরা উপনিবেশিক শোষণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে

ব্রতী হয়েছিলেন। স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, আত্মপরিচয় হারানো এবং জাতীয় অবমাননার জন্য মধুসূদনের যে ক্রন্দন, অথবা বঙ্কিমচন্দ্র যখন চোখের জলের মধ্য দিয়ে তাঁর সন্তানদের যুদ্ধবিজয়ের সফলতাকে বিসর্জন দেন, তখনও, পরোক্ষভাবে, তাতে সামাজিক জমি প্রস্তুত করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঐ মর্মপীড়া এবং এই অশ্রু—এর মধ্যেও ছিল ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সীমা লঙ্ঘন করার ইঙ্গিত। এটা স্বীকার করার পরেও ইতিপূর্বে আমাদের বুদ্ধিমার্গীয় উত্তরাধিকার সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতা-পূর্ব কর্মকাণ্ড ও বুদ্ধিমার্গীয় চিন্তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া। যে দ্বিধা আর স্ববিরোধ ছিল বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ চারিত্রবৈশিষ্ট্য, তার স্পর্শ থেকে প্রগতিশীল চিন্তাবিদরাও সব সময় আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হননি। বাংলার রেনেসাঁ নামক পদার্থটি কেন কলকাতা নগরের চৌহদ্দি পার হতে পারেনি বা কেন তা শুধুই নগরকেন্দ্রিক, তার সূত্র এর মধ্যে পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আর, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে যেসব বুদ্ধিজীবী উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা এত দীর্ঘ দিনের চেষ্টা সত্ত্বেও কেন জনগণের জীবনের কাছাকাছি পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়েছেন, তার কারণও বোধ করি এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

ব্যাপক গণ-সংযোগ আর গণ-সমর্থনের অভাব যেমন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অথবা বামপন্থী রাজনৈতিক সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ বা ব্যর্থ করেছে তেমনি, অপর দিকে, ঐ সংগ্রাম যখন বিপুল গর্জনে ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছে, তখন ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তার গতি রোধ করার সংকীর্ণ তাগিদও নেতৃত্বের গদিতে আসীন বুদ্ধিজীবীদের তরফ থেকেই এসেছে। খুব প্রাসঙ্গিক না হলেও এই মনোভঙ্গি বোঝার সুবিধার জন্য পুনরায় জওহরলাল নেহরুর কথাই স্মরণ করা যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে-পরেই এবং ভারতের স্বাধীনতালাভের পূর্বাহ্নে সমগ্র দেশে সংগ্রামী চেতনা খুব প্রখর হয়ে উঠছিল। এখানে সেখানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেও উঠেছিল। পাছে সেই আগুনে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যায়, পাছে গণ-নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে, তাই সেদিনকার জওহরলাল নেহরু দেশবিভাগের শর্তে স্বাধীনতা মেনে নেওয়ার জন্য গান্ধীজীর নিকট পীড়াপীড়ি করেছিলেন। এইরূপ মনোভঙ্গির প্রকাশ অথবা অস্তিত্ব বাংলায় ছিল না, একথা বোধ করি জোর দিয়ে বলা যাবে না। আসল কথা, কোন দেশের বুদ্ধিজীবীরাই জনগণকে বিশ্বাস করেন না বা শ্রদ্ধা করেন না।

সেজন্য, রাজনৈতিক প্রয়োজনেও জনগণের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ স্থাপনের প্রশ্নটি তাঁদের নিকট বিশেষ গুরুত্ব পায় না ; বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বাধীনতা-পূর্ব কালে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলন কতটা গণ-মুখী ছিল, সে বিষয়ে অনায়াসেই প্রশ্নটা উত্থাপন করা যেতে পারে। এমন কি, স্বাধীনতা-উত্তর কালে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব জনসমুদ্রে পৌঁছুতে পেরেছে কিনা, তাও প্রশ্নের অতীত নয়।

॥ ২ ॥

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অবসান এবং স্বাধীনতালাভের মধ্য দিয়ে পূর্ব-বিশ্লেষিত মনোভঙ্গিসম্পন্ন নেতৃবৃন্দই ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ; এবং, সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় তাঁরা যে ঐতিহ্য স্থাপন করে গিয়েছেন, বর্তমান কালের ভারতবর্ষের জীবনের কাঠামোয় তা-ই প্রবাহিত রয়েছে। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিদায় গ্রহণের ফলে আমাদের আর্থনৈতিক-রাষ্ট্রিক কাঠামোর ঔপনিবেশিক চরিত্র বদলায় ; তেমনি, বলা যেতে পারে, অন্তত বাহ্যত বুদ্ধিজীবীদের ঔপনিবেশিক চরিত্রও রূপান্তরিত হয়েছে। কেন না, বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বশংবদতা অথবা তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিন গত হয়েছে। অপর পক্ষে, বিবিধ পেশায় আশ্রিত, নানাপ্রকার বিশেষজ্ঞের বিদ্যায় পারদর্শী, অথবা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্যের অধিকারী বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হন ; এবং কার্যত তাঁরা ক্ষমতার আসনে ও এসব কেন্দ্রবিন্দুগুলোতে বিপুল সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হন।

স্বাধীনতা পূর্ব যুগে নানাপ্রকার আদর্শগত পার্থক্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের একটা সাধারণ ঐক্যমত ছিল। স্বাধীনতা ঐক্যের বদলে আদর্শগত পার্থক্যটাকে প্রকট করে। প্রত্যেক রূপান্তরশীল অথবা সুসংহত সমাজব্যবস্থায় দেখা যায়, বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ রাষ্ট্র ও সমাজ-কাঠামোর সঙ্গে আত্মিক সংযোগের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, এবং অবশিষ্ট অংশ এর সঙ্গে বিযোগের সম্পর্কে সম্পর্কিত থেকে যায়। সংযোগ এবং বিয়োগ—উভয় সম্পর্কেরই নানাবিধ ব্যক্তিগত অথবা আদর্শগত কারণ থাকা সম্ভব। কারণ যা-ই থাকুক না কেন, একথা ধ্রুব সত্য যে, ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী এবং ক্ষমতার আসন থেকে দূরাবস্থিত বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা এক নয়, এক হতেও পারে না। ক্ষমতার যে আসনকে একসময় সে সমালোচনায়, আক্রমণে ও সংগ্রামশীল ভাবাদর্শের প্রচার দ্বারা

জর্জরিত করেছিল, সেই আসনেই আজ সে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, তার ভূমিকার গুণগত রূপান্তর সাধিত হয়েছে বলে গণ্য করা যায়।

অবশ্য স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে যেসব বুদ্ধিজীবী সংযুক্ত ও সংহত হয়েছিল, প্রাথমিক স্তরে তাদের মানসভঙ্গিতে আত্মপ্রতারণা বা অসংগতির কোন লক্ষণ ছিল না। কেননা, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সর্ব স্তরেই বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। সংগ্রামের যুগে দেশগঠনের যেসব স্বপ্ন তাদের মন উদ্ভাসিত করত, দেশের মানুষকে তারা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় আশান্বিত করত, সংগ্রামের শেষে বিজয়ের দিনে সেগুলো বাস্তবে রূপান্তরিত করার আগ্রহ এবং সংকল্প স্বাভাবিক। প্রাথমিক উৎসাহ-উদ্দীপনার কালে সেখানে আদর্শগত বিকৃতির প্রশ্নও সম্ভবত তোলা যায় না। কিন্তু, রাষ্ট্রকাঠামোয় আশ্রিত যারা, তারা বেশিদিন মনের ঐ সজীবতা এবং আদর্শের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পারে না। শোষণ-অত্যাচারের যন্ত্রগুলো নির্মূল করার বদলে ধীরে ধীরে এদের নিকটই তারা আত্মসমর্পণ করে বসে। প্রত্যেক যুগের আদর্শগত বিবর্তন ও সংঘাতের এটা একটা সাধারণ স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টিশীল প্রবাহ অথবা আন্দোলন নিজস্ব আন্তর প্রেরণার তাগিদে একটা সীমায় পৌঁছে তার শক্তি ও প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। সে অবস্থায় তার লক্ষ্য হয়, শুধু আঁকড়ে ধরার, বেঁচে থাকার, সংরক্ষণের। সেই তাগিদ থেকেই বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠে কিছু নতুন কথা সংযোজিত হয়, অথবা ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে কৌশলগত পরিবর্তন কিছু ঘটে, যা সৃষ্টিশীলতা বা দক্ষতার অভাব ঢাকার সহায়তা করে। দেখা যায়, যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে তারা নিজেরাই একদা অযৌক্তিক, অ-গণতান্ত্রিক বলে নিন্দা করে এসেছে, তাকেই, নতুন পরিবর্তিত পরিবেশে, গণতন্ত্রের সার্থকতম প্রকাশ বলে ঘোষণা করা হয়। ভারতবর্ষকে বলা হয়, পৃথিবীর 'বৃহত্তম' গণতন্ত্র। এই বৃহত্তম শব্দটির একটা আবেগময় আবেদন আছে, যার ব্যবহার দ্বারা শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীরা জনসাধারণের হৃদয় হরণ করার চেষ্টা করে এসেছেন। তা ছাড়া, জনসাধারণের মনে ভয়ের সঞ্চারও করা হয়; যেমন বলা হয়ে থাকে, এ ব্যবস্থা ছাড়া সাম্যবাদী রাষ্ট্রকাঠামোয় ব্যক্তির নিজস্ব মত প্রকাশের কোন স্বাধীনতাই নেই। আর, এ কথাটা প্রচার করার জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীদের নিয়োগ করা হয়। এমনিভাবে অগ্রসর হতে হতে একদিন দেখা যায়, যে আদর্শবাদ একদা তাঁদের কণ্ঠস্বরকে উদ্দীপ্ত করেছিল তা

আর নেই, পরিবর্তে আত্মপ্রকাশ করেছে এক অদ্ভুত দম্ভ। এই দম্ভ 'আমিই আমার রাষ্ট্র' এই রাজকীয় মনোভঙ্গি থেকে খুব দূরবর্তী নয়। জাতীয় স্তরে জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে কন্যা পর্যন্ত এবং পশ্চিম বাংলার পরিধিতে বিধানচন্দ্র রায় থেকে সিদ্ধার্থশংকর রায় পর্যন্ত নেতৃবৃন্দের চালচলন বলাকওয়া কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। বামমার্গীয় কোন কোন মন্ত্রীর—যাঁরা বুদ্ধিজীবী রূপে খ্যাতিতে স্থিত ছিলেন—আচরণও ঐ উক্তির ইঙ্গিত বহন করবে।

সুতরাং সংগ্রামশীল ভাবাদর্শের প্রবক্তা, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করার আগ্রহে ব্যাকুল সামাজিক আর্থনীতিক কাঠামোর আমূল রূপান্তরের জন্য বদ্ধপরিকর যে বুদ্ধিজীবীকে একদা নায়কের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল, সে এবং 'আমিই আমার রাষ্ট্র' ঘোষণাকারী বুদ্ধিজীবী এক ব্যক্তি নয়। কারণ, সামাজিক অভিজ্ঞতায় এটা তো স্বতঃসিদ্ধ রূপে প্রমাণিত যে, কেউ যদি ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করে তাহলে ক্ষমতাও তার স্বাদ গ্রহণ করে। স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা উত্তর যুগের জওহরলাল নেহরুর পরস্পরবিরোধী উক্তির তুলনামূলক বিচার করলেই এই উক্তি পরিষ্কার হবে। সেজন্যই, এই পর্বের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, আপাতদৃষ্টিতে বিচক্ষণ কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হলেও যে প্রশাসনব্যবস্থা বিবেক অথবা মননশীলতা অথবা আদর্শবাদ ভুলে যায়, তা খুব তাড়াতাড়িই সংবেদনশীলতা হারায়, এবং পরিণামে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করে।

ফলে, নিরন্তর জিজ্ঞাসা এবং গণজীবনকে উপলব্ধি করার আগ্রহ, সামাজিক প্রবাহকে বিচারবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিগত করার প্রয়োজনীয়তা, এবং মানবিক কল্যাণের আদর্শ অনুসরণ করার সংকল্প থেকে যে কর্মোদ্যম জন্ম নেয়, মনের এবং সমাজের জমি কর্ষণ করার যে ঐকান্তিক চেষ্টা আত্মপ্রকাশ করে, রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে আশ্রিত অথবা এর সঙ্গে সংযুক্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সেই সংগ্রামী কর্মোদ্যম আশা করা যায় না। এটা সেই সব ব্যক্তিদের নিকটেই কাম্য আর প্রাপ্য, যাঁরা রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে বিযোগের সম্পর্কে সম্পর্কিত; অর্থাৎ, যাঁরা ক্ষমতার বিন্দুগুলো থেকে দূরবর্তী, যাঁরা ক্ষমতার বিন্দুকে স্পর্শ করেন নি, যাঁদের আদর্শবাদ মৃত্যু বরণ করে নি।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরমুহূর্তেই কিভাবে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার পরিবর্তন হতে থাকে, তার কিছুটা প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণ করা যাক। ভারতবর্ষের

সামাজিক ও আর্থনীতিক কাঠামোকে রূপান্তরিত করা, এর আধুনিকীকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদকে পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহার করে শিল্প ও কৃষির উন্নয়ন এবং সে পথে সমাজবিপ্লবের সংগঠন, ইত্যাদি কথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের দিন থেকেই বলা হচ্ছিল। ১৯৪৭ সনের ১৫ই অগস্টের পর তদনুযায়ী কিছু কিছু কার্যক্রম গৃহীতও হতে থাকে, নতুন নতুন শিল্পনগরী, ইস্পাতনগরী, সেচ বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রকল্প, গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের নানাবিধব্যবস্থা, অসংখ্য জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারিক প্রসার ঘটে, তথাকথিত কল্যাণরাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড রচনায় ও রূপায়ণে অর্থনীতি-বিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের নিয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর, দীর্ঘকালের অবহেলিত বুদ্ধিজীবীরা এই বিপুলসংখ্যক পদসৃষ্টির মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করেন। তা ছাড়া, সাহিত্য ললিতকলা সঙ্গীত-নাটক নৃত্য আকাদেমী প্রতিষ্ঠা, জাতীয় অধ্যাপকপদ সৃষ্টি সাহিত্যের ও শিল্পকর্মের জন্য আর্থিক পুরস্কার, নানাপ্রকার উপাধি বিতরণ, এজাতীয় নানাবিধ উপায়ে বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতি আকৃষ্ট করা হতে থাকে। প্রতিভার স্বীকৃতি ও সম্মানদান সম্ভবত শাসকগোষ্ঠীর চিন্তায় উপস্থিত ছিল; কিন্তু অন্য যে কথাটি অনুচ্চারিতভাবে উপস্থিত ছিল তা হল এঁরা জনসাধারণের নিকট এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কল্যাণধর্মিতার কথা প্রচার করুন, এবং এর স্থায়িত্বে সহায়ক হোন। আর, বিচিত্রচরিত্র বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এমন লোকের তো সংখ্যা কম নয় যাঁদের নিকট আদর্শের চাইতে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার ভাবনা অনেক বড়। সুতরাং নতুন কর্ণধারদের সেবায় কে আগে প্রাণদান করবে, তার জন্য এঁদের মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। সেই সময় এক কালের প্রগতিশীল ব'লে পরিচিত অনেক যশস্বী ব্যক্তিকেও কোন কোন নিন্দিতচরিত্র কংগ্রেস নেতার কৃপা লাভের জন্য ধর্ণা দিতে দেখা গেছে। অনেকে ভিক্ষা লাভ করেছেনও, এবং বৈষয়িক সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করেছেন।

আরও কিছুকাল বাদে, অর্থাৎ বিগত দশকে, আজীবন পেন্সন দেবার প্রলোভনে রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে এককালের বিপ্লবীদের সংযুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অনেকের পক্ষেই ঐ প্রলোভন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি; অনেকে এতে পেয়েছেন অতীত সংগ্রামের স্বীকৃতি, কেউ পেয়েছেন নিরাপত্তার আশ্বাস আর অর্থচিন্তা থেকে মুক্তি। কিন্তু, এই আত্মসমর্পণের পথে বুদ্ধিজীবী সত্তা যে মৃত্যুবরণ করল, সে প্রশ্ন কেউ বিচার করে দেখল না।

শুধু যে সরকারী কাঠামোর আকর্ষণই তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত ছিল তা নয়; বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং সংবাদ ও সাহিত্যের কারবারী যারা ঐ কাঠামোকে লালন ও ধারণ করছে, বুদ্ধিজীবীদের জন্য তাদের পুরস্কার ও প্রলোভনের মাত্রাও কিছু কম ছিল না, এখনও কম নেই। কলকাতার একটি অদ্বিতীয় সংবাদপত্রগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে যে বুদ্ধিজীবী-চক্র গড়ে উঠেছে, তার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে কবি-ঐতিহাসিক নিবন্ধকার যাঁরা জমায়েত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেক আছেন যাঁরা একদা সাম্যবাদী বলে পরিচিত ছিলেন। ঐ গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে ১৯৬২ সনে চীন-ভারত যুদ্ধের পটভূমিতে 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সংস্থা হঠাৎ খুব কলরব সৃষ্টি করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল অতি পরিষ্কার—সাম্যবাদ নামক বস্তুটিকে প্রতিরোধ করা, যার অন্য অর্থ হল বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে উজ্জীবিত ও সুসংহত রাখা। তখন সাম্যবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে পরিচিত অনেক লেখককেই ব্যক্তিগত সুখসমৃদ্ধির স্বার্থে, এইরূপ স্বীকারোক্তি করতে দেখা গেছে যে, আসলে কোনদিনই তাঁরা সাম্যবাদী ছিলেন না; বস্তুত, 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতিই তাঁদের আন্তরিক আনুগত্য। ঐ সংস্থাটির অপমৃত্যু ঘটলেও, সেই মনোভঙ্গি যে আলোচ্য ও সমগোত্রীয় অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল এবং বর্তমানেও আছে, তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। এ থেকে এই তত্ত্ব প্রমাণিত হয় কাঞ্চনসংস্পর্শে মানুষ কীভাবে আপন সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং আদর্শগত ভিত্তির পচন শুরু হয়। শেক্সপীয়রের একটি উক্তি অনুসরণ করে বলা যায়, পদ্মফুল পচতে আরম্ভ করলে যেমন আগাছা থেকেও বেশি দুর্গন্ধ ছড়ায়, তেমনি প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী পচতে থাকলে কায়েমী স্বার্থবাদীদের থেকেও বেশি দুর্গন্ধ ছড়ায়। জরুরী অবস্থার সময় এর বিপুল বিস্তার লক্ষ্য করা গেছে। দেখা গেছে, কিভাবে ভয়ে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী আত্মবিক্রয়ের পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন।

এখানে একটা প্রশ্ন সংগতভাবেই উত্থাপন করা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিকট বিশেষজ্ঞের বিদ্যাবুদ্ধি বিক্রয় করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে, ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিস্থিতি সম্মত ন্যায় ও সত্যের পথ অনুসরণ করে না, তাদের বুদ্ধিজীবী বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় কি? প্রয়াত মার্কিন অধ্যাপক পল এ. বারান এদের বলেছিলেন, 'মেধা-শ্রমিক'; এই সংজ্ঞা খুবই যুক্তিসংগত, এবং সেজন্যই আলোচ্য বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে তা অনায়াসেই প্রয়োগ করা চলে।

এঁদের মনোভঙ্গি অনেকটা এইপ্রকার : সমাজের আর্থনীতিক, রাজনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক নীতি নির্ধারণ বা লক্ষ্য নিরূপণে তাঁদের কোনই দায়দায়িত্ব নেই, রাষ্ট্রকাঠামোর অন্য এক স্তরে তা স্থিরীকৃত ও পরিকল্পিত হয়; কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে তাদের দায়িত্ব ঐসব কার্যক্রম রূপায়ণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা, রাষ্ট্রবিধায়কদের নিকট আনুগত্য জ্ঞাপন করা। এই দৃষ্টিকোণের মধ্যে যুক্তি নেই, এ কথা বলা যায় না নিশ্চয়ই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভোলা চলে না যে, এই দৃষ্টিমার্গ দ্বারা এ কাজ নিয়ন্ত্রণ করলে বুদ্ধিকে নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রশ্ন এই, বুদ্ধিজীবী রূপে যে চিহ্নিত বা চিহ্নিত হতে ইচ্ছুক, সে কি আপন বিবেককে নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখতে পারে? রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিগণ নৈতিক নিরপেক্ষতা অথবা ক্লীবত্ব লালন ক'রে এবং মানবিক শ্রেয়সের চিন্তা থেকে মনকে বিযুক্ত ক'রে এইভাবেই স্থিতাবস্থাকে রক্ষা করছে, এবং কায়েমী স্বার্থের আধিপত্যের ভিতগুলোকে আরও বেশি শক্তিশালী করার কাজে সহায়তা করছে। অথচ, বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে ঠিক উল্টো জিনিসটাই পাওয়ার কথা, তাদের কর্ম-চিন্তা-আদর্শের মাধ্যমেই সমাজের বিবেক সৃষ্ট ও অভিব্যক্ত হয় এবং উন্নততর রাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্বপ্ন উদ্‌ভাসিত হয়।

বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার বিধায়ক এবং স্থিতাবস্থার রক্ষক মেধা-শ্রমিক তথা বুদ্ধিজীবীর দল সম্মিলিতভাবে বিগত ত্রিশ বছরে, অর্থাৎ, জাতীয় পর্যায়ে কংগ্রেস সরকারের পতনের কাল পর্যন্ত, যে কয়েকটি ক্ষেত্রে আশ্চর্য সফলতা অর্জন করেছেন, তা বোধ চিহ্নিত করা চলে। প্রথমত, ধনবাদী সভ্যতার যে আন্তর প্রেরণা—অর্থাৎ, টাকা কামাও, নতুবা নোংরা খেয়ে মরো—তা সমগ্র সমাজ-কাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে। এই মনোভঙ্গি এমন মারাত্মকভাবে বিস্তৃত হয়েছে যে, ন্যায়নীতি আর সততার প্রশ্ন বিসর্জন দিয়ে মানুষ একমাত্র অর্থ উপার্জনকেই জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে শিখেছে। সম্মুখে অনাহার, উপবাস, মৃত্যু,—এই ভয়কে সব সময় চোখের সামনে তুলে ধরে শাসকগোষ্ঠী সমস্ত নীতিবোধকে হত্যা করতে পেরেছে। এই কাজে আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন কিন্তু স্থিতাবস্থার সমর্থক লেখক ও বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রীয় বিধায়কদের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সহযোগিতা করছেন। ঐ শ্রেণীর লেখকদের সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণে দেখা যায়, মানুষকে তাঁরা অর্থচিন্তা বা যৌনক্ষুধায় উদ্‌ভ্রান্ত সত্তারূপেই চিন্তা করতে অভ্যস্ত; মহত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, মানবিকতা, কল্যাণবোধ ইত্যাদি যেন চিরকালের জন্য মুছে গেছে। ধনবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর

আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলো মানুষকে খাটো করেছে বাইরের দিক থেকে; আর ভাবানুভূতির দিক থেকে মানুষকে বরাবর খাটো করে রাখতে চাইছেন আপন সত্তা থেকে বিচ্যুত ঐসব লেখক। আর এরই প্রায় সমান্তরালভাবে দেখা যায়, দেশীয় ভাষায় সর্বাধিক বিক্রীত এবং নির্ভয়ে বলা যায় সর্বাধিক বিকৃত সংবাদপত্রগোষ্ঠীগুলোর মেধা-শ্রমিক সাংবাদিকগণ যেন মানুষকে সবসময় একটা উত্তেজনা একটা শিহরন, একটা বিকারের মধ্যে মাতিয়ে তাতিয়ে রাখতে চাইছেন। সুস্থ, প্রসন্ন, সৃষ্টিশীল, বা সংগ্রামী ভাবনা তার মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। আর সে কারণেই অনিশ্চয় নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে নানা প্রকার বিলাতী ও মার্কিনী কেচ্ছা পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এইসব সংবাদপত্রে যেসব 'ফীচার' নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাতেও প্রবাহিত জীবনের টাটকা প্রতিচ্ছবি কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না, কিছু কিছু স্মৃতি-রোমন্থন কিছু ব্যক্তিক সুখানুভূতি, দু-একটি অস্পষ্ট মুখ, একটা উদ্দেশ্যহীন অস্তিত্বের স্বাদ ইত্যাদি হল ঐসব রচনার বিষয়বস্তু।

দ্বিতীয়ত, মানুষের মন থেকে বিকল্পের চেতনাকে অপসারিত করার চেষ্টা হয়েছে। রাষ্ট্রকাঠামোর আমূল রূপান্তর যে সম্ভব, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী আর্থনীতিক ও সামাজিক সম্পর্ক যে নতুন করে সৃষ্টি করা সম্ভব, এমনকি এই 'গণতান্ত্রিক' কাঠামোর মধ্যেও যে সম্ভাবনাময়তা রয়েছে, তার দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালানো হয়েছে। আর এরই অঙ্গ হিসেবে মানুষের কণ্ঠ থেকে প্রতিবাদের ভাষাটি হরণ করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর আশ্রয় ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় নেই, তাদের উচ্ছিষ্ট ছাড়া অন্য কোন খাদ্য নেই, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছাড়া এই অরণ্যে অন্য কোন পথ নেই,— এমনি ধরনের একটা ভীতিবিহ্বল পরিবেশ সৃষ্টি করে মানুষকে হতাশা, অকর্মণ্যতা আর অবসাদের মধ্যে নিক্ষেপ করার এক ষড়যন্ত্র চলেছিল। জরুরী অবস্থাকালীন ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করলেই এই উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করা যাবে। জীবনের এই দেউলিয়া রূপ বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা, বলা যায়, শাসকগোষ্ঠীর অপূর্ব রূপকর্ম।

এই রূপকর্মে মেধাশ্রমিকে পরিণত বুদ্ধিজীবীর দল যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। দু-একটি ঘটনা ও পরিস্থিতির উল্লেখ করা যাক। জরুরী অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় রাজভবনে ভাবের আদানপ্রদানের জন্য এক বুদ্ধিজীবী-সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। শোনা যায়, বিভিন্ন পেশায় আশ্রিত বহু লোক তাঁর জয়যাত্রায়

শুভেচ্ছা জানানোর জন্য সেখানে সমবেত হয়েছিল। অন্য দিকে, উত্তর কলকাতার 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে উৎপল দত্তর একটি নাটকের অভিনয়কে কেন্দ্র করে শাসকগোষ্ঠীর ঝটিকাবাহিনী এক বীভৎস তাণ্ডবের সৃষ্টি করে, অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়, যশস্বী শিল্পীরা অপমানিত লাঞ্ছিত আহত হন। আর, ছোট ছোট নাট্যসংস্থা যাঁরা পথের ধারে স্বল্পক্ষণের নাটক অভিনয় করে জনসাধারণকে আনন্দদান করত এবং জীবনের সমস্যাদি সম্পর্কে অবহিত রাখত, তাদের উপরও যখন-তখন পুলিশী আক্রমণ চালিয়ে মুখের ভাষা হরণ করা হত। এমনি এক আক্রমণের কালে কার্জন পার্কে প্রবীর দত্ত নামক একটি যুবককে হত্যা করা হয়। অথচ আশ্চর্য এই, যাঁরা রাজভবনে ইন্দিরার প্রীতিলাভের জন্য সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা কিন্তু কখনও এই দুটি ঘটনার কোনটারই নিন্দা করেননি। বরং, আকাশবাণীর তৎকালীন সমীক্ষাগুলো থেকে একথাই বার বার শোনা গেছে যে, বর্তমানে নাট্যসংস্থাগুলো ব্রিটিশ আমলের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করছে, সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি শিথিল, শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কথা অবান্তর, ইত্যাদি কিন্তু তাণ্ডবের কোন নিন্দা নেই।

প্রসঙ্গত, আকাশবাণী থেকে প্রচারিত আর্থনীতিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের কিছু সমীক্ষার উল্লেখ করা যাক। বিষয়টি মুদ্রাস্ফীতি, অতএব ব্যাপারটা কঠিন। সমীক্ষাগুলো থেকে যা জানা গিয়েছিল তা হল, মুদ্রাস্ফীতি দুনিয়াজোড়া এক সমস্যা, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে অপরিহার্য; তাই সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এর মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ধর্মঘট ইত্যাদিতে উৎপাদন বন্ধ না হয় ইত্যাদি। অর্থনীতি-সংক্রান্ত মূল সমস্যা এড়িয়ে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নৈতিক উপদেশ দেওয়ার জন্য কোন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। তথাপি, বিশেষজ্ঞরা যখন এই ধরনের উপদেশ দেন, তখন বুঝতেই হয় যে তাঁদের মন মুদ্রাস্ফীতিতে নেই, সেটা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুগুলোর আনাচে কানাচে ঘুরঘুর করছে এবং আশ্রয় ভিক্ষা করছে। এমনিভাবে বিবেক ও বুদ্ধি থেকে আপন সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে একদল বুদ্ধিজীবী নিজেদের ক্লীব করে দিয়েছেন। লক্ষ্য হল উচ্চপদ ও আর্থিক সমৃদ্ধি। এঁদের সম্পর্কে সপ্তদশ শতকের ফরাসী পাদ্রী বসওয়ার এই সুন্দর উক্তিটি প্রয়োগ করা যায়: "আমি তাকে সৃষ্টি করেছিলাম সে দেহেও আত্মাময় হবে আশায়; আর এখন সে এমন কি আত্মায়ও কামময় হয়ে উঠেছে।" [I created him to be spiritual

in his flesh ; and now he has become carnal even in spirit.]

এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে ১৯৭২ সনে সুপ্রীম কোর্টের জনৈক বিচারপতি স্বধর্ম থেকে বিচ্যুতির এবং ট্রিজন'-এর অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি এঁদের রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করেননি, করেছেন জনগণের প্রতি প্রতারণার অভিযোগ। বলেছিলেন, অন্তর্দৃষ্টি ও সংহত ব্যক্তিত্বের গুণে যেসব মূল্যবোধকে বুদ্ধিজীবী সমাজ পবিত্র বলে মনে করে, সেগুলো সম্পর্কে সোচ্চার না হয়ে এঁরা কর্তব্যভ্রষ্ট হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় জীবনে যে ক্লেদ, গ্লানি ও মিথ্যাচারের অস্তিত্ব রয়েছে এবং যা প্রতিদিন প্রকটতর হচ্ছে, এবং যে সামাজিক-আর্থনীতিক অন্যায় ও শোষণকে মিষ্ট কথায় লালন করা হচ্ছে, সে বিষয়ে এঁদের কণ্ঠ নীরব। অথবা, আত্মসমৃদ্ধির চিন্তায় এঁরা এতই মশগুল যে ঐ অন্যায় ও শোষণ এঁদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আসে না। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির সাহায্যে এই মানসভঙ্গির সার্থক পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। তিনি 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "বিশ্বপ্রকৃতি যখন মৌমাছিকে মৌচাকের সংকীর্ণ জীবনযাত্রায় ডাক দিলেন তখন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি সেই আহ্বানে কর্মের সুবিধার জন্য নিজেকে ক্লীব করে দিলে; আপনাকে খর্ব করার দ্বারা এই যে তাদের আত্মত্যাগ এতে তারা মুক্তির উল্টো পথে গেল।" স্থিতাবস্থার সমর্থক বুদ্ধিজীবীরাও স্ব-ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে মুক্তির উল্টো পথেই গেলেন, প্রচলিত সামাজিক কাঠামো অক্ষত রাখার জন্য নিজেদের খর্ব এবং ক্লীব করে দিলেন।

অবশ্য, শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন স্ব-বিরোধ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি মেধা-শ্রমিকদেরও কোন কোন পরিস্থিতিতে খর্বতার গণ্ডী অতিক্রম করতে দেখা গেছে। যেমন, জরুরী অবস্থার কালে; তখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোয় আস্থাশীল কোন কোন বুদ্ধিজীবীকে স্বাধীনতার সপক্ষে এবং মৌলিক অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হতে এবং পরিণামে নির্যাতিত হতে দেখা গেছে। কিন্তু, এটা তথাপি স্বীকার্য, ঐ নির্যাতন তাঁদের মধ্যে কোনরূপ গুণগত রূপান্তর নিয়ে আসেনি। নির্দিষ্ট শিবিরে তাঁদের স্থান নির্ধারিতই আছে।

॥ ৩ ॥

প্রকৃত পক্ষে, রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে দূরবর্তী অর্থাৎ আদর্শে ও মনোভঙ্গিতে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়েই সৃষ্টিশীল ঐতিহ্য ও ভূমিকা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত থাকে। আমাদের আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে এই ভূমিকা কিভাবে পালিত হয়েছে বা আদৌ পালিত হয়েছে কিনা, এবং এর সফলতা বা ব্যর্থতার লক্ষণগুলো কী, তাই এবার বিচার করা যাক।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা সর্বপ্রথম স্মরণে রাখা প্রয়োজন। সেটা হল সাধারণভাবে বামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তা, আদর্শ ও কর্মনীতির শোচনীয় বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি। আরও খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে একে রাজনৈতিক চিন্তা ও আদর্শের অবক্ষয় বলেও চিহ্নিত করা যায়। যেসব রাজনৈতিক দল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী, তাদের দলীয় কর্মকাণ্ড এবং গৃহীত নীতি বিশ্লেষণ করলে এ কথাটাই মনে স্থিত হতে চায় যে, বিপ্লব শব্দটি ইদানীং একটা বায়বীয় বস্তুতে পরিণত হচ্ছে, মুখের ভাষায় এর স্বীকৃতি লক্ষ করা গেলেও কাজের ভাষায় এর স্বীকৃতি একান্তই অনুপস্থিত। কারণ, যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামো উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তত্ত্বগত অঙ্গীকারে তাঁরা দীক্ষিত, সেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রদত্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও অধিকার ভোগের প্রতি তাঁরা অধিকতর তৎপর। এমন কি, যে-সব লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে তাতে মনে হয়, বুর্জোয়া দলগুলোর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগিতেও তাঁদের বড় একটা আপত্তি নেই। প্রত্যক্ষ আলোচনায়, বক্তৃতায়, দলীয় মুখপত্রে নানাবিধ তাত্ত্বিক যুক্তির অবতারণা করা হয় সত্য, তথাপি যে কোন সচেতন ব্যক্তিই অনুভব করেন যে, বিধানসভা-লোকসভায় অধিকতর আসনে জয়ী হওয়ার ভিত্তিতেই ঐসব দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয়। ফলে, বিপ্লবের সংগঠন উহ্য থেকে যাচ্ছে। এই সাধারণ রাজনৈতিক অবক্ষয়ের প্রভাব বিভিন্ন দলের সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের উপর অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়।

সেই অবক্ষয়কে রোধ করার এবং বৈপ্লবিক মনোভঙ্গিকে প্রজ্বলিত রাখার একটা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা স্ফুলিঙ্গের মতো আবির্ভূত হয়েছিল ১৯৬৭ সনে, নকশালবাড়ি আন্দোলন ও এর পরবর্তী রাজনৈতিক বিক্ষোভের মাধ্যমে। কিন্তু, পরিণামে সেই প্রচেষ্টা সার্থকতা অর্জন করেনি, অবক্ষয়ী মনোভাব তাতে আরও শক্তিশালী হয়েছে। সম্প্রতি ঐ আন্দোলনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব আত্মসমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এটা পরিষ্কার, বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী যেভাবে বৈপ্লবিক তত্ত্ব প্রয়োগ করা উচিত ছিল, সেভাবে তা প্রয়োগ করা হয়নি। ফলে, তত্ত্ব ও কর্ম—উভয়ই বিপথচারী হয়েছে, এবং তা সামগ্রিক অর্থে গণ-মানসকে স্পর্শ করতেও পারেনি। এমনি ধরনের একটি সমীক্ষায় ঘোষণা করা হয়েছে, "ব্যক্তিগত নেতৃত্বের মোহ, আত্মসমালোচনার অনিচ্ছা, সঠিক রাজনৈতিক পথ আবিষ্কারের পরিবর্তে অহংবাদের প্রাধান্য, বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনাকে অসহিষ্ণুভাবে প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে প্রতিবিপ্লবী বলে

কালিমালিপ্ত করা—এক কথায় আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে চিরকালের· · ·বদ অভ্যাসগুলি নতুনরূপে আবির্ভূত হোল। ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে গুরু পাকড়িয়ে দল উপদলে বিভক্তিকরণের ও পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুড়ির যে ঐতিহ্য—তারই অবিচ্ছেদ্য অনুবৃত্তি দেখছি।" [মধ্যাহ্ন, বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সংকট সংখ্যা, ১৯৭৮, পৃঃ ১২৯]

এই রাজনৈতিক অবক্ষয়কে আজকের পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিমার্গীয় অস্তিত্বের অন্যতম বড় সত্য রূপে গ্রহণ করে এরই পটভূমিকায় বুদ্ধিজীবীদের কর্ম ও আচরণ বিচার করা উচিত। এই প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন বামপন্থী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা দলীয় রাজনীতির সীমাবদ্ধতার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছেন। সীমা উপলব্ধি করে আদর্শবাদের আলোকে একে প্রজ্বলিত প্রসারিত করার কার্যক্রম অনুসৃত হয়নি। ধরা যাক সি পি-আই সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের কথা। কংগ্রেস সরকার এবং সোভিয়েতের সংস্কারবাদের প্রতি আনুগত্য দলীয় কর্মনীতি হওয়ায় এই শিবিরে স্বাধীন চিন্তা বা আদর্শগত নিষ্ঠা নজরে পড়ে না; বরং তাঁদের ভূমিকায় ইওরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের নিন্দিত ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তিই লক্ষ্য করা গেছে, যা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে মাও সেতুংকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। আবার জরুরী অবস্থার সময় মহাকরণে বসে সহমরমীদের লেখার উপর পুলিশী অর্থাৎ সেন্সারের কাঁচি চালাতেও লজ্জা বোধ করেনি। চৌকিদারি জিনিসটা আদপেই শ্রদ্ধেয় নয়; তার উপর মতাদর্শ ভিন্ন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি আস্থাশীল লেখকদের উপর চৌকিদারি করা যে কোন আদর্শবাদী মানুষই বিবেকবিরুদ্ধ বলে গণ্য করে। কিন্তু আলোচ্য বুদ্ধিজীবী মহল তা করেনি। তাই, সাহিত্য-সমালোচনা ও সংস্কৃতি-ব্যাখ্যানের শ্রদ্ধেয় ঐতিহ্য এবং সংগ্রামী আত্মত্যাগ সত্ত্বেও একজন প্রবীণ প্রাক্তন বিপ্লবীকে এই চৌকিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করতে দেখা গেছে।

এবংবিধ আনুগত্যের প্রশ্ন অবশ্য সি-পি-আই (এম) বা আর-এস-পি সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের নিকট ছিল না। তথাপি, রাষ্ট্রব্যবস্থায় কংগ্রেসী আমলে ভয়কে যেভাবে সংগঠিত করা হয়েছিল, তার প্রভাব তাঁদের উপর বর্তায়নি—এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। তাঁদের চিন্তামননে ও আচরণেও যথেষ্ট পরিমাণ সতর্কতা প্রত্যক্ষ করা গেছে। অবশ্য স্বীকার করা ভাল যে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই ধরনের রচনা প্রকাশের সাহসিকতা দেখিয়েছেন:

"একটা বিষয় আমরা প্রায়শ লক্ষ্য ক'রে থাকি, যখন নিরন্ন মানুষ খাদ্যের দাবিতে প্রতিবাদে মুখর হয়ে হয়ে ওঠে, তখনই রাজনীতিমঞ্চের চ্যাম্পিয়নরা এর মধ্যে দেশদ্রোহিতা এবং বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ দেখতে পান; এবং রাজনীতিতে ভিন্ন-মতাবলম্বী যুবকদের উপর তাঁদের সিপাই-সান্ত্রীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। জানতে ইচ্ছে করে, দেশের শত্রু কারা। ···জনসমষ্টিকে খাদ্যে বস্ত্রে, চিকিৎসায়, শিক্ষায় বঞ্চিত করে, কার্যত তাদের শ্রমে উৎপাদিত সম্পদ থেকে তাদের বঞ্চিত করে, যারা কালো টাকার প্রাসাদে তান্ত্রিক সাধনায় নিমগ্ন রয়েছে, দেশের শত্রু তো তারাই। যারা শিশুর মুখ থেকে খাদ্য গ্রাস করছে তার ওষুধে বিষ মিশাচ্ছে, কালো টাকার শব সাধনায় দেশের অস্তিত্বকে করছে বিপন্ন, দেশের শত্রু তো তারাই। কিন্তু, কই তাদের জন্য তো নরকবাসের কোন ব্যবস্থা নেই। বরং দেখতে পাচ্ছি, তাদের প্রতি প্রেম-প্রীতি-ভালবাসায় 'গণতন্ত্রের' কর্তারা অতিশয় বিগলিত; তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার বাসনায় অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন।

"এই অশ্রদ্ধেয় নীতির প্রতি ধিক্কারে আমাদের সকলের কণ্ঠ মুখর হোক; রবীন্দ্রনাথ যেমন একদা সাম্রাজ্যবাদী দমননীতিকে "বিনিপাত" বলে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন, তেমনি বর্তমানের কলুষিত শাসনব্যবস্থাকেও যেন আমরা তাঁরই মতো অভিসম্পাত দিতে পারি, এই দুঃশাসনের কবল থেকে দেশ মুক্ত হোক, মানুষ বাঁচুক।"

কিন্তু, ঐ পর্যন্তই। বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের অভাবে, এবং বুদ্ধিজীবীদেরও সামগ্রিক সক্রিয়তার অভাবে, ঐসব উক্তি উচ্চারিত হওয়ামাত্রই মিলিয়ে যায়। এর ঢেউ গণ-মানসে কোন দিনই পৌঁছায় না। তেমনি ছোট ছোট নাট্যসংস্থা, কলাকুশলী সংঘ, বা লেখকগোষ্ঠী স্বকীয় উদ্যোগে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। এবং সেজন্য অনেক লাঞ্ছনা, পুলিশী অত্যাচার সহ্য করেছে; এমন কি, মৃত্যুও বরণ করেছে। কিন্তু, এটা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক যে সেই মহৎ মৃত্যুও বাঞ্ছিত বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারেনি, যা দিয়ে পূর্বকথিত রাজনৈতিক অবক্ষয় রোধ করে চিন্তা আদর্শ ও কর্ম দিয়ে গণ-সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। এর প্রধান কারণ, বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্নতা, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার মনোভঙ্গির অভাব, এবং দলীয় কর্মনীতির সীমায় নিজেদের খর্ব করে রাখা। অধিকন্তু রয়েছে বামপন্থী দলগুলোর সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার ইচ্ছার অভাব।

এই অবক্ষয়ের লক্ষণ ব্যক্তিগত জীবনেও বিশেষভাবে প্রকট দেখতে পাওয়া যায়। অর্থ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বুর্জোয়া সমাজসংস্থার যেসব মূল্যবোধ, তার অনুপ্রবেশ বৈপ্লবিক আদর্শে আশ্রিত বহু ব্যক্তির জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী, নেতা ও বুদ্ধিজীবী এমন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, যার সঙ্গে ঘোষিত আদর্শের কোন মিল নেই ; ফলে প্রয়োজনীয় সংগ্রামশীলতা ও জনসংযোগও অনুপস্থিত। যে অবক্ষয় শ্রমিকনেতার লক্ষপতি হওয়ার মধ্যে প্রকটিত, সেই অবক্ষয়ই সেই বুদ্ধিজীবীদের মনোভঙ্গির মধ্যে প্রকাশিত যারা টাকার অঙ্ক দিয়ে তাদের কাজের ও সময়ের পরিমাপ করে। এরই অন্যতম লক্ষণ হল গণজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা ; যার ফলে, বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি মৌখিক আনুগত্য জানিয়েই কর্তব্য শেষ করা হল বলে গণ্য করা হয়। সংগ্রামের চেতনা থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনাটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রসঙ্গত আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছু-সংখ্যক সুপণ্ডিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেশবিদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করার প্রবণতা দেখা যায়; যেমন, সোভিয়েত সংস্কারবাদ অথবা ইওরো-কম্যুনিজম সম্পর্কে পশ্চিম বাংলায় আলোচনার অভাব নেই। মার্কসবাদী তত্ত্বের ভুল প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতনতা নিশ্চয়ই প্রয়োজন; কিন্তু, তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন স্বদেশের পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও আত্মসমালোচনা। কারণ, তা ই সঠিক কর্মপন্থার নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু, এর অভাব আলোচ্য বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর গণজীবন, সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লব সম্পর্কে পরোক্ষ উদাসীনতারই ইঙ্গিত বহন করে।

এই অভিযোগ আধুনিক কালের উল্লেখনীয় নাট্য আন্দোলন সম্পর্কেও উচ্চারিত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে যে, স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম বাংলার নাট্য আন্দোলন প্রযোজনা, আঙ্গিক, নির্দেশনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অভাবনীয় দক্ষতা অর্জন করেছে, এবং এখানে বুদ্ধিমার্গীয় মননশীলতার ছাপ অতিশয় উজ্জ্বল। কিন্তু, এই উজ্জ্বলতাও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। সম্প্রতি একটি নির্ভরযোগ্য সমীক্ষায় বলা হয়েছে, "গণসংগ্রামের অঙ্গীকার ও অহংকারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চল্লিশের গোড়ায় যে গণ নাট্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল তার গন্তব্যস্থল ছিল গণসমুদ্র, কিন্তু তার বদলে গণনাট্য গেল গোল্লায়, এ আক্ষেপ গণনাট্যের পথপ্রদর্শকদেরই। ···কারণ, 'নবান্ন' দিয়ে যে নাট্যগোষ্ঠীর জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তা সব দিক থেকে ছিল একটা প্রচণ্ড বিপ্লব··· । কিন্তু সেই স্বাবিক বিপ্লবের মানসিকতা ও স্ফূর্তি টেঁকেনি বেশিদিন। গণনাট্য কাঁকড়ার মতো

একাধিক সন্তান জন্ম দিয়ে নিজে মৃত্যুবরণ করল। তার সন্তানেরা নবনাট্য, অন্ত থিয়েটার, গ্রুপ থিয়েটার হরেক নামে বড় হয়ে উঠলেও তাদের উঠোনে জনগণের উপস্থিতি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল। আজ বাংলা প্রগতিবাদী থিয়েটার, বিশেষ করে কলকাতার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, যেমন আঙ্গিক ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে, কিন্তু পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জনগণ থেকে।" আরও, "এখন মঞ্চসজ্জা ও প্রযোগকৌশলে গ্রুপ থিয়েটার নতুন নতুন চমক লাগায়, কিন্তু সে চমকে চমকিত হই আমরাই ব্যাপক জনসাধারন নয়। ...এখন গ্রুপ থিযেটাব মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক।...এখন বিদেশী নাটকের বাংলা রূপান্তরের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এটাও গণবিচ্ছিন্নতার আর একটা ফল।" [গণনাট্যের সর্বনাশ: বুদ্ধিজীবীর পৌষমাস? প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, মধ্যাহ্ন, বুদ্ধিজীবীর সংকট সংখ্যা, ১৯৭৮]

এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। বিশ্লেষণ করলে আরও দেখা যাবে যে, যেসব গণ-মাধ্যমের মারফত প্রগতিশীল চিন্তাধারা জনজীবনে প্রবেশ করে এবং তাদের মধ্যে ভাবান্তব ঘটায়,—যথা, পত্র-পত্রিকা, সিনেমা থিয়েটার, ইত্যাদি সেখানেও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। রাষ্ট্র-কাঠামোব বিধাতাগণ এবং বুর্জোয়া মূল্যবোধেব ধারক ও বাহকগণ এব সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ কবছে, এবং অপসংস্কৃতিব কলুষ সমাজদেহে ছিটিযে দিচ্ছে। আদর্শগত সজীবতা রক্ষিত না হওযায় এবং বিভ্রান্তি সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতনতা না থাকায অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন যতটা শক্তিশালী হওয়া উচিত ছিল, ততটা হতে পারেনি, পারছে না। বলা বাহুল্য, এরই পটভূমিতে এবং এই অসফলতা সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টিশীল ঐতিহ্য বহমান রাখার ও একে শক্তিশালী করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে কিছু-সংখ্যক সংস্কৃতিকর্মী ও সংস্থা, যাদের উদ্যম প্রশংসনীয় ও শ্রদ্ধেয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব কী, তা নিয়েও মতভেদের অবকাশ নেই। সংক্ষেপে তা এইরূপ: শোষণ ও উৎপীড়নে জর্জরিত মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার বোধে উদ্‌বুদ্ধ হওয়া; সমকালীন সমস্যার ভাবনায় উদ্বিগ্ন হওয়া ও সমাধানের পথ আবিষ্কারের চেষ্টা; মানবিক ভুবনের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা; সংগ্রামের মধ্যে আপন অস্তিত্বের সার্থকতা উপলব্ধি করা; এবং সেজন্য মৃত্যু সহ যে কোন প্রকার বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকা। যিনি একান্ত সত্য অর্থে নিজেকে বুদ্ধিজীবী রূপে গণ্য করেন, তাঁর কাছে এ ছাড়া অন্য

কোন পথ নেই। কিন্তু, সার্থক ভাবে এই পথপরিক্রমার জন্য যা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হল, পূর্ব-আলোচিত রাজনৈতিক অবক্ষয়কে প্রতিরোধ করা এবং সুস্থ নির্ভুল রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া। যতদূর স্মরণে আসে মাও সেতুং একদা বলেছিলেন, সঠিক রাজনৈতিক আদর্শ না-থাকা আত্মা না-থাকার সামিল। কোন সৎ বুদ্ধিজীবীই আত্মা হীন অর্থাৎ বোধ-উপলব্ধিহীন জীবনযাপন বা অস্তিত্ব কামনা করে না।

কামনা করে না বলেই তাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংগ্রামের সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে হয়। আর, এটা তার জীবনসাধনা এবং জ্ঞানানুশীলনেরও পথ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চিন্তায় জ্ঞানানুশীলন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে :

Discover the truth through practice, and again through practice verify and develop the truth. Start from perceptual knowledge and actively develop it into rational knowledge; then start from rational knowledge and actively guide revolutionary practice to change both the subjective and the objective world. Practice, knowledge again practice, and again knowledge. This form repeats itself in endless cycles, and with each cycle the content of practice and knowledge rises to a higher level. Such is the whole of the dialectical-materialist theory of knowledge, and such is the dialectica-lmaterialist theory of the unity of knowing and doing. [Mao-Tse-Tung : Five Essays on Philosophy, p. 20]

অর্থাৎ ব্যবহারিক কর্ম থেকে সত্যকে জানা, আবার কর্মের মাধ্যমে সত্যের সত্যতা যাচাই ও তার বিকাশ সাধন; প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর সত্য থেকে বুদ্ধিমার্গীয় জ্ঞানে উত্তরণ পুনরায় বুদ্ধিমার্গীয় জ্ঞান থেকে ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে ফিরে আসা; এবং এইরূপ আসা-যাওয়ার পথে আত্মগত ও বিষয়গত—উভয় পৃথিবীর রূপান্তর সাধন। কর্ম ও জ্ঞানের এই সংশ্লিষ্ট প্রবাহের ভেতর দিয়ে মানুষের জীবন ও সমাজে বৈপ্লবিক রূপান্তর সংসাধিত হয়। কর্ম ও জ্ঞানের এই যুগলমিলনের পথেই মানবিক সভ্যতা উন্নততর বন্দরে উপনীত হয়।

আশার কথা, এই তত্ত্বের নিরিখে যারা জীবনকে উপলব্ধি করতে চায়, আজকের পশ্চিম বাংলায় তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ; এবং সংখ্যায় অল্প হলেও সমাজ-জীবনের জমি তারা কর্ষণ করে চলেছে।

পরিশেষে বক্তব্য, স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ও মতাদর্শে বিভক্ত বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা, মনন ও কর্মের একটি রূপরেখা বর্তমান নিবন্ধে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে, কিন্তু তথ্যগত বিস্তৃতির প্রতি যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়নি। মুখ্য লক্ষণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে ; কারণ, পুঞ্জীভূত তথ্যের বোঝা একটি নিবন্ধ বহন করতে অক্ষম।

ভূমিসম্পর্কের রূপান্তর ও কৃষির উন্নয়ন

অশোক রুদ্র



পশ্চিমবঙ্গের কৃষিব্যবস্থায় উৎপাদনের ভিত্তিতে শ্রেণীসম্পর্কের পরিবর্তন কী-জাতীয় ঘটেছে, এবং তার ফল হিসাবে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশই বা কী জাতীয় ঘটেছে, তার আলোচনাই আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। এই আলোচনার প্রধান অসুবিধা এই যে, বিষয়টি সম্পর্কে রাজনীতিসচেতন ব্যক্তি-মাত্রই খুবই জোরালো কোন না কোন মতবাদ পোষণ করেন, কিন্তু তথ্যভিত্তিক গবেষণার কাজ খুবই কম করা হয়েছে। তথ্য বাদ দিয়ে যে তত্ত্ব, তা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হয় না, হয় ধর্মীয় গোঁড়ামির অনুরূপ ধারণাপুঞ্জ। এই গোঁড়ামির দ্বারা চিহ্নিত যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁরা প্রায়ই বলে থাকেন, পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থা এখনও মূলত 'সামন্ততান্ত্রিক', এক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটেনি এবং ঘটছে না, সেই কারণে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশও একেবারেই ঘটছে না। এই বিকাশ ঘটাতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন ভূমিসংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে এই সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটানো। এই মতের প্রবক্তারা ভূমির সমস্যা বলতে প্রধানত বর্গাদারি ব্যবস্থাকেই মনে করে থাকেন—এঁদের মতে পশ্চিমবঙ্গের

কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল স্তম্ভই এই বর্গাদারি ব্যবস্থা। তার সঙ্গে মহাজনদের সুদের কারবার এবং জোতদারদের ধান, পাট ও অন্যান্য শস্য নিয়ে কারবারকে জুড়ে মোটামুটি এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামো।

এই প্রবন্ধের বক্তব্য অনেকাংশেই এই প্রচলিত ধারণার থেকে ভিন্ন হবে। আমি মনে করি না যে, পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থাকে সামন্ততান্ত্রিক আখ্যা দেওয়ায় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কিছুমাত্র সুবিধা হয়। তার মানে এই নয় যে আমার বক্তব্য: আমাদের কৃষিব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া অধিকতর বৈজ্ঞানিক যুক্তিসংগত। আমার মতে, ধনতন্ত্র বনাম সামন্ততন্ত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখাটাই ভ্রান্তিযুক্ত। এর আলোচনা পরে বিশদভাবে করব। তেমনি আমি মনে করি না যে বর্গাদারি সমস্যাই পশ্চিমবঙ্গের কৃষিব্যবস্থার মূল সমস্যা। আমি মনে করি, এই মূল সমস্যা ক্ষেতমজুরদের অবস্থার সঙ্গে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বর্গাদারি ব্যবস্থা একই কালে সংকুচিত হয়ে আসছে, যেটুকু অবশিষ্ট থাকছে তার নানান গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটছে। বর্গাদারি ব্যবস্থা এখন যে ভাবে প্রচলিত রয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে সামন্ততান্ত্রিক এবং সেই কারণে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পরিপন্থী, সে কথা একেবারেই মানা যায় না। আমার মতে, পশ্চিমবঙ্গে বর্গাদারি ব্যবস্থা এখন যে রূপ নিচ্ছে তা অনেকাংশেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ কী-জাতীয় হয়েছে অর্থাৎ উৎপাদনব্যবস্থার বিবর্তন যা হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে তার দরুন উৎপাদনের সহায়তা কতটা করা হয়েছে—আমরা প্রথমে তার খানিকটা হিসাব পেশ করব। সাম্প্রতিক একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ১) দেখানো হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে ধানের উৎপাদন সেই ১৯৫০ সাল থেকে শুরু করে সত্তর দশক পর্যন্ত বেড়েই গেছে মোটামুটি একটি মসৃণ চড়াই পথ অনুসরণ করে। খুব যে প্রচণ্ড হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়—এই বৃদ্ধি ঘটেছে বাৎসরিক শতকরা ১.৯ হারে। কিন্তু যে কথা গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে, বৃদ্ধি ঘটেছে—আগাগোড়াই ঘটেছে। যাঁরা বলেন বৃদ্ধি ঘটেনি, তাঁরা ভুল বলেন। আর যাঁরা বলেন বৃদ্ধি না ঘটে অবনতি ঘটছে, তাঁরা তো আরও ভুল বলেন। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে যা ঘটেছে তার সঙ্গে পাঞ্জাব ইত্যাদি অঞ্চলের ঘটনার একটা মূল প্রভেদ আছে। প্রভেদটি এই যে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরবর্তী এই যুগে কৃষির উৎপাদন শুধু যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, সেই বৃদ্ধির হারও আগে যা ছিল, তার চেয়ে এখন অনেক বেড়ে গেছে। 'সবুজ বিপ্লব'

বলে একটা কথা বাজারে চালু হয়েছে। দুনিয়ার কোন কোন অঞ্চলে, এবং ভারতবর্ষেরও কোন কোন অঞ্চলে কৃষিতে বেশ অল্প সময়ের মধ্যে কিছু বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে, উৎপাদনব্যবস্থায় নানারকম পরিবর্তন এসেছে। এইসব মিলে যা ঘটেছে তাকেই বলা হয়ে থাকে সবুজ বিপ্লব। ভারতবর্ষের যেসব অঞ্চলে এ-জাতীয় পরিবর্তন ঘটেছে তাদের মধ্যে পাঞ্জাব সকলের আগে। ওই প্রবন্ধেই দেখানো হয়েছে যে পাঞ্জাবের গমের উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত ছিল শতকরা ৭·৩ ; পরবর্তী কালে সেই হার হয়েছে শতকরা ১০·১। পশ্চিমবঙ্গে এই-জাতীয় কোন হঠাৎ পরিবর্তন দেখা যায়নি।

এখানে একটা কথা একটু বিশদ করে বলে রাখা ভালো। আমরা আগে মসৃণ চড়াই-এর পথে বৃদ্ধির কথা বলেছি। তার মানে এই নয় যে প্রতি বছর থেকে পরের বছরে উৎপাদনের বৃদ্ধি একই রকম মসৃণভাবে ঘটেছে। উৎপাদনবৃদ্ধির পথ খুবই উত্থানপতনবন্ধুর। উৎপাদন কোন কোন বছর বৃদ্ধি না পেয়ে কমে গেছে, আবার কোন বছর অত্যধিক বেড়েছে। কিন্তু এই উত্থানপতনের মধ্য দিয়েই যে পথটা গেছে সেই পথের কথা বলা হচ্ছিল। এই পথটি পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে আগাগোড়া মসৃণ থাকেনি, ১৯৬৬-৬৭ সাল নাগাদ হঠাৎ চড়াই-পথ আগের থেকে অনেক বেশি খাড়া হয়ে উঠেছে।

এতক্ষণ উৎপাদনবৃদ্ধি নিয়ে যে আলোচনা করা হল, তা সমগ্র উৎপাদন সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য বিঘা প্রতি উৎপাদন সম্বন্ধেও তাই। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ধানের উৎপাদন ১৯৫২-৫৩ সালের থেকে ১৯৭৩-৭৪ সালে শতকরা ৪৫ ভাগ বেড়েছে। ধানের মধ্যে আউশ-আমনের চেয়ে অনেক বেশি যা বেড়েছে তা হল বোরো ধান—এই বৃদ্ধি ঘটেছে ৪০ গুণ। তেমনি গমের উৎপাদন একই সময়ে বেড়েছে ১৭½ গুণ। বোরো ধান এবং গমের চাষের উৎপাদনে এমন অনেক কাঁচা-মাল ও আয়োজনের প্রয়োজন যা ভূমিসম্পর্কের বেশ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ছাড়া সম্ভবই হয় না। এই কারণে এই দুটি শস্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল। বিঘা-প্রতি উৎপাদন আমন ধানের ক্ষেত্রে বেড়েছে শতকরা ১৪ ভাগ, বোরো ধানের ক্ষেত্রে শতকরা ৩৭ ভাগ, এবং গমের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার হয়েছে শতকরা ৩০ ভাগ। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে যে এইসব শস্যে যে পরিমাণ জমি নিয়োগ করা হয়েছে তাও যেমন বেড়েছে, বিঘা-প্রতি উৎপাদনও বেড়েছে। এই দুটি কৃষিতে উন্নয়নের দুটি বিভিন্ন দিকের নির্দেশনা করে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে উৎপাদনের বৃদ্ধি যা ঘটেছে তা অবশ্যই খুব উচ্চ হারের নয়। কিন্তু একথা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে এই বৃদ্ধি শিল্পে উৎপাদনবৃদ্ধির চেয়ে বেশি হারে ঘটেছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় আয়ের যে অংশ কৃষি থেকে উদ্ভূত তা ১৯৫০-৫১ সালে ছিল শতকরা ৩২·২ ভাগ, আর ১৯৭২-৭৩ সালে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৭·৬ ভাগে।

এই উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটেছে কিভাবে? আগেই দেখেছি যে পরিমাণ জমি চাষ করা হয় তাও বেড়েছে এবং বিঘা-প্রতি উৎপাদনও বেড়েছে। নূতন করে কৃষিতে ব্যবহৃত হত না এমন জমি কৃষিতে নিযোগ করা হচ্ছে, এই ঘটনা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে যা ছিল একফসলা জমি, তাকে করা হচ্ছে দোফসলা বা তিনফসলা। এরকম দোফসলা বা তিনফসলা জমির পরিমাণ ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৭২-৭৩ এই ২২ বৎসরে বেড়েছে শতকরা ৮৮ ভাগ। এই বৃদ্ধির জন্য মূলত দায়ী সেচব্যবস্থার প্রসার। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের সেচ-জমির পরিমাণ এই ২২ বৎসরে বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৭৬ ভাগ। কিন্তু এই হিসাবটা বোধহয় খুব নির্ভরযোগ্য নয়। তার কারণ নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান শুধুমাত্র সরকারী ক্যানাল সেচ সম্বন্ধেই সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের কৃষিতে সরকারী বড় বড় ক্যানাল ছাড়াও সমপরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নানাবিধ মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তনের সেচ ব্যবস্থা। এই-জাতীয় সেচব্যবস্থার বৃদ্ধি কতটা পেয়েছে তার আন্দাজ পাওয়া যায় সেচ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে। ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত পশ্চিম-বঙ্গের ডীপ টিউবওয়েলের সংখ্যা ছিল ১৯,৫০০, ১৯৭৩-৭৪ সালে তা হয়ে দাঁড়ান ২৬,৫০০। শ্যালো টিউবওয়েলের সংখ্যা এই একই সময়ে ১১ হাজার থেকে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৬৫ হাজারে। একই কালে পাম্পের সংখ্যা দাড়ায় ১৫ হাজার থেকে বেড়ে ৬৫ হাজারে। অবশ্য এখানে একটা ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার। এইসব যন্ত্রের অনেকগুলিই অনেক সময় অচল অবস্থায় পড়ে থাকে। সুতরাং যন্ত্রসংখ্যা বাড়লেই সেই অনুপাতে সেচ-জমির পরিমাণ বাড়ে না। আর এইসব আধুনিক যন্ত্রপাতি বাদ দিয়ে প্রাচীন প্রথায় (যেমন দুনির সাহায্যে) সেচ কতটা জমিতে হয় অথবা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে সেসব অবশ্য জানা যায় না।

সেচের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক সার, উন্নত ফলনশীল বীজ এবং কৃষিতে প্রযোজ্য যন্ত্রের ব্যবহারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে ঐ ২২ বৎসরে ৩০ গুণ। উন্নত ফলনশীল বীজ বপন করা হয়েছে এমন

ধানজমির পরিমাণ রবি ধানের ক্ষেত্রে বেড়েছে ২৮ গুণ আর বোরো ধানের ক্ষেত্রে ৩৫গুণ। বোরো ধান এবং গমের ক্ষেত্রে উন্নত ফলনশীল বীজ প্রযুক্ত জমি শতকরা ৯০ ভাগের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল ঐ ১৯৭২-৭৩ সালের মধ্যেই।

উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি কী রকম ঘটেছে এবং তার জন্য পুঁজির নিয়োগ কী ধরনের এবং কী পরিমাণে করা হয়েছে তার একটা আলেখ্য দেওয়া গেল। এখন আমরা দেখব এই বিকাশ সম্ভব করেছে কী-জাতীয় ভূমিসম্পর্কের পরিবর্তন। এখানে আমাদের আলোচনার গণ্ডীতে স্বাধীনতার আগেকার কালের প্রসঙ্গ যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাব। তার কারণ এই নয় যে ভূমিসম্পর্কের বিবর্তন বুঝতে গেলে স্বাধীনতার আগেকার সময়কার অবস্থাকে ভুলে যাওয়া যায়। তা মোটেই যায় না। এড়িয়ে যাব এই কারণে যে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী কালে ব্রিটিশ শাসন এবং জমিদারি ব্যবস্থা এই উভয়ের প্রভাবে কৃষির অবস্থা কী রকম ছিল তা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। আব-একটি কারণ এই যে পরবর্তী কালের পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনীয় কোন পরিসংখ্যান ঐ পূর্ববর্তী কালের জন্য পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিসংস্কার—যার প্রধান দান জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ—তাকে ধরে নিয়েই আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব।

জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদের পর আমাদের কৃষিতে যে ব্যবস্থার পত্তন ঘটেছে তার মূল লক্ষণগুলি আমার মতে নিম্নলিখিত প্রকারের: (১) ক্ষেতমজুরদের সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি। (২) ভাগপ্রথার গুরুত্ব হ্রাস, নিজ জোত চাষের গুরুত্ব বৃদ্ধি। (৩) জমিদার-শ্রেণীর অবর্তমানে জোতদার-শ্রেণীর ক্ষমতা ও আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে গ্রামীণ সমাজের শাসকশ্রেণীর ভূমিকা গ্রহণ।

চলতি বাংলায় জোতদার বলতে যা বোঝায় আমরা তা ছাড়া অন্য কিছু বোঝাচ্ছি না। জোতদার বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তি যার সম্পদ ও আয়ের মূল ভিত্তি কৃষিজমির মালিকানা। যে কোন গ্রামের কৃষিযোগ্য জমির খুব একটা বড় অংশ মুষ্টিমেয় কয়েকজন জোতদারের করায়ত্ত। এই জোতদারেরা তাদের অর্থ-নৈতিক-সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বহুরূপী। এরা জমি ভাগে দিয়েও চাষ করায়, আবার নিজ জোত হিসাবে ক্ষেতমজুর দিয়েও চাষ করায়। এদের আয়ের যে উদ্বৃত্ত অংশ তা এরা পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করে নানারূপে। পুঁজির কোন অংশ দিয়ে তারা কৃষির উন্নতিসাধন করে, বীজ কেনে, সার কেনে, সেচের ব্যবস্থা করে, যন্ত্রপাতি কেনে, কীটপতঙ্গনাশক ওষুধ কেনে। অর্থাৎ উদ্বৃত্তের এক অংশ

তারা যেভাবে ব্যবহার করে তার ভূমিকা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজির যে ভূমিকা তাই। অপরদিকে এদের উদ্‌বৃত্তের এক অংশ ব্যবহৃত হয় দরিদ্র চাষী, ক্ষেতমজুর ইত্যাদিদের ধার দেওয়ার জন্য, অথবা ধান পাট নিয়ে ব্যবসা করার জন্য, যে ব্যবসার অন্যতম প্রধান চরিত্র ফাটকাবাজি। আবার কৃষির বাইরে চট করে মুনাফা করার সুযোগ যদি থাকে তো সেখানেও এরা কিছুটা পুঁজি নিয়োগ করে দেয়। বাসের পারমিট পেলে কোন জোতদার হয়তো দুটো বাসই নামিয়ে দিল। তা নয়ত নিকটবর্তী শহর-গঞ্জ এলাকায় কোন দোকানপাট খোলার সুযোগ পেলে বা একটা সিনেমা হল করার সুযোগ পেলে বা অন্য কোন শিল্পজাত দ্রব্যের বিতরণের দায়িত্ব লাভ করার সুযোগ পেলে তারা তাদের পুঁজির এক অংশ এইসব খাতে নিয়োগ করে দিতে দ্বিধা করে না। কিন্তু এই জোতদার শ্রেণীর আয়ের উদ্‌বৃত্তের অথবা সঞ্চিত পুঁজির কোন অংশ শিল্পে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় বলে জানা যায় না। যদি হয়ও তো খুবই সামান্য পরিমাণে হয়। এই যে জোতদার নামক শাসকশ্রেণীর আলেখ্য আঁকলাম, আমার মতে যে কোন গ্রামাঞ্চলেই তাদের উপস্থিতি, প্রভাব ও প্রতাপ লক্ষ্য না করে পারা যায় না। এদের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য কোন তত্ত্বকে উপস্থিত করতে হবে না। সাদা চোখ মেলে দেখলেই উপরে যে লক্ষণগুলোর কথা বলা হল সেই লক্ষণ সমেত এদের দেখা যাবে। কিন্তু আমাদের দেশের ভূমিসম্পর্কের আলোচনায় যে জাতীয় শ্রেণীদের কথা বলা হয়ে থাকে, বিশেষ করে মার্কসবাদী আলোচনায় যেভাবে কৃষিতে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়, তার সঙ্গে আমাদের এই বিশ্লেষণ মিলবে না। যেমন, কোন কোন বিশেষ ধরনের তাত্ত্বিক আলোচনায় ধনী কৃষককে অন্য এক তথাকথিত শ্রেণী থেকে তফাত করে দেখা হয়। এই তথকথিত শ্রেণীকে ইংরাজীতে 'ল্যাণ্ডলর্ড' বলা হচ্ছে। বাংলায় তাদের জমিদার বললে ঘোরতর ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা। কেননা স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী কালে যে জমিদারি প্রথা ছিল সে প্রথা অনুযায়ী জমিদার, যাদের কাজ শুধু কর সংগ্রহ করে তার একাংশ নিজের ভোগের জন্য রেখে বাদবাকীটা সরকারকে দিয়ে দেওয়া, সেই রকমের জমিদার এখনও টিকে আছে, এ বোধহয় কারও বক্তব্য নয়। এখনকার তথাকথিত ল্যাণ্ডলর্ডদের বাংলা নাম যাই দেওয়া হোক, এদেরকে আবার প্রচলিত আলোচনায় দুই ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়। বলা হয় এদের একাংশ সামন্ততান্ত্রিক-চরিত্র-বিশিষ্ট। অপর অংশ ধনতান্ত্রিক-চরিত্র-বিশিষ্ট। এবং এরা উভয়ই ধনী কৃষকদের থেকে ভিন্ন—এই

অর্থে যে ধনী কৃষকেরা নিজ কায়িক পরিশ্রমে কৃষির কিছু কিছু কাজ করে থাকে। কিন্তু এই তথাকথিত 'ল্যাণ্ডলর্ড' শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাও করে না।

আমার মতে, বেশি জমিজমার মালিক গ্রামের মাতব্বর শ্রেণীর ব্যক্তিদের এইরকম তিন ভাগে ভাগ একেবারেই করা যায় না। পাম্প কেনা যদি ধনতান্ত্রিক আচরণের লক্ষণ হয়, আর গরিব চাষীদের ধার-দেনা দেওয়া যদি সামন্ততান্ত্রিক আচরণের লক্ষণ হয় তো এই নিরিখ ব্যবহার করে কোন এক গোষ্ঠীকে ধনতান্ত্রিক আর অন্য কোন এক গোষ্ঠীকে সামন্ততান্ত্রিক—এই বিভাজন করাই যাবে না। আমরা আগেই দেখেছি যে, গ্রামের লোক যাদের জোতদার বলে তারা একই কালে এমনভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আচরণ করে যে তার মধ্যে তথাকথিত সামন্ততান্ত্রিক আচরণ ও তথাকথিত ধনতান্ত্রিক আচরণ মিলেমিশে থাকে। তারপর গ্রামের লোক যাদের জোতদার বলে, কায়িক পরিশ্রমের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বিভাজন করা যাবে কী করে? কায়িক পরিশ্রম আমরা কাকে বলব? ছাতা মাথায় দিয়ে আলের উপর বসে ক্ষেতমজুরের কাজ খবরদারি করাকে যদি কায়িক পরিশ্রম বলা হয়—আমাদের সরকারী নথিতে তাই বলা হয় বটে—তো সেরকম পরিশ্রমও করে না এমন ব্যক্তি জোতদারদের মধ্যেও কমই পাওয়া যাবে। আর নিজ হাতে হাল লাঙল দিয়ে চাষ করাকেই যদি কায়িক পরিশ্রম বলা হয় তো সেরকম কায়িক পরিশ্রম যাদের মধ্যবিত্ত চাষী বলা হয় তাদের মধ্যেই বা কতজন করে?

এখন আমরা পশ্চিমবঙ্গের বর্গাদারি প্রথার দিকে দৃষ্টি দেব। এটি বেশ সাবেকী প্রথা। জমিদারি প্রথা থাকাকালীনও নিজ হাতে চাষের কাজ করছে যে সে প্রায়শই ছিল না জমির মালিক। জমির মালিকানার স্বত্ব নানান ভাবে বিভক্ত হয়ে নানান জনের মধ্যে জটিল আকারে ছড়িয়ে থাকত। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে চাষের কাজ যে করত প্রায়শই সে জমির মালিক তো ছিলই না, ক্ষেতমজুরও ছিল না, ছিল ভাগীদার বা বর্গাদার। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী কালের ভূমিব্যবস্থার জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করব না। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার পর থেকে বর্গাদারি প্রথাটি যে রকম দাঁড়িয়েছে এবং তার যা বিবর্তন হয়েছে তারই আলোচনা করব। এই প্রথাটির মূল লক্ষণগুলি এই: ভাগীদার চাষী কোন একজন জমির মালিকের কাছ থেকে কিছু জমি চাষ করার জন্য ভাগের শর্তে নেয়। এক খণ্ড জমির জন্য মাত্র একজন মালিকের সঙ্গেই চাষীকে ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর থেকে কোন একখণ্ড জমির মালিকানা

স্বত্ব মাত্র একজন লোকের উপরেই বর্তিয়েছে। একই ভাগীদার কিন্তু একাধিক জমির মালিকের কাছ থেকে চাষের জন্য বিভিন্ন জমির খণ্ড ভাগে নিতে পারে। এবং একজন জমির মালিক একাধিক চাষীকে তার নিজের জমির বিভিন্ন অংশ ভাগে দিতে পারে। অর্থাৎ ভাগীদার ও জমির মালিকের মধ্যে যে শর্ত তা দাস-প্রথায় বা ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাষীর সঙ্গে জমির মালিকের যে সম্পর্ক ছিল তার থেকে মৌলিক ভাবে ভিন্ন। কেননা দাসপ্রথায় বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাষীর স্বাধীনতা ছিল না বেছে নেওয়ার কোন মালিকের সঙ্গে কাজ করবে। কিন্তু আমাদের দেশে বর্গাদারদের সেই স্বাধীনতা আছে। যে শর্তের কথা বলা হল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌখিক চুক্তি মাত্র। খুব সম্প্রতিকালে বর্গাদারদের রেজিস্ট্রি করানো হচ্ছে। কিন্তু এখনও বর্গাদারদের খুব কম অংশই মৌখিক চুক্তির পরিবর্তে দলিল সংগ্রহ করতে গেছে। মৌখিক হলেও প্রচলিত বর্গাদারি শর্তের মধ্যে কোন প্রকার অস্পষ্টতার স্থান নেই। জমির মালিক ও চাষীর মধ্যে দেনাপাওনা, আদানপ্রদান কেমন হবে তা বেশ পরিষ্কারভাবেই উভয় পক্ষের জ্ঞাত এবং উভয় পক্ষের দ্বারাই স্বীকৃত। যেমন, ভাগীদার চাষী হাল-লাঙল নিজে থেকে দেবে, বলদ নিজেই যোগাবে, মুনিষ মাহিন্দার বা অন্য-জাতীয় শ্রমিকের শ্রম যদি ক্রয় করতে হয় তো তার দায়িত্বও চাষীরই, নিজের বা নিজ পরিবারের লোকেদের শ্রম যদি প্রয়োগ করতে হয় তো তাতো সে করবেই। মালিকের দিকে জমির খাজনা যা সরকারকে দিতে হয় তা সে দেবে, সেচের জন্য যদি কর দিতে হয় তো তাও সে দেবে। ফসলের ভাগ অর্ধেক মালিক পায়, অর্ধেক পায় ভাগচাষী। এই যে আধাআধি ভাগ, তাই বর্গাদারি প্রথায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অবশ্য অন্য ভাগাভাগির অনুপাতও পাওয়া যায়। কোথাও কখনও দশ আনা ছয় আনা ভাগ পাওয়া যায়, কোথাও আঠারো-বাইশ এই অনুপাতে ভাগ হয়। সিকি ভাগ, বারো আনা ভাগ অথবা তেভাগারও প্রচলন একেবারে যে নেই তা নয়। কিন্তু আধাআধি ভাগটাই বহুকাল যাবৎ চলে আসছে,—এখনও এই ভাগই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এখন পর্যন্ত ভাগাভাগির যে শর্তগুলি আলোচনা করা হল ভাগপ্রথা মাত্রই তারা প্রযোজ্য। পঁচিশ বৎসর আগেও যেমন ছিল এখনও তেমন আছে। কিন্তু অন্য কোন কোন ব্যাপারে এই প্রথার মধ্যে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। যেমন আগেকার দিনে চাষের জন্য কাঁচামালের যা প্রয়োজন হত তার খরচ এবং তার যোগানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পুরোটাই ছিল ভাগীদারের। কিন্তু যখন থেকে তথাকথিত উন্নত প্রথার

চাষের প্রচলন হয়েছে, অর্থাৎ যখন থেকে উন্নত ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ, পাম্পসেট ইত্যাদির সাহায্যে সেচের জল প্রভৃতির ব্যবহার বেড়েছে তখন থেকে এই বিশেষ বিশেষ উপাদানগুলির খরচের এক অংশ মালিক পক্ষের দেওয়া এবং তাদের সংগ্রহ করে আনার দায়িত্বও আংশিক ভাবে মালিকের নেওয়ার প্রচলন দেখা দিয়েছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এখানে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখা দরকার। বর্গাদারি প্রথার সঙ্গে বেগার খাটুনির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে জনমানসে একটা ধারণা আছে। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী কালে জমিদারদের জন্য প্রজাদের বেগার খাটার প্রচলন খুব বেশি ছিল সন্দেহ নেই, যদিও ঐ যুগের অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত এই বিষয়ের উপরও কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। সেই আমলে জমির মালিকের জন্য ভাগদারদের বেগার খাটা হয়তো বেশ প্রচলিতই ছিল। কিন্তু যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পরবর্তী কালের কথা আমরা আলোচনা করছি সেই কালে জমির মালিকের জন্য ভাগীদারদের বেগার খাটা খুব ব্যাপক বোধহয় কোন সময়েই ছিল না। কুড়ি পঁচিশ বা দশ-পনেরো বৎসর আগে যদি এর প্রচলন বেশি থেকেও থাকে তো হাল আমলে তা অনেক কমে গেছে। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় [২] দেখা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গে মালিকের জন্য মজুরি খাটতে হয় ভাগীদারদের মাত্র শতকরা ২৮ ভাগকে। কিন্তু এদেরও মধ্যে অনেকেই মজুরির বিনিময়ে পারিশ্রমিক পায়। বিনা পারিশ্রমিকে মজুরি—যাকে প্রকৃত অর্থে বেগার বলা হয়ে থাকে—তার প্রচলন ভাগীদারদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৫ ভাগ পাওয়া গেছে।

এই যে বর্গাদারি প্রথা, সত্যিই কি এই প্রথাই পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অর্থনীতির মূলস্তম্ভস্বরূপ? পরিসংখ্যান কিন্তু তা বলে না। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে নামে আমাদের দেশে যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে তাদের রিপোর্ট অনুসারে ১৯৫৩-৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-জমির শতকরা ২৫ ভাগ ভাগপ্রথায় চাষ করা হত। ঐ একই প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই প্রথার অন্তর্ভুক্ত কৃষি-জমির পরিমাণ ১৯৬১ সালে কমে শতকরা ১৭·৫ ভাগে পরিণত হয়। তার পরবর্তী কালের জন্য যে পরিসংখ্যান আছে তা একটু গোলমেলে। ১৯৭১-৭২ সালের জন্য ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের পরিসংখ্যানকে মানলে বুঝতে হয় যে ভাগে-দেওয়া কৃষিজমির অনুপাত ১৯৬১-৬২ সাল থেকে বেড়ে আবার শতকরা ২১·৫ ভাগে পৌঁছেছিল। কিন্তু ১৯৭০সালে কৃষি জমি সংক্রান্ত একটি সেন্‌সাস্ করা হয়েছিল। সেই সেন্‌সাস্ অনুসারে ভাগে চাষ

করা কৃষি জমির পরিমাণ শতকরা ৮ ভাগে পরিণত হয়েছিল। এই সংখ্যাগুলিতে এতই অমিল যে তাদের কোনটাকেই খুব নির্ভরযোগ্য মনে করা যায় না। বস্তুত অনেকেই মনে করেন যে এ জাতীয় কোন পরিসংখ্যানই খুব নির্ভরযোগ্য হয় না। জমির মালিকেরা তাদের কতটা জমি আছে তা জানাতে চায় না—আইনের ভয়ে। একই ভয়ে কতটা জমি ভাগে দিয়েছে তাও জানাতে চায় না। ভাগীদাররাও মালিকের অসন্তোষের কারণ না হওয়ার জন্য অনেক সময় কত জমি ভাগে চাষ করছে তা চেপে যায়। এসব কথা সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা নিশ্চয় করে বলা যাবে যে ১৯৫৩-৫৪ সালে ভাগে-চাষ-করা জমির পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগের বেশি ছিল না। এবং এও বলা যাবে যে তার পরে যে সিকি শতাব্দী কেটে গেছে তার মধ্যে এর পরিমাণ কখনই বাড়েনি, নিশ্চয়ই কমেছে, যদিও কতটা কমেছে তা জোর করে বলা যায় না। কমেছে বলা যায় এই কারণে যে জমির মালিকেরা যে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করছে এবং সেই জমিতে নিজের পরিবারের শ্রম ব্যবহার করে এবং মুনিষ-মাহিন্দরের শ্রম ক্রয় করে এবং সেই শ্রম ব্যবহার করে ফসল ফলাচ্ছে তার ভুরিভুরি উদাহরণ বহুকাল যাবৎই এবং রাজ্যের প্রায় সব অঞ্চল থেকেই পাওয়া গেছে এবং যাচ্ছে। শতকরা ৩০ ভাগ বা তারও অনেক কম অংশ জমির উপর যে ব্যবস্থা কায়েম আছে তাকে নিশ্চয়ই কৃষি-ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ বলে বর্ণনা করা যায় না।

ভাগে-চাষ-করা জমির পরিমাণের আলোচনা করলাম। এবার ভাগীদারদের পরিমাণগত তথ্য কতটা পাওয়া যায় দেখা যাক। এখানে একটা মুশকিল এই যে ভাগীদার বা বর্গাদার কাদের বলা হবে? নিজের জমি একেবারে কিছুই নেই, চাষের সবটা জমিই ভাগে নেওয়া, শুধু এমন চাষীদেরই যদি বর্গাদার বা ভাগীদার বলা হয় তো তাদের সংখ্যা বেশ কমে গেছে। ১৯৫৪ ৫৫ সালে এইরকম ভূমিহীন ভাগীদারদের অংশ ছিল গ্রামীণ জনগণের শতকরা ১৬ ভাগ এবং তাদের পরিবার-সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ লক্ষ। এইরকম পরিবারের সংখ্যা ১৯৭১-৭২ সালে দাঁড়ায় মাত্র ১ লক্ষ এবং তারা গ্রামীণ জনগণের মাত্র শতকরা ২ ভাগে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু চাষীদের এক বড় অংশই চাষ করে এমন জোত যার এক অংশ জমি নিজস্ব এবং এক অংশ জমি ভাগে নেওয়া। এই রকম মিশ্র জোতের পরিমাণ ১৯৫৩ ৫৪ সালে ছিল শতকরা ২০ ভাগ এবং ১৯৭১-৭২ সালে এদের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে হয়েছিল শতকরা ৩১ ভাগ। কিন্তু এদের সকলকেই তো ভাগীদার শ্রেণীভুক্ত ভাবা যাবে না। কারণ এদের অনেকেরই বেশ অনেক

পরিমাণ জমি নিজস্ব মালিকানার। সামান্য কিছু নিজস্ব জমি আছে কিন্তু অধিকাংশ জমিই ভাগে নেওয়া, সেই রকম চাষীদেরও বর্গাদার শ্রেণীভুক্তই ভাবা উচিত। কিন্তু অনেক হিসাবনিকাশ না করে এই মিশ্র জোতের চাষীদের কতটা অংশকে বর্গাদার বলা উচিত তা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইটুকু দেখা যাচ্ছে যে মিশ্র জোত এবং অবিমিশ্র ভাগে নেওয়া জমির জোত এই উভয়ে মিলিয়ে শতকরা ৩২ ভাগের বেশি হয় না। সুতরাং এই হিসাব থেকেও দেখা যাচ্ছে যে বর্গাদারি প্রথাটাই পশ্চিমবঙ্গে কৃষির মূল স্তম্ভ তা বলা বোধহয় ঠিক নয়।

এবার আমরা ভূমির বন্টনের দিকে আমাদের মনোযোগ দেব। ১৯৫৩-৫৪ সাল এবং ১৯৭১-৭২ সাল—এর মধ্যে এই বন্টনব্যবস্থায় একটা খুব বড় রকম পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামীণ জনগণের মধ্যে সম্পূর্ণ ভূমিহীনের অংশ বেশ কমে গেছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই অংশ ছিল শতকরা ২০·৫ ভাগ আর ১৯৭১-৭২ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১০·৮ ভাগে। সম্পূর্ণ ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ঐ প্রথম তারিখে ছিল সাড়ে আট লক্ষের কিছু বেশি। পরবর্তী তারিখটিতে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে সাড়ে পাঁচ লক্ষের কিছু বেশি। তাহলে বলতে হবে কিছু ভূমিহীন পরিবার ভূমির অধিকারী হয়েছে। কিন্তু ভূমিহীন যারা ভূমি পেয়েছে —সে যে উপায়েই পেয়ে থাকুক—তা যে খুব যৎসামান্য পরিমাণে পেয়েছে তার প্রমাণ ক্ষুদ্র জমির মালিকদের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্যে। আড়াই একরেরও কম জমির মালিক পরিবারের সংখ্যা ছিল ১৯৫৩-৫৪ সালে সাড়ে বাইশ লক্ষ এবং সেটা ১৯৭১-৭২ সালে বেড়ে হয় সাড়ে সাঁইত্রিশ লক্ষ। এখানে স্মর্তব্য যেসব রকমের গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা এই দুইটি সময়বিন্দুর মধ্যে বেড়েছিল মাত্র সাড়ে বারো লক্ষ—সাড়ে বেয়াল্লিশ লক্ষের একটু বেশির থেকে সাড়ে পঞ্চান্ন লক্ষের একটু কম। এই ক্ষুদ্র জমির মালিকদের অংশ আগে ছিল শতকরা ৫৩ ভাগ, পরে হয় শতকরা ৬৭ ভাগ। সুতরাং একদিকে যেমন সম্পূর্ণ ভূমিহীনদের সংখ্যা কমেছে অপর দিকে জমির মালিকদের ভিতরে বন্টন-বৈষম্য কমেনি বরং বেড়েছে। কিন্তু ভূমিহীনরা সামান্য হলেও যে কিছু জমি জমা পেয়েছে, তাতে দরিদ্র জনগণের কতটা উপকার হয়েছে বা হয়নি তা বিবেচনা করতে গেলে অন্য একটি বিষয়ের দিকে নজর দিতে হয়। একদিকে ভূমিহীনদের সংখ্যা কমেছে বটে, কিন্তু অপরদিকে কৃষির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত পরিবারদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এইরকম পরিবারের সংখ্যা ১৯৫৩-৫৪ সালে ছিল প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ, ১৯৭১-৭২ সালে সেটা গিয়ে দাঁড়ায় সতের লক্ষে। অনুপাত হিসাব করলে

প্রথম সংখ্যা ছিল গ্রামীণ জনগণের শতকরা ২৪ ভাগ, দ্বিতীয়টি শতকরা ৩১ ভাগ। এর থেকে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আনুমানিক সিদ্ধান্ত মনে হয় অনিবার্য হয়ে পড়ে। তা এই যে, যে পরিমাণ ভূমিহীন পরিবার ভূমির অধিকারী হয়েছে—তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় ভূমির অধিকারী পরিবারেরা নিজেদের জমিতে চাষ না করে আয়ের অন্য ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কেন করে নিয়েছে? এই প্রশ্নের আনুমানিক উত্তর, তারা করতে বাধ্য হয়েছে। কেন বাধ্য হয়েছে? আনুমানিক উত্তর, তারা যে যৎসামান্য জমির অধিকারী তাতে ভালো করে চাষ করা যায় না। তাতে চাষ করে যা খাদ্য উৎপাদন করা যায় তাতে পরিবারের পেট ভরানো যায় না। তাদের জমি যদি তারা নিজেরা চাষ না করে তো সেই জমির কী হল? আনুমানিক উত্তর, ঐ জমি তারা অপর চাষীদের ভাগে দিয়ে দিয়েছে। কাদের দিয়েছে? আনুমানিক উত্তর, অধিকতর স্বচ্ছল চাষীদের। তারা নিজেরা কী করছে? আনুমানিক উত্তর হয়, তারা ক্ষেতমজুর হয়ে গেছে, নয় সাধারণভাবে মজুরিবৃত্তি অবলম্বন করছে, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা শহর অঞ্চলে কাজ সংগ্রহ করে নিয়েছে। তাই যদি ঘটে থাকে তাহলে বলতে হবে ভূমিহীনদের কিছু ভূমি পাওয়া সত্ত্বেও তাদের অর্থনৈতিক সংকট এমনই তীব্র হয়েছিল চাষবাস তুলে দিয়ে তারা মজুর শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে।

আগে যারা চাষী ছিল তাদের অনেকে ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে—তার সমর্থন পাওয়া যায় ক্ষেতমজুর সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে। ১৯৬১ সালে ক্ষেতমজুরেরা ছিল পশ্চিমবঙ্গের সক্ষম ও কর্মে নিযুক্ত জনগণের শতকরা ১৫ ভাগ। ১৯৭১ সালে এই অনুপাত বেড়ে হয়েছে—শতকরা ২৫ ভাগ। এই ক্ষেতমজুরেরা অবশ্য সকলেই যে ভূমিহীন তা অবশ্য নয়। ক্ষেতমজুরিই যাদের আয়ের মূল ভিত্তি সেন্সাসে তাদের ক্ষেতমজুর বলে ধরা হয়। ক্ষেতমজুরদের এই সংখ্যা বৃদ্ধি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৭১ সালে এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সাড়ে বত্রিশ লক্ষ। চাষীদের সংখ্যা ঐ একই সময়ে ছিল চল্লিশ লক্ষ। এর আগে দেখেছি ভূমিহীন বর্গাদার পরিবারদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র এক লক্ষে। এও দেখেছিলাম যেসব রকমের চাষী, যাদের কিছু মাত্র জমিও ভাগে নেওয়া আছে,—তাদের পরিমাণ চাষীদের মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগ ছিল। সুতরাং চল্লিশ লক্ষ চাষীদের মধ্যে এই জাতীয় চাষীদের সংখ্যা ছিল চোদ্দ লক্ষের মত। এদের মধ্যে দরিদ্র চাষী যদি দশ লক্ষ ধরে নেওয়া যায় তো এই দশ লক্ষকেই বর্গাদার শ্রেণীভুক্ত ধরলে আমরা দেখি যে সংখ্যায় এরা ভূমিহীন কৃষকদের এক-তৃতীয়াংশ

মাত্র। এই ছিল আমাদের যুক্তি বর্গাদারির চেয়ে ক্ষেতমজুরিকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার।

এবার একটু ক্ষেতমজুরদের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। আমাদের সরকারী পরিসংখ্যানে ক্ষেতমজুরদের দুই ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়। প্রথম শ্রেণীর শ্রমিকেরা সচরাচর বাৎসরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এদের পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলে মাহিন্দর বলা হয়। আরও অনেক কিছু নাম বিভিন্ন অঞ্চলে আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর যে শ্রমিক তারা সচরাচর দৈনিক কাজ ও দৈনিক পারিশ্রমিকের চুক্তিতে কাজ করে। এদেরও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। মুনিষ, জোন, ছুটো—এরকম নানাবিধ এদের নাম। এই দুই শ্রেণীর শ্রমিক অবশ্যই আমাদের আছে। কিন্তু আরও যে নানান রকমের ব্যবস্থায় নানান রকমের শর্তে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজের সম্পর্ক হয়, এই বিষয়টা সরকারী তথ্য থেকে বাদ পড়ে যায়। সরকারী তথ্যে অবশ্য অন্য এক শ্রেণীর শ্রমিকদের কথা বলা হয়ে থাকে যাদের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত নগণ্য বলে মনে হয়। ইংরেজীতে এদের বলা হয় 'বণ্ডেড লেবার'। এর কোন বাংলা প্রতিশব্দ আছে কি না জানি না। এরা প্রায় দাসপর্যায়ভুক্ত। এরা কখনও সামান্য পারিশ্রমিক পায়, কখনও তাও পায় না, শুধু পরিবারের ভরণপোষণ পায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, খুব পশ্চাৎপদ এলাকায়, কোন কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা উপজাতি-ভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে এই-জাতীয় শ্রমিকদের অস্তিত্ব অবশ্যই পাওয়া যেত। ভারতবর্ষের সর্বত্রই এদের সংখ্যা খুব কমে গেছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এদের পাওয়া যায় না বললেই হয়।

সরকারী নথিপত্রে এই যে তিন প্রকারের ক্ষেতমজুরের কথা বলা হয়, তাদের থেকে ভিন্ন অনেক ধরনের চুক্তিতে শ্রমিকেরা মালিকদের সঙ্গে আবদ্ধ হয়। একদিকে বাৎসরিক চুক্তি, যেই চুক্তি অনুসারে শ্রমিকের নিজ মালিক ছাড়া আর কোন মালিকের সঙ্গে কাজ করার স্বাধীনতা নেই—এদের আমরা সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত শ্রমিক বলব। অপর প্রান্তে দৈনিক চুক্তির দিনমজুর—যারা আজ একজন কাল আর-একজন, এইভাবে বিভিন্ন মালিকের সঙ্গে কাজ করে। এই দুই প্রান্তসীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলে নানারকমের শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক পাওয়া যায় যা কিনা শ্রমিকদের মালিকের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্তও করে না, আবার তারা যে বিশেষ কোন মালিকের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, তাও নয়। এদের আমরা আংশিকভাবে যুক্ত শ্রমিক বলব। (নিতান্তই যারা দিনমজুর তাদের বলব সম্পূর্ণ

ভাবে অযুক্ত শ্রমিক।) এই আংশিক ভাবে যুক্ত শ্রমিকদের সম্পর্কটা মালিকদের সঙ্গে কী রকম হয় তার নমুনা দুই-একটা নিয়ে দেখা যাক। কোন কোন অঞ্চলে 'বাঁধা মুনিষ' নামে একধরনের শ্রমিক আছে যাদের মালিকের সঙ্গে শর্ত এই যে যেদিনই মালিক এইরকম একজন শ্রমিককে ডাকবে সেদিনই সে ওই মালিকের সঙ্গে কাজ করতে বাধ্য থাকবে। এবং ঐ দিনের শ্রমের জন্য চলতি হারেই মজুরি পাবে খোরাকও পাবে। কিন্তু যেদিন মালিক কাজের জন্য ডাকবে না সেই দিন সে মজুরি পাবে না, খোরাকিও পাবে না এবং অন্য যে কোন মালিকের হয়ে কাজ করার স্বাধীনতা তার থাকবে। আবার অনেক জায়গায় এমন চুক্তি পাওয়া যায় যা অনুসারে শ্রমিক কোন বিশেষ মালিকের জন্য বিশেষ বিশেষ কোন সময় কাজ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। যেমন, বাঁকুড়ায় যাদের 'গতানে' বলে বা জলপাইগুড়িতে যাদের মাসারি' বলে তারা এই ভাবে কখনও চাষের সময় দুই মাস কখনও ফসল কাটার সময় দুই মাস, কখনও চাষ থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য নির্দিষ্ট মাসিক বেতনে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। অনেক সময়ই এরা খানিকটা পারিশ্রমিক মালিকের কাছ থেকে অগ্রিম হিসাবে নিয়ে থাকে।

এই যে শ্রমিকদের মালিকের সঙ্গে আংশিকভাবে যুক্ত হওয়া, তার পিছনে ধার-দেনার একটা ভূমিকা প্রায়ই থাকে। ক্ষেতমজুরেরা সকলেই দরিদ্র, তারা দিন আনে দিন খায়। যখন তাদের কাজ থাকে না তখন কৃষির বাইরে অন্যত্র কাজ না জুটলে তারা বাধ্য হয়েই ধনী কৃষকের কাছ থেকে ধার-দেনা করে। এবং ধার দেনা শোধ দেওয়ার অন্য কোন উপায়ই এই ক্ষেতমজুরদের নেই। তাদের ধার শোধ দেওয়ার একমাত্র উপায় খেটে শোধ দেওয়া। সাধারণ দিনমজুরদের এই ভাবে অল্পস্বল্প কিছু ধার নিয়ে খেটে শোধ দেওয়ার প্রথাকে অনেক অঞ্চলে 'দাদন' প্রথা বলা হয়। ধার-দেনা ছাড়া অন্য এক উপায়েও মজুরেরা এই-রকম আংশিক যুক্ত অবস্থায় পড়তে পারে। একটি চালু পদ্ধতি হচ্ছে মালিকের এই-জাতীয় কোন শ্রমিককে দু-তিন বিঘার সামান্য কিছু জমি 'অ্যালট' (allot) করে দেওয়া। শর্তটি হয় এই যে ওই সামান্য জমিটুকুতে মালিকের হাল লাঙল ব্যবহার করে যা ফসল শ্রমিক ফলাতে পারবে তার সবটাই বা কোন একটা অংশ সে তার খোরাকের জন্য নিতে পারবে। পরিবর্তে মালিকের যে-কোন প্রয়োজনে যে-কোন সময় হাজিরা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এই-জাতীয় শ্রমিকদের লাগাড়ে' বলে। আংশিকভাবে যুক্ত যে শ্রমিকদের কথা বলছি তারা

অনেক সময়েই বাজারে চলতি হারের চেয়ে কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সব সময়ে নয়। অনেক সময়েই এরা বাজারে চলতি হারেই মজুরি পায়।

এই যে মালিক ও শ্রমিকের সঙ্গে সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ নিয়ে আলোচনা করছি তার মধ্যে আমাদের মূল বক্তব্য এই যে নানান ভাবেই এই শ্রমিকেরা মালিকের উপর অত্যন্ত অসহায় ভাবে নির্ভরশীল। যে কোন সমাজেই যদি কোন গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা অত্যধিক পরিমাণে দরিদ্র হয় তো তারা অত্যন্ত অসহায় ভাবেই সমাজে ধনী শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। সেই নির্ভরশীলতা কমতে পারে যদি সেই শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে মালিকদের সঙ্গে দর-কষাকষি করার স্পর্ধা ও ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। আমাদের দেশে ক্ষেতমজুরেরা অধিকাংশ এলাকাতেই এইরকম ভাবে সংগঠিত হতে পারেনি, শক্তি অর্জন করতেও পারেনি। প্রায় একক ভাবে এদের এক-একজনকে তাদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন মালিকের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়।

আমাদের ক্ষেতমজুরদের এক বৈশিষ্ট্য এই যে তাদের মধ্যেও অনেক রকমের বিভাগ রয়েছে। সবাই সব কাজ করবে না। বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকদের ডাক পড়ে। অনেক কাজ আছে যা পুরুষেরা করবে না, মেয়েরা করবে। অনেক কাজ আছে যা করার জন্য বিশেষ জাতি, উপজাতি বা আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকের ডাক পড়বে। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে আমাদের ক্ষেতমজুরেরা শ্রমপণ্যের বিক্রেতায় পরিণত হয়নি। মার্কস-এর মতে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষণ এই যে তাতে শ্রমের বিনিময় হয় অন্য যে কোন পণ্যের মত। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দর-কষাকষি ও টাকার আদানপ্রদান ছাড়া আর কোন প্রকার সম্পর্ক থাকে না। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের কৃষিব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক আখ্যা দেওয়ার যুক্তি খুব নেই। কেননা অধিকাংশ শ্রমই তো চাষীদের পরিবারের লোকেদের শ্রম, সেই শ্রম মোটেই কোন পণ্যের আকার নেয়নি। আর মজুরির বিনিময়ে যে শ্রম কেনা হয় তাও পুরোপুরিভাবে পণ্যের আকার নেয়নি। কেননা একটু আগেই যা বললাম, সব মজুর সব রকমের কাজ করে না। মজুরির বিনিময়েও না। টাকা ফেললেই যা কেনা যায় তা পণ্য। সেই অর্থে এই মজুরদের শ্রমকে টাকা ফেললেই পাওয়া যায় না।

আমরা এবার আমাদের কৃষিব্যবস্থায় ধারের কারবার যে ভূমিকা পালন করে তার কথা আলোচনা করব। কৃষিজীবীদের ধার-দেনার প্রয়োজন মেটাবার

জন্ত যে সব ব্যবস্থা আছে তাদের মধ্যে কিছু কাল আগে পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত মহাজনের তাদের কারবার। এখন সেই স্থান অধিকার করে ঋণদাতা জোতদারেরা। ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ইত্যাদি হাল আমলে যে সব নূতন আয়োজন করা হয়েছে তারা এখনও এই প্রয়োজনের কম অংশই মেটাতে পারে। এদের দেওয়া ঋণ শুধুমাত্র ধনী কৃষকেরা পায় এবং তাও মূলত কৃষির ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। বাদবাকী কৃষক এবং ক্ষেতমজুরেরা ধার-দেনার প্রয়োজনের জন্ত জোতদারদের উপরই নির্ভরশীল। এই ঋণদাতা জোতদারেরা তাদের সুদের কারবার মহাজনেরা যে ভাবে করে ঠিক সেই ভাবে করে না। মহাজনেরা ধার দেয় বন্ধক নিয়ে এবং চড়া হারে সুদ নিয়ে। টাকায় ধার দিলে মাসিক সুদের হার শতকরা ১০ ভাগ বা ১২ ভাগ বা ১৫ ভাগ হওয়া খুবই সাধারণ। ধানে ধার দেওয়া মহাজনদের মধ্যে কম প্রচলিত। ধানে নিয়ে ধানে শোধ দিতে হয—এই ধরনের ধারে সুদ বা নেওয়া হয় তা অতি সাংঘাতিক রকমের। দেড়া তো খুবই সাধারণ—এই রকমের ধারে একমন ধানের শোধ হয় দেড়মন ধানে। একমন ধান নিযে দুমন শোধ দিতে হয়, তাও খুব প্রচলিত। এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে এই যে একমনের উপর আধমন বা আর একমন সুদ হিসাবে নেওযা সেটা সময-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ শোধ দিতে হবে অঘ্রান পৌষ মাসে ফসল কাটার ঠিক পরে, কিন্তু ধার হয়ত নেওযা হয়েছে ভাদ্র মাসে বা আশ্বিন মাসে বা কার্তিক মাসে। যখনই নেওয়া হয়ে থাকুক সুদ ঐ একই রকম। সুদ নেওযার আরও অনেক রকম ফের আছে। যেমন অনেক সময় একশ টাকা ধার নিলে কথা বলা থাকে, তার শোধ দিতে হবে তিন বা ঐ রকম নির্দিষ্ট কোন সংখ্যক মন ধানে।

জোতদারেরা যখন মূলত সুদের জন্যই ধার-দেনা দেয় তখন তারাও এই রকম চড়া হারেই সুদ নিয়ে থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অনেক জোতদারই ধার-দেনা দেয় মূলত সুদের উদ্দেশ্যে নয়, অন্যান্য অনেক কারণে এবং অনেক সময়ই জোতদারেরা বিনা সুদেও ধার দেয়। অনেক জোতদার যে কোন সাধারণ গ্রামবাসীকেই ধার-দেনা দেয় না। ধার-দেনা দেওয়াটাকে সীমিত রাখে নিজের ভাগীদারদের মধ্যে বা নিজের সঙ্গে আংশিক বা পূর্ণ ভাবে যুক্ত মুনিষ-মাহিন্দারদের মধ্যে। অনেক সময়েই এই রকম জোতদারেরা ভাগীদারদের উৎপাদনে সাহায্য করার জন্ত ধার দেয় এবং সে ধারটা টাকায় দেয় না, হয়ত বীজটা কিনে দিল বা সারটা কিনে দিল, এই ভাবে দেয়। এই ধরনের নিজেদের লোকের মধ্যে

উৎপাদনের জন্য বা খোরাকের জন্য ধার দিয়ে অনেক সময় জোতদারেরা সেই ধারে কোন সুদ নেয় না। এটা আপাতদৃষ্টিতে যতটা আশ্চর্য সত্যিই তেমন কিছু নয়, কেননা এই ধরনের জোতদারেরা এই ভাবে তাদের ভাগীদার ও মুনিষ-মাহিন্দরদের নিজেদের উপর নির্ভরশীল করিয়ে রেখে, তাদের অক্টোপাসের মত বাহুর বন্ধনে সমস্ত পল্লীসমাজকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে রেখে নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী তার উপর শাসন ও শোষণ চালাতে পারে। যে অবস্থায় সুদ না নিয়েই দরিদ্র গ্রামবাসীদের অধিকতর বশংবদ করে রাখা যায় সে অবস্থায় তারা অনায়াসে সুদ ছেড়ে দিতে পারে। তাতে তাদের কোন লোকসান হয় না। কেননা পুরো গ্রামের অর্থনীতিটাকে সম্পূর্ণভাবে নিজ কব্জায় আনতে পারলে যে পরিমাণ শোষণ চালান সম্ভব, অর্থাৎ দরিদ্র চাষী ও শ্রমজীবীদের প্রাণে বাঁচিয়ে রেখে এবং কর্মক্ষম রেখে যতটা উদ্বৃত্ত আদায় করে নেওয়া সম্ভব ততটাই তারা করে নেবে, সে যে উপায়েই হোক। আমরা যে সমীক্ষার কথা (২) আগে বলেছি তাতে দেখা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের শতকরা ৩০ ভাগে মহাজনেরা সুদের কারবার করে, কিন্তু জোতদারেরা ধার-দেনা দেয় শতকরা ৯৬ ভাগে। এও দেখা গেছে যে এই সব গ্রামের ভাগীদাররা জমির মালিকের কাছ থেকে উৎপাদনের জন্য ধার পায় শতকরা ৪৪ ভাগ গ্রামে এবং সেই ধার বিনা সুদে পায় শতকরা ২৩ ভাগ গ্রামে। ভাগীদারেরা খোরাকের জন্য জমির মালিকের কাছ থেকে ধার পায় শতকরা ৫১ ভাগ গ্রামে এবং এই ধরনের ধার সুদ না দিয়ে পায় শতকরা ২৩ ভাগ গ্রামে। মাহিন্দরদের ধার দেওয়া এবং বিনাসুদে ধার দেওয়ার প্রচলন ভাগীদারদের ধার-দেওয়ার প্রচলনের চেয়ে বেশি। একই সমীক্ষা অনুসারে, মাহিন্দরেরা তাদের মালিকের কাছ থেকে খোরাকি ধার পায় শতকরা ৬২ ভাগ গ্রামে এবং শতকরা ৫৩ ভাগ গ্রামে সেই ধার পায় বিনাসুদে। একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য না করলে গুরুতর ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকবে। তা এই যে পশ্চিমবঙ্গের এক বড় অংশের গ্রামে ভাগীদাররা বা মাহিন্দরেরা তাদের জমির মালিক বা প্রভুর কাছ থেকে কোন ধারই পায় না। এবং এই সব গ্রামে এই দরিদ্র চাষী ও ক্ষেতমজুরদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। জোতদারেরা তাদের ধার-দেনা দেয় না মানে তারা কোন ধার-দেনাই পায় না। কারণ মহাজনের কাছ থেকে বা মুদির দোকান থেকে এই নিঃসম্বল ব্যক্তিদের, যাদের বন্ধক হিসাবে রাখবার কিছু নেই, তাদের ধার-দেনা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। মাঠে যখন কাজ থাকে না সেই রকম সময়ে এরা আধপেটা খেয়ে কোন রকমে চালায়। আধপেটাই বা

কী করে খায় তাও এক রহস্য। এমন না যে সব জায়গায় মুটে-মজুরের কাজ পাওয়া যায়। এমন না যে জোতদারদের বাড়িতে বাড়ির চালে খড় দেওয়া বা পুকুর কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া, এইজাতীয় যথেষ্ট কাজ পাওয়া যায়। এই সময়ে এই ধরনের গরিব লোকেদের অনেক সময়েই প্রাণ ধারণ করতে হয় জঙ্গল থেকে বুনো ফলমূল সংগ্রহ করে, বিল ছেঁচে মাছ এমনকি শামুক গুগলি প্রভৃতি সংগ্রহ করে তাই খেয়ে।

এই যে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার বর্ণনা করা হল তাতে ভূমিসংস্কারের মারফত কতটা পরিবর্তন আনা গেছে? স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের প্রথম যে ভূমিসংস্কার যার দ্বারা জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করা হয়েছিল, সেই সংস্কার অবশ্যই কৃষিব্যবস্থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত করেছে। বস্তুত এখন যে ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তার উদ্ভবই হয়েছে ঐ সংস্কার থেকে। জমিদার-শ্রেণীর উচ্ছেদ যদি না হত তো এখন গ্রামসমাজকে শাসন করছে যে জোতদার শ্রেণী, তারা আকারে ও আয়তনে কখনই এই পরিমাণ প্রভাব অর্জন করতে পারত না। জমিদারি উচ্ছেদের পরে যে পঁচিশ বৎসর কেটে গেছে তার মধ্যে একের পর এক ভূমিসংস্কার আইন পাস করা হয়েছে। কিন্তু এই সব আইনের ফলে কৃষিব্যবস্থায় যে অদলবদল খুব একটা হয়েছে তা নয়। যেমন বর্গাদার-ভাগীদারদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য অনেক আইনগত চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তাদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে বলে জানা যায় না। বর্গাদারদের চাষ-করা জমির উপর মালিকানা দেওয়া না গেলেও তাদের যাতে যথেচ্ছ উচ্ছেদ না করে দেওয়া যায় তার জন্য অনেক আইন করা হয়েছে। কিন্তু উচ্ছেদ বন্ধ করা যায়নি। গত দশ বৎসর যে যে অঞ্চলে মালিকদের মনে হয়েছে ভাগে চাষ না করিয়ে মুনিষ-মাহিন্দর দিয়ে চাষ করালে লাভ বেশি হবে অথবা যেখানেই মালিকরা মনে করেছে ভাগীদারদের হাতে জমি হস্তান্তরিত হয়ে যাবার সম্ভবনা রয়েছে—সেখানেই তারা ব্যাপক হারে ভাগীদারদের উচ্ছেদ করে দিয়েছে। এই উচ্ছেদ ঠেকানো যেখানে গেছে—তা কখনই আইন-আদালতের সাহায্যে হয়নি, হয়েছে কৃষকদের সংগ্রামের দরুন। মালিকের ভাগের অংশ কমিয়ে বর্গাদারদের ভাগের অংশ বাড়ানোর চেষ্টাও আইন দিয়ে অনেক করা হয়েছে। সেই ১৯৫৫ সালে আইন করা হয়েছিল যে বর্গাদারদের ভাগ হবে শতকরা ৬০ ভাগ; ১৯৭০ সালে আইন করা হয় যে সেই ভাগ হবে শতকরা ৭৫ ভাগ। কিন্তু আজ অবধি শতকরা ৭৫ ভাগ পাচ্ছে এমন বর্গাদারের কথা খুবই কম শোনা গেছে। শতকরা ৬০ ভাগ কোন কোন

ক্ষেত্রে পায় বটে, কিন্তু সে কোন আইনের জোরে নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আধাআধি ভাগের পরিবর্তে অন্য অনুপাতে ভাগ হওয়ার প্রথা অনেক কাল যাবৎই প্রচলিত আছে।

ভূমিসংস্কারগত আইনের অন্য এক প্রধান লক্ষ্য আগাগোড়াই থেকে গেছে জমির মালিকানার উপর সিলিং বেঁধে দেওয়া এবং সিলিং-এর উপরের যে জমি তাকে বাজেয়াপ্ত করে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বিতরণ করা। এর মধ্যে যে পরিকল্পনা তা হল এই উপায়ে ভূমিহীন শ্রমিকদের ক্ষুদ্র চাষীতে পরিণত করে তাদের চূড়ান্ত দারিদ্র্য অবস্থার অপনয়ন করা। কিন্তু এই উপায়েও যে প্রায় কিছুই করা হয়ে ওঠেনি তার সাক্ষ্যও সরকারী নথিপত্র থেকেই পাওয়া যায়। সরকারের প্রচারিত তথ্য ও সংখ্যা থেকে জানা যায় যে গোটা পশ্চিমবঙ্গের সিলিং-এর উপরের থেকে যে পরিমাণ জমি বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারত তা মোট সাড়ে ষোল লক্ষ একর। এদের মধ্যে সাড়ে দশ লক্ষ একর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সাড়ে ছয় লক্ষ একর মত ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণও করা হয়েছে। (আগে দেখেছি যে ক্ষুদ্র চাষীর সংখ্যা এবং অংশ উভয়ই খুব বেড়ে গেছে, আর ভূমিহীন ব্যক্তিদের সংখ্যা কমে গেছে। আংশিক ভাবে এই ঘটনা ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বিতরণের জন্য হয়েছে মনে হতে পারে।) সরকারী প্রচার অনুসারেই কিন্তু এই রাজ্যে ভূমিহীন এবং অতি সামান্য ভূমির অধিকারী মজুর ও দরিদ্র চাষী পরিবারের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ। সুতরাং খুব পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাচ্ছে যে ক্ষেতমজুরদের ক্ষুদ্র চাষীতে পরিণত করার পরিকল্পনা সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

আমাদের মতে, ভূমি বিতরণ করে দরিদ্র চাষী ও ক্ষেতমজুরের দারিদ্র্য ও কর্মহীনতার সমস্যার সমাধান হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। যৌথ কৃষি এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। এই যৌথ কৃষির জন্য যে জমি লাগবে সেই জমি যাদের বেশি জমি আছে তাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র চাষীদের মিলিত সংগ্রামের মারফত। আইন পাস করে বিশেষ কিছু হবে না। আইন তো অনেক পাস করা হয়েছে। কিন্তু আইন ফাঁকি দেওয়ার সব রকমের ফন্দিফিকির জোতদারদের জানা। আর আইনের প্রয়োগ করবে যারা অর্থাৎ স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের কর্তাব্যক্তিরাও সামাজিক ভাবে জোতদারদের ভাই-বেরাদর স্বজাতীয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আইনের সাহায্যে কি কোন পরিবর্তনই আসে না? তাহলে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হল কী

করে? আমাদের উত্তর, আইনের প্রয়োগ তখনই সফল হতে পারে যখন তা প্রয়োগ করা হয় এমন এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যা শাসক শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। জমিদারি যখন উচ্ছেদ করা হয়েছিল তখন জমিদারেরা শ্রেণী হিসাবে পল্লীসমাজের উপর কর্তৃত্বের অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সেই কর্তৃত্বের আসন তখন থেকেই উত্তরোত্তর পোক্ত ভাবে দখল করে নিয়েছে জোতদার-শ্রেণী। এই জোতদার-শ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন আইনই ফলপ্রসূ হতে পারে না। কারণ আইন প্রয়োগ করবে যে রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রযন্ত্রটা পুরোপুরি ভাবেই করায়ত্ত যে শ্রেণীগুলির তাদের মধ্যে এই জোতদার শ্রেণী অন্যতম।

---

1. A. K. Dey, Green Revolution Contrasts : Rice & Wheat. Economic & Political Weekly, 4 June, 1977.
2. Pranab Bardhan & Ashok Rudra, Interchange of Land Labour & Credit Relations, Economic & Political Weekly, Annual No. February, 1978.

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের বিবর্তন

'অন্য অর্থ' গোষ্ঠী



গত তিন দশকের পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের অবস্থা, চরিত্র এবং গতি নিয়ে আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়। যে কোন দেশ বা তার যে কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক চেহারা ও চরিত্র সেই দেশ বা অঞ্চলের শিল্পায়নের উপর নির্ভরশীল। কোন দেশের অর্থনীতিকে যেমন সে দেশের শিল্পায়ন ছাড়া বোঝা যায় না, সেদেশের শিল্পায়নও তেমনি সেদেশেব সামগ্রিক অর্থনীতি ছাড়া বোঝা যায় না। কিন্তু এ প্রবন্ধের পরিসর শিল্পায়নের আলোচনায় সীমাবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রনৈতিক ও ভৌগোলিক সম্পর্কে ভারত রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন তাই ভারতের শিল্পায়নের অংশবিশেষ। এবং বৃহত্তর অর্থে, অর্থনৈতিক পৃথিবীর শিল্পায়নের গতিপ্রকৃতির সঙ্গেও সম্পর্কিত। কিন্তু, এ প্রবন্ধে বিশ্বের শিল্পায়ন ও ভারতের শিল্পায়নের সামগ্রিক আলোচনা অনুপস্থিত। এদের উপস্থাপনা যেটুকুই, সেখানে তা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের কোন এক বিশেষ প্রকৃতিকে বুঝতে সাহায্য করে। আরেকটা দিক [illegible] এ প্রবন্ধ [illegible]। [illegible] প্রচলিত অর্থে

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়নি। বরং এখানে চেষ্টা করা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি অঞ্চলের শিল্পায়ন যে বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি লাভ করে, তাকে ধরার এবং বোঝার।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পায়নের শুরু। স্বদেশী কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কাঠামোর উপরে এসে গেল সাম্রাজ্যবাদী শিল্পবিনিয়োগ। মূলত ভারতের কাঁচা মাল আর শস্তা শ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সেই শিল্পের বাজার ভারত ছাড়িয়ে বাইরে। কিন্তু এই শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতেই জন্ম নিয়েছে ভারতীয় শিল্পপতি। কোন কোন ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা স্বাধীন। কোন কোন ক্ষেত্রে তার প্রকল্প সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর। রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন ভারতের শিল্পায়নের গতি-প্রকৃতিও পূর্ববর্তী কালের ধারা বেয়ে এগিয়ে চলে। বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন শুধু উপনিবেশ থেকে নয়া-উপনিবেশে উত্তরণে। এখানেও ভারতের শিল্পায়নে স্বাধীন এবং সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর ভারতীয় শিল্পপতি, সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিনিয়োগ, সাবেকী ও উন্নত আধুনিক শিল্প, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের সহাবস্থান।

ঔপনিবেশিক ও নয়া-ঔপনিবেশিক শিল্প-অর্থনীতির কাঠামো ভারতে শিল্পায়নের যে প্রকৃতি গড়ে তুলল, তাতে তার গতি হল অবরুদ্ধ। পরিপূর্ণতার সম্ভাবনার পরিবর্তে এল বন্ধ্যাত্ব।

ভারতের শিল্পায়নের অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের চরিত্রও অনুরূপ। যদিও তার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও আছে ভিন্নতর ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার জন্য। এ প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য দিক এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্দেশ করা।

আলোচনাটি কয়েক ভাগে বিভক্ত : প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে শিল্পের অবস্থান ও গুরুত্বকে বোঝার চেষ্টা হয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকাঠামোর বিন্যাসটা দেখানো হয়েছে। সেখানে সাবেকী ও আধুনিক, অসংগঠিত ও সংগঠিত শিল্পের আনুপাতিক অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। এই শিল্পবিন্যাসের পটভূমিতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে বন্ধ্যাত্বের আকার ও চরিত্রকে প্রকাশ করা হয়েছে, এবং, তার কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে —প্রথমে ভারতের সামগ্রিক শিল্পায়নে বন্ধ্যাত্বের প্রেক্ষাপটে, এবং, দ্বিতীয়ত ও প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে। এই প্রসঙ্গে

বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে কয়েকটি শিল্প, এবং শেষে, আমরা এদেশের মতো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শিল্পায়নের বন্ধ্যাত্বের সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছি।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য প্রথমে জানা দরকার এ রাজ্যের অর্থনীতির সামগ্রিক চেহারাটা কী-রকম, আর তার পরিবর্তনের ধারাটাই বা কেমন। সামগ্রিকতার বিচারে আমরা মূলত ব্যবহার করব জনসংখ্যার পেশাগত শ্রেণীবিন্যাস এবং বিভিন্ন খাতে অনুমিত আয়। গত তিন দশকের পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টির পেশাগত শ্রেণীবিন্যাস (সারণি ১'১) নিয়ে

সারণি ১'১। পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টির পেশাগত শ্রেণীবিন্যাস (লক্ষের হিসাবে)

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১
১। মোট শ্রমজীবী	৭৯	১১৬	১২৩
(ক) চাষী	৩৭	৫৪	৩৯
(খ) কৃষি শ্রমিক	৩৭	১৮	৩২
(গ) পশু, বন, মৎস্য ও শিকার নির্ভর শ্রমিক	৩	—	৩
(ঘ) খনি ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিক	১	৬	১
(ঙ) যন্ত্রশিল্প শ্রমিক	১২	১৮	১৭
(ঙ১) ঘরোয়া শিল্প	—	৫	৩
(ঙ২) অন্যান্য	—	১৩	১৪
(চ) নির্মাণ কার্য	১'৫*	২	১
(ছ) ব্যবসা-বাণিজ্য	৮	৯	৯
(জ) পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৩	৪	৫
(ঝ) অন্যান্য শ্রমজীবী	১৩'৫	১৫	১৩
২। শ্রমবহির্ভূত জনসমষ্টি	১৬৯	২৩৩	৩১৯
মোট	২৪৮	৩৪৯	৪৪৩

টীকা: *উপযোগ কার্যাদি সমেত

সূত্র: সেন্সাস অব ইণ্ডিয়া ১৯৬১-১৯৭১

আমরা দেখতে পাই, ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩২ শতাংশ শ্রমজীবী। [এ ক্ষেত্রে অবশ্য এ রকম হতেই পারে যে সুস্থ ও কর্মক্ষম জনসংখ্যার শতাংশ হিসেবে তা এত কম নয়। শুধু সাধারণ একটা ধারণা এর থেকে পাওয়া যায়।] মোট শ্রমজীবী জনসংখ্যার পেশাবিভাগ থেকে পাওয়া যায়—তাদের প্রায় ৫১ শতাংশ কৃষিনির্ভর, ২৭ শতাংশের

মধ্যে শিল্পনির্ভর, আর বাকী ৩০ শতাংশ অর্থনীতির তৃতীয় বিভাগের ওপর নির্ভরশীল। [মোকতীয় অর্থনৈতিক কাজকর্মকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে পড়ে কৃষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদি; দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে সবরকমের শিল্পোৎপাদন, বাদবাকী সব অর্থাৎ পরিবহণ, ব্যাঙ্ক ও বীমা, চাকুরি ও সেবা-কার্যাদি তৃতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত] এর থেকে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির যে চেহারা ফুটে ওঠে তা এক বিকৃত অর্থনীতির প্রতিফলন—শিল্পায়নের ফলে অর্থনীতির দ্বিতীয় বিভাগ বা শিল্পক্ষেত্রের গুরুত্ব যেভাবে বেড়ে ওঠার কথা তার কোন সম্ভাবনা এখানে দেখা যায়নি বরং অনুৎপাদক তৃতীয় বিভাগের অবদান কৃষিনির্ভর অর্থনীতির পরিপূরক হিসেবে দেখা দিয়েছে। এরপর এক দশক ধরে শ্রমজীবী জনসংখ্যা এবং মোট জনসংখ্যা একই হারে বেড়েছে; কৃষিনির্ভর ও শিল্পনির্ভর শ্রমজীবী জনসংখ্যার শতাংশ অল্প কিছু বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫৩ শতাংশ আর ২০ শতাংশ। তৃতীয় বিভাগে শ্রমজীবী মানুষের শতাংশ এই দশকে কিছু কমে গেলেও এখনও শিল্পনির্ভর জনসংখ্যার তুলনায় তা বেশি আছে। তৃতীয় দশকে অর্থাৎ ১৯৬১-৭১ সময়সীমার মধ্যে পূর্ববর্তী দশকের সীমিত অগ্রগতি ধরে রাখা যায়নি। জনসংখ্যা যেখানে বেড়েছে প্রায় ২৭ শতাংশ, শ্রমজীবী জনসংখ্যা সেখানে বেড়েছে মাত্র ৬ শতাংশ। কৃষিনির্ভরতা বেড়ে গেছে—যার মধ্যে আবার চাষীর সংখ্যা কমে গিয়ে কৃষিশ্রমিক বেড়েছে। শিল্পনির্ভর জনসংখ্যা কমে গেছে—যার মধ্যে ঘরোয়া শিল্পের শ্রমিকসংখ্যা কমে আসা লক্ষণীয়। শ্রমজীবী জনসংখ্যার সঙ্গে শিল্পনির্ভর জনসংখ্যার অনুপাত কমে দাঁড়িয়েছে ১৫ শতাংশ, যা কিনা ১৯৫১-র অনুপাতের তুলনায় কম। জনসংখ্যার পেশাগত শ্রেণীবিন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে তিন দশকে একটা সংগতিহীন গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিন দশক জুড়ে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনসংখ্যার অনুপাতের অধোগতি। আয়ের নিরিখে দেখলেও পাওয়া যায় যে, শিল্পক্ষেত্রের আয় কখনই পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়ের এক-পঞ্চমাংশের বেশি হয়নি এবং তা অপরিবর্তিত থেকে গেছে মোটামুটি দু দশক ধরে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে তৃতীয় বিভাগের প্রাধান্য আয়ের নিরিখেও সমানভাবে ধরা পড়ে। (সারণি ১·২) সাধারণভাবে অর্থনীতির সংগতিহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে

সারণি ১·২। বিভিন্ন খাতে পশ্চিমবঙ্গের অনুমিত আয় (চলতি মূল্যমানে) কোটি টাকায়

	১৯৫১-'৫২	১৯৫৬-'৫৭	১৯৬১-'৬২	১৯৬৬-'৬৭*
কৃষি	২৫৬·৮৩	২৬৮·৭৯	৪১৬·৩২	৭০১·৫৭
পশুপালন	১·৩৪	০·০০	১·৬৬	৪৮·৮৯
চা	১৯·০৫	২৭·২৪	২৮·৪৪	৩৫·১০
বনজ দ্রব্য	·৪৫	১·১২	১·৩৫	২·১৯
মৎস্য	১০·৬৪	১২·২৭	২৫·৭৪	৪২·৭২
খনি	৮·৯৭	১২·৫৮	২৪·৭৪	৪১·২৪
ফ্যাক্টরি	১০৩·০৯	১৪৩·০১	১৯০·৫৫	৩২১·০২
ছোট উদ্যোগ	৪১·০১	৪৫·৫৯	৪৭·০০	৪৮·৩৪
ব্যাংক ও বীমা	৭·৯৮	১১·৩৯	১৮·৪০	৩৬·৪৫
রেল	২৩·৭৩	৩৭·১৮	৫৬·৮৩	৮৬·৭৫
অন্যান্য যানবাহন	১৯·৬০	২৪·২০	২০·৬১	২২·৭০
নির্মাণ-কার্য	৮·৫৮	১০·৫৩	১১·২৭	১৭·০৭
বৃহৎ ব্যাবসা	১৯·৮৩	২৪·৪৮	২৩·৩৯	২০·৮৯
ছোট ব্যাবসা	৫৯·৭৮	৭৩·৮০	৬৯·৭৪	৭৪·৩২
গার্হস্থ্য কর্ম	১১·৯৫	১৪·৭৫	১৫·৪২	১৪·৬৪
চাকুরি	৬৬·১৪	৮১·৬৩	৬৯·০১	৫৮·৪৯
সরকারী সেবাকার্য	৩৫·৬৫	৪৭·৮৯	৭২·৯৭	১৩৮·৫৯
গৃহস্থ-সম্পত্তি	৩৪·৯৫	৪৬·১২	৬৬·৮৪	৮০·৪৫
মোট	৭৩১·২৭	৯৮২·৫৭	১১৬০·২৮	১৭৯১·৪৯
মাথাপিছু	২৮৯	২৮৪	৩২৮	৪৫২

টীকা : *সংশোধিত

সূত্র : বুরো অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স অ্যাণ্ড স্ট্যাটিস্টিকস

শিল্পের এই গতিবিধি ব্যাখ্যা করার আগে শিল্পকাঠামোর বিন্যাস সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। সাধারণত শিল্পকে সংগঠিত আর অসংগঠিত—এই দুই ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ছোট ও কুটির শিল্পগুলিকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে ধরা হয়, বাকী সব সংগঠিত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬০ সালের এক হিসাব অনুযায়ী নীট উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ ও মোট শ্রমিক-নিয়োগের অর্ধেকের মতো সংগঠিত ক্ষেত্র থেকে আসে [রিজিওনাল প্যাটার্ন্স অব ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, এন্. সি. এ. ই. আর., ১৯৬০]

'পশ্চিমবঙ্গের অসংগঠিত শিল্প অনেকাংশেই দাঁড়িয়ে আছে সংগঠিত শিল্পের সহযোগী হিসাবে। সংগঠিত শিল্পের উত্থানপতনে তাই একই সঙ্গে অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের অনেকটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমরা সাধারণভাবে সংগঠিত শিল্পের গতিবিধি বিশ্লেষণ করব। অবশ্যই বিশেষ শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে ছোট শিল্পের প্রসঙ্গ আসবে, ক্ষেত্রবিশেষে আমরা সেই প্রাসঙ্গিক আলোচনা করব।

বর্তমান প্রবন্ধে সরকারী আযত্তাধীন শিল্পকেও পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়নি। সাধারণভাবে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ ও শিল্পকাঠামোর উপরই মনোনিবেশ করা হয়েছে, কারণ সরকারী আয়ত্তাধীন শিল্পের অবস্থান, উৎপাদন ও শ্রমিক নিযোগের হিসেবে, ব্যক্তিগ- উদ্যোগের তুলনায় বরাবরই গৌণ। সংগঠিত ক্ষেত্রের শিল্পগুলিকে 'অ্যানুয়াল সার্ভে অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ'-এর হিসাবে ২০টি শিল্পব্যষ্টিতে ভাগ করা হয়। এর সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনকে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা যে একুশটি শিল্পব্যষ্টি পাই, তা শিল্পকাঠামোকে বুঝতে সাহায্য করে। কোন এক বছরে মোট সংযোজিত মূল্যে ও শ্রমিকনিয়োগে এই শিল্পব্যষ্টিগুলির দান দেখলে (সারণি ১·৩) বিভিন্ন শিল্পের পারস্পরিক গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

সারণি ১·৩। মোট সংযোজিত মূল্যে ও শ্রমিক নিয়োগে বিভিন্ন শিল্পব্যষ্টির অবদান, ১৯৭০

	সংযোজিত মূল্য (মিলিয়ন টাকায়		শ্রমিক নিয়োগ (হাজারে)	
	পশ্চিমবঙ্গ	ভারত	পশ্চিমবঙ্গ	ভারত
খাদ্যসামগ্রী (পানীয় বাদে)	১৬১	২০৯৭	৪৩	৪৫১
পানীয়	২	১৭০	০·২	১৫
তামাক	২	৭০৩	১	১০১
বস্ত্রশিল্প	৯৫৮	৫৩১১	২৫৬	১২২০
জুতা	০·৮	৬৯	০·৪	১৪
কাঠ (আসবাব বাদে)	৫	৬৭	২	২৪
আসবাব ইত্যাদি	১১	১১৮	২	১৭
কাগজ ও বোর্ড	১১৩	৭২১	১৪	৭৮
মুদ্রণ	৬৭	৫৫৭	১৩	১০৭
চর্মশিল্প	৪	৬২	১	১৪
রবার দ্রব্য	২৭৪	৬৮১	৩০	৫৯

রাসায়নিক দ্রব্য	২৭৫	৬১২২	২৪	২০৩
খনিজ তেল ও কয়লাজাত দ্রব্য	১০	৪৭৬	২	১৯
অন্যান্য খনিজ দ্রব্য (অধাতুজ)	৫৩	৯৯৭	১৬	১৯২
ধাতুজাত দ্রব্য (যন্ত্রপাতি বাদে)	১৫৫	৬৫৩	২৬	৯২
যন্ত্রপাতি (বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি বাদে)	১৬২	১৫৩১	২৪	২০৯
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	২৫৯	১৬৩৯	২৮	১৮৯
পরিবহণ-যন্ত্রাদি	৩০৯	২২৯৮	১০২	৪৫৩
বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি	২৬৮	৩১৭২	৩১	৪০৯
মৌল ধাতু	৫১০	২৬৫২	৯৭	৩৪৬
বিবিধ	৪০	৪১৮	৭	৬৮
মোট	৩৬৩৯	২৭৮১৫	৭২০	৪৩১১

টাকা : ১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ

সূত্র : অ্যানুয়েল সার্ভে অব ইণ্ডাস্ট্রীজ, ১৯৭০

বস্ত্রশিল্প (এর মধ্যে পাটবস্ত্র আর সুতীবস্ত্র দুই-ই ধরা হয়েছে) থেকে আসে এ রাজ্যের মোট সংযোজিত মূল্যের এক-চতুর্থাংশ ও মোট শ্রমিকনিয়োগের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি। এর সঙ্গে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে ধরা যায় (ধাতুজাত দ্রব্য এবং সব ধরনের যন্ত্রপাতি যার অন্তর্গত) তা মোট সংযোজিত মূল্যের অর্ধেক ও মোট শ্রমিকনিয়োগের ৬০ শতাংশের মতো হয়। এই শিল্পগুলিকেই পশ্চিমবঙ্গের সাবেকী শিল্প হিসেবে গণ্য করা যায়। এর সঙ্গে অবশ্য চা-বাগিচা শিল্পকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবিবর্তনের ধারায় এই শিল্পগুলির অবশ্যই মাত্রাধিক দান রয়েছে। এই শিল্পগুলির অত্যধিক দানের কারণ এবং তাদের উত্থান-পতনকে পরে আমরা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। তা সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নকে বুঝতে সাহায্য করবে। এ ছাড়া, অন্যান্য শিল্পগুলির ক্ষেত্রে আমরা বেশি নজর দেব তাদের পরিবর্তনের ধারার উপর, অবস্থানের উপর ততটা নয়।

প্রধানত ব্রিটিশ আশ্রয়ে পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক শিল্পবিন্যাসের রূপ নির্ধারিত হয়েছিল। ব্রিটিশরা চলে গেলেও শিল্পবিন্যাসের রূপ উল্লেখযোগ্যভাবে পাল্টায়নি, বরং পরাশ্রয়ে লালিত এ শিল্পে এক বন্ধ্যা অবস্থার সৃষ্টি হল। শিল্পে বন্ধ্যাত্ব কী? কিভাবে এই বন্ধ্যাত্ব হল? সার্বিক ভারতীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে এ বন্ধ্যাত্ব কিভাবে সম্পর্কযুক্ত—এ ধরনের প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক।

অর্থনীতিতে বন্ধ্যাত্ব বলতে বিস্তীর্ণসময়ব্যাপী আপেক্ষিক গতিহীনতা। কিন্তু এই মান শূন্য নাও হতে পারে, উন্নয়নের হার ক্রমহ্রাসমান মাত্রায় দাঁড়াতে থাকে অথবা এক নিম্নমানে স্থির হয়েও থাকতে পারে। কোন অর্থনীতির অবস্থা যদি আমরা মোট উৎপাদিত জাতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি, এবং বিভিন্ন বৎসরের জাতীয় আয়ের মধ্যে তুলনা করে যদি দেখি যে মোট জাতীয় আয় প্রত্যেক বছরই বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও এই বেড়ে যাওয়ার হার একই থেকে গেছে, অথবা ক্রমাগত কমে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তবে সে অবস্থাকে আমরা অর্থনীতির বন্ধ্যা অবস্থা বলতে পারি।

শিল্পক্ষেত্রেও বন্ধ্যাত্বের লক্ষণ ফুটে ওঠে তার উৎপাদনবৃদ্ধির হার, শ্রমশক্তি নিয়োগের হার এসবের মধ্যে। কোন অর্থনীতিতে চলতি শিল্পবিন্যাস যদি কালের গতিতে পরিবর্তিত বাজারের নিরিখে সেকেলে হয়ে যায়, যদি নতুন ধরনের দ্রব্য উৎপাদনের জন্য উদ্ভাবিত নতুন কারিগরিবিদ্যার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নতুন শিল্প গড়ে না ওঠে, তবে এ ধরনের শিল্পক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব স্বাভাবিক। পুরনো শিল্পকাঠামোয়, পুরনো কারিগরিবিদ্যায় প্রস্তুত দ্রব্যগুলো নতুন চাহিদাকে তৃপ্ত করতে পারে না, এসব শিল্পের বেড়ে ওঠার গতি কমে যায়। কমে যায় শ্রমিকনিয়োগের সংখ্যাও। কী ধরনের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে জন্মলাভ করতে পারে এ ধরনের বন্ধ্যাত্ব, তা নিয়ে আমরা এই বিভাগের শেষে আলোচনা রাখছি। তার আগে আমরা বুঝে নিতে চাই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের অবস্থাটা কী রকম। আমরা আগেই বলেছি শিল্পের অবস্থাটা মোটামুটিভাবে ধরা পড়বে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন এবং শ্রমনিয়োগের অবস্থা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে। সারণি ২·১-এ টাকার মূল্যে এ রাজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও

সারণি ২·১। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পজাত দ্রব্যের মোট ফ্যাক্টরিমূল্য

ফ্যাক্টরিমূল্য

বছর	চলতি মূল্যমানে	বার্ষিক শতাংশ বৃদ্ধির হার	স্থির মূল্যমানে *	বার্ষিক শতাংশ বৃদ্ধির হার
১৯৫৯	৫৯৮০০	—	—	—
১৯৬০	৭২৯৮৮	[illegible]	[illegible]	—
১৯৬১	৮১৪৫৮	১৩·১	[illegible]৬০৮	১৪·৮
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯৬৩	১০৩৮০০	৯·৯	৮৭১৯২	১২·৬

[illegible]	১২০৭০০	১৬.২	[illegible]৩২৭	৭.৩
১৯৬৫	১২৭৮০০	৫.৮	৮৫২৪২৬	৮.৯
১৯৬৬	১৪৫৬০০	১৩.৭	[illegible]৮৮১২.৫	৬.৫
১৯৬৭	১৪২৯৬০	(—)১.৬	৯৪৬২৮.২	০.৪
১৯৬৮	১৪১৬০০	(—)০.৯	৮৩২৬০.৮	(—)১১.৫
১৯৬৯	১৫৬২০০	১০.৩	৮১৮৪০.৮	(—)১.৭
১৯৭০	১৬৩৮০০	৪.৮	৭৭৬৪১.৮	(—)৫.১
১৯৭১	—	—	—	—
১৯৭২	—	—	—	—
১৯৭৩	২০৫৫০০	—	৭৬৪৪৬.০	—
১৯৭৪	২৪৯৬০০**	২১.৪	৭২৮৮৩.২	(—)৪.৭
১৯৭৫	২৬৯৬০০**	৮.০	৮৩৮৪৪.৬	*১৫.৬

টীকা : * কলকাতায় কারখানাজাত দ্রব্যের ১৯৫২'-৫৩ সালের পাইকারী মূল্যমানকে ভিত্তি (অর্থাৎ ১৯৫২-'৫৩=১০০) করা হয়েছে। ** পরিবর্তনসাপেক্ষ

সূত্র : ইকনমিক রিভিউ, গভর্ণমেণ্ট অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ১৯৭৮-৭৯।

ত্যের পরিবর্তনের হারকে রাখা হয়েছে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত। সারণি থেকে মোট উৎপাদিত মূল্যের উন্নয়ন হারের অবনয়ন লক্ষণীয়। আরো লক্ষণীয় যে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে এই হার ঋণাত্মক। অন্যদিকে সারণি ১.১ থেকে দেখা যায়, শিল্পক্ষেত্রে মোট নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে কিছু বাড়লেও, ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে কমে গেছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-অবস্থায় এই সংখ্যাতথ্য এ রাজ্যের শিল্পে বন্ধ্যা অবস্থাকেই নির্দেশ করে। অর্থাৎ, এ রাজ্যের শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সংকুচিত হয়ে আসছে, অন্যদিকে নতুন নতুন শিল্পের বিকাশ হচ্ছে না, এ রাজ্যের প্রধান প্রধান শিল্পের সমস্যার প্রকৃতি নিয়ে আমরা তৃতীয় বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করছি। আলোচনা রাখছি [illegible] [illegible] প্রেক্ষাপটে [illegible] নতুন নতুন শিল্প এ রাজ্যে বিকাশ [illegible]। [illegible]

এ পর্যায়ে আমরা দেখব সর্বভারতীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রেরই অঙ্গ—শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক বিচারেও। তাই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির এই বন্ধ্যাত্ব কোন বিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া নয়। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় অর্থনীতিও একই বিপর্যয়ের শিকার। (ভারতীয় শিল্পের বন্ধ্যা অবস্থা বহু আলোচিত। এখানে আমরা বিশদ আলোচনা রাখছি না, উৎসাহী পাঠকদের জন্যে কিছু সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে লেখার শেষে)। সারণি ২.১ হতে আমরা পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে বিভিন্ন বছরে শিল্প উৎপাদনের সূচক রেখেছি। সারণি থেকে সামগ্রিকভাবে ভারতের শিল্প উৎপাদনে পড়তি হার সহজেই বোঝা যায়। ১৯৬৩ সালের তুলনায় এই বিচারে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সামগ্রিক ভারতীয় অবস্থার থেকে খারাপ, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যখন ১৯৭৩-৭৫ সালের উৎপাদন ভিত্তি-বৎসরের থেকে পিছিয়ে ১৯৭৬-৭৭ সালে এসে ভিত্তি-বৎসরের উৎপাদনের কাছাকাছি পৌঁছেছে, সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তখন এই সময়ে হ্রাসমান হারে হলেও ভিত্তি-বৎসরের তুলনায় মোট উৎপাদন বেড়ে গেছে। আপাতভাবে বিসদৃশ মনে হলেও ভারতবর্ষের সামগ্রিক ভারতীয় অর্থনীতির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ্যা অবস্থার ভয়াবহতা অর্থনীতির যুক্তিগ্রাহ্য। পশ্চিমবঙ্গের সাবেকী শিল্প কাঠামোর বন্ধ্যাত্বের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে অন্য রাজ্যের নতুন শিল্প, এতে সার্বিক ভারতীয় অর্থনীতির বন্ধ্যাত্ব পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় কম তীব্র হয়েছে। ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে সাবেকী শিল্প এবং আধুনিক শিল্পের এই তুলনামূলক আলোচনা আমরা রাখব তৃতীয় বিভাগে। বর্তমান আলোচনায় আমরা পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতের শিল্পক্ষেত্রে মন্দার অবস্থাকেই দেখিয়েছি। এখন এই বন্ধ্যার কারণগুলো সম্পর্কে আলোচনার বিস্তার করছি।

পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতীয় অর্থনীতিতে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা এবং বন্ধ্যা অবস্থা কোন সাময়িক ব্যাপার নয়। অর্থাৎ অল্প কিছু বছরের জন্য যে এটা হয়েছে —তা নয়। উপরি উল্লিখিত সারণিগুলো থেকে বোঝা যায় যে ১৯৬০-এর দশক থেকে এটাই মোটামুটিভাবে এ দেশের অর্থনীতির ধারা। এর নেপথ্য কারণগুলোকে বোঝা যাবে শুধু শিল্পক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নয়—সমগ্র ভারতীয় অর্থনীতির রূপরেখা এবং গতিপ্রকৃতি থেকে, এর ঐতিহাসিক বিবর্তন থেকে। বিশেষজ্ঞ অনেকে এ সম্পর্কে অনেক বিশদ আলোচনা করেছেন। এইসব সূত্র লেখার শেষে রাখা হচ্ছে উৎসাহী পাঠকদের জন্য। এখানে আমরা মোটামুটিভাবে..

একটা ছক রাখার চেষ্টা করছি—যা ভারতীয় অর্থনীতির দ্বন্দ্ব গতিকে বুঝতে সাহায্য করবে। ভারতীয় অর্থনীতির আয় ও সম্পত্তির চরম বৈষম্য এবং তার ক্রমবর্ধমান রূপ বিতর্কের অবকাশ রাখে না। বৈষম্যের প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করার জন্য কিছু সাধারণ সংখ্যাতথ্য রাখছি। গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ১৯৬১-৬২ সালে মোট সম্পত্তির মূল্যের শতকরা ৭৯ ভাগের মালিকানা ভোগ করতেন; ১৯৭১-৭২ সালে এই ভাগ বেড়ে দাঁড়ায় ৮১.৯ শতাংশ। সর্বনিম্ন ৩০ শতাংশের ভাগ ১৯৬১-৬২ সালে ছিল ২.৫ শতাংশ, ১৯৭১-৭২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২০ শতাংশে (সূত্র: V. V. Davatia : Inequalities in Asset Distribution of Rural Households. R.B.I. Staff Occasional Papers, Vol. I, No 1, June 1976, P. 13) অন্যদিকে কর্ষিত জমির অধিকার নিয়ে ৬.৮১ শতাংশের দখলে ৩৪ শতাংশ জমি ১৯৬০-৬১ তে, ১৯৬৯-৭০ এ ৪.৫ শতাংশ এর দখলে চলে যায় ৩৫ শতাংশ জমি (Bırdhan Srinivasan (ed) Poverty & Income Distribution, 1st, P. 398-403) সারণি ২.২ থেকে দেখা যায় এই সময়ে কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে

সারণি ২.২। শিল্প উৎপাদনের সূচক : পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত

	১৯৬৫	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬	১৯৭৭
পশ্চিমবঙ্গ	১১২.৮	৯৪.১	৯৪.৬	৯৪.৬	১০০.৫	১০১.৪
ভারত	১১৮.৬	১৫৫.৭	১৫৯.২	১৬৬.৭	১৮৪.৪	১৯২.৭

(ভিত্তি বছর : ১৯৬৩=১০০)

সূত্র : ইকনমিক রিভিউ, গভর্ণমেণ্ট অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল (১৯৭৮-৭৯)

উল্লেখযোগ্যভাবে, চাষীর সংখ্যাও কমে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। এ তথ্য গ্রামীণ ভূমি-ব্যবস্থায় জমির এককেন্দ্রিকতাকেই নির্দেশ করে। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান এই বৈষম্য শিল্পক্ষেত্রেও একই রকমভাবে প্রযোজ্য। ভারতে শিল্পক্ষেত্রে মোট সংযোজিত মূল্যে মজুরির ভাগ মোটামুটিভাবে স্থির থেকে গেছে যদিও সংযোজিত মূল্য বেড়েছে (অশোক মিত্র, টার্মস অব ট্রেড অ্যাণ্ড ক্লাস রিলেশনস) রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে শিল্পশ্রমিক এবং কৃষিশ্রমিকের প্রকৃত আয় কমে গেছে ৬০-এর দশক থেকে ৭০-এর দশকে। (অন্য অর্থ, দারিদ্র্য বাড়ছে, বর্ষ ২, সংখ্যা ২)

শিল্পক্ষেত্রে সম্পত্তিমূল্যও ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হয়েছে কমবেশি মাত্র ২০টি পরিবারের হাতে। এদের সম্পত্তিমূল্য বেড়েছে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে।

একচেটিয়া মূলধন জোরদার হয়েছে। (তারতে বড় পুঁজি, অল্প অর্থ, বর্ষ ১, সংখ্যা ৯)

বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম বিভাগের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, কৃষি এবং শিল্পের মন্দা অবস্থার মধ্যে অর্থনীতির যে বিভাগটির উন্নতি হয়েছে তা হল তৃতীয় বিভাগ, যা কিনা উৎপাদনমুখী কার্যকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিভাগের ক্রম-অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগের বিশেষভাবে উন্নতি অনুন্নত অর্থনীতিরই একটি বৈশিষ্ট্য।

এই বিশেষ অর্থনৈতিক কাঠামো থেকেই এর গতিপ্রকৃতির মৌল দিকগুলি তত্ত্বগতভাবে নির্দেশ করা যায়। এ দেশে কী ধরনের শিল্প গড়ে উঠতে পারে? এখানে গ্রামীণ অর্থনীতিতে আয়বন্টনের চরম বৈষম্য। মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এই বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে যারা গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাদের কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের ক্ষমতা নেই। নতুন নতুন কারিগরিবিদ্যার প্রয়োগে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াবার জন্য যে ধরনের শিল্পদ্রব্য দরকার সেগুলো কেনার ক্ষমতা তাদের নেই। অর্থাৎ কৃষি-অর্থনীতির গতি প্রায় শিল্পক্ষেত্রনিরপেক্ষ। শিল্পেও তাই এমন কোন যন্ত্রপাতি তৈরি হতে পারে না যার ফলে কৃষি-অর্থনীতির উৎপাদন বাড়তে পারে। কারণ এসব শিল্পজাত দ্রব্যের কোন বাজার নেই। কৃষি-অর্থনীতিতে সেই-সব মুষ্টিমেয় যে শ্রেণীর হাতে আয়ের বেশিরভাগ অংশ চলে যায় তারা মূলত আধাসামন্ততান্ত্রিক খাজনাভোগী পরজীবী শ্রেণী, এরা জমিতে বিনিয়োগে উৎসাহী নয়। খাজনা বাবদ প্রাপ্য আয় তাই কৃষিক্ষেত্রে বা শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত না হয়ে বিলাসদ্রব্যের জন্য অথবা ব্যবসা ও মজুতদারিতে খরচ হয়ে যায়। ক্রমবর্ধমান তৃতীয় বিভাগে নিয়োজিত জনসংখ্যা তাদের আয় থেকে কৃষি বা শিল্পে বিনিয়োগ করতে পারে না—ভোগ্যদ্রব্যে এবং বিলাসদ্রব্যে তাদের নির্দিষ্ট আয়ের টাকা শেষ হয়ে যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে, যে ধরনের শিল্পজাত দ্রব্যের একটা বাজার এ ধরনের কাঠামো থেকে তৈরি হতে পারে তা মূলত বিলাসদ্রব্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর যখন এদেশে মূল শিল্প এবং ভারী শিল্প গড়ে উঠল, সে শিল্প নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধিতে কাজে লাগল না, একে ভিত্তি করে গড়ে উঠল নতুন নতুন অত্যাধুনিক বিলাসদ্রব্য তৈরির শিল্প; বিদ্যুৎ সরঞ্জাম, টিভি, রেফ্রিজারেটার, এয়ার-কন্ডিশনার শিল্পের উন্নতি হল তরতরিয়ে। অর্থনীতির দুই মূল বিভাগ কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হল না। অর্থনীতির

বিপদ এবং বন্ধ্যাবস্থা ঘনিয়ে এল নানা দিক থেকে। এদেশের শিল্প যে বাজারকে ঘিরে গড়ে উঠল তা খুবই ছোট। এই ছোট বাজারের ছোট চাহিদা বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না শিল্পের বিকাশকে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার ধুমধাম-করা শিল্পনীতি অচিরেই প্রবল মন্দার সম্মুখীন হল। মূল শিল্পগুলোও সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়তে লাগল চাহিদার অভাবে। লোহা এবং ইস্পাত শিল্পে দেখা দিল বাড়তি উৎপাদনক্ষমতার সমস্যা। অর্থাৎ একেকটি কারখানা যা উৎপাদন করতে পারে সে গতিতে উৎপাদন করা চলবে না। কারণ বাজারে বিক্রি হবে না। ধনবৈষম্য যত বাড়ছে দেশের বাজারও ততই সংকুচিত হচ্ছে। কেন এবং কিভাবে আমরা এমন একটা অর্থনৈতিক কাঠামো পেলাম? ধনবৈষম্য কম-বেশি আজকের সমস্ত স্বনির্ভরশীল শিল্পোন্নত দেশগুলিতেই ছিল বা আছে। সেসব দেশে কিন্তু এ ধরনের বিকৃত পরনির্ভর শিল্পকাঠামো তৈরি হয়নি। শিল্পক্ষেত্র এবং কৃষিক্ষেত্র পরস্পর সম্পর্কশূন্য হয়ে গড়ে ওঠেনি। দেশীয় বাজারের এ ধরনের ঘাটতি এবং বিদেশী বাজারের উপর চরম নির্ভরশীলতা শিল্পোন্নয়নের প্রথম পর্বেই এভাবে তৈরি হয়নি। তবে কেন এদেশে এমন হল—এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ভারতীয় অর্থনীতির বিবর্তনের ঐতিহাসিক কারণগুলোর মধ্যে। দু-শ বছরের ঔপনিবেশিক কাঠামো ভারতে এ ধরনের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে। ব্রিটিশরা তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে এদেশে এক অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্ম দিল যেখানে কৃষিক্ষেত্রে তৈরি করা হল এমন এক ভূস্বামী শ্রেণী, জমির উপর যাদের সমস্ত অধিকার কিন্তু জমির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক শুধু খাজনা আদায়ের। খাজনা বাড়তেই থাকল ভূ-স্বামীদের ক্রমবর্ধমান বিলাসভোগের খরচা যোগাবার জন্য। কৃষিক্ষেত্রে তৈরি হল চরম আয়বৈষম্য। অন্যদিকে, ভারতের প্রথম শিল্প গড়ে উঠেছে পাট এবং চা-কে ভিত্তি করে—সম্পূর্ণ বিদেশী বাজারে বিক্রির জন্য এই শিল্প গড়ে উঠল বিদেশী মূলধনে, বিদেশী সাহায্যে, বিদেশী স্বার্থে।

শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক মূলধনের জন্য ভারতীয় শিল্পকে নির্ভর করতে হল না কৃষিক্ষেত্র থেকে আসা উদ্বৃত্তের ওপর। পশ্চিম ভারতে গড়ে ওঠা বস্ত্রশিল্প ছাড়া মোটামুটি এভাবেই গড়ে উঠল এ দেশের শিল্পকাঠামো। ব্রিটিশ মূলধন এবং দেশীয় মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষপাতমূলক নীতিও এ দেশে কৃষিক্ষেত্রের মূলধনকে শিল্পে বিনিয়োগে বাধা দিয়েছে। অতএব ঔপনিবেশিক শাসন থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যে কাঠামো আমরা পেলাম, পরবর্তী

কালে মূলত অপরিবর্তিত সেই কাঠামোই জন্ম দিল এক বিকৃত শিল্পোন্নয়নের। কখনও কখনও ভূমিসংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রের প্রচলিত কাঠামোকে পালটাবার কথা বলা হলেও কার্যত তা কখনই কায়েমী স্বার্থকে ভাঙতে পারেনি। অর্থনৈতিক ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা বেড়েই গেছে—তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। শিল্পক্ষেত্রে পরবর্তী কালে দেশীয় মূলধনের বিকাশ হলেও তা কৃষির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়নি. দেশীয় মূলধনও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বিদেশী মূলধনের উপর। শুরু হয়েছে এক নতুন ধারা—নয়া-ঔপনিবেশিক অর্থনীতি। কিভাবে এ পর্যায়ের ধারা গড়ে উঠল তা একটু বিচার করে দেখা যাক।

সীমিত দেশীয় বাজার, কৃষিতে উৎপাদনসম্পর্ক এবং বিদেশী মূলধনের আধিপত্য কেন ভারতের মতো একটি অনুন্নত দেশের শিল্পোন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, উপরে তা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন আমরা চেষ্টা করব এই সাধারণ বন্ধ্যাত্বের পরিস্থিতিতে কেন পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় অর্থনীতিতে একটা তেজীভাব দেখা দিল এবং শিল্পমূলধনের কিছুটা বিকাশ ঘটল। এর জন্য আমরা তিনটি কারণ চিহ্নিত করব। প্রথমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলি আর সরাসরি উপনিবেশ থাকে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতনের সঙ্গে শুরু হয় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের উত্থান। অন্যদিকে সোভিয়েত দেশ পৃথিবীর একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হয এবং সেও যাত্রা শুরু করে বিভিন্ন অনুন্নত দেশে সাহায্যের ঝুলি নিয়ে। আন্তর্জাতিক এই টানাপোড়েনের ফলে ভারতীয় দেশীয় বুর্জোয়ারা নিজেদের জন্য আরও কিছু জায়গা করে নিতে পারে। ঔপনিবেশিক থেকে আধা-ঔপনিবেশিক দেশে উত্তরণের এই সময় জুড়ে তাই নতুন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিনিয়োগ একটা ঊর্ধ্বগতি লাভ করে। দ্বিতীয়ত, দেশীয় বুর্জোয়ারা import substitution নীতির আড়ালে সেই-সমস্ত শিল্প গড়ে তুলতে আরম্ভ করে যার ইতিমধ্যেই কিছু বাজার ছিল এবং এই শিল্পগুলি গড়ে ওঠে বিদেশী মূলধন আর কারিগরি বিদ্যার সহযোগিতায়। যে শিল্পদ্রব্যগুলি আগে আমদানি করা হত, এখন সেই দ্রব্যই একই trade mark নিয়ে তৈরি হতে শুরু করল ভারতবর্ষে। Selling Agent পরিণত হল Licence Collaborator-এ। তৃতীয়ত, ভারতীয় শিল্প মোটামুটিভাবে বিশ্বের ধনতান্ত্রিক বাজারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। ফলে, পঞ্চাশের দশকে যখন বিশ্বের বাজার একটা প্রসারশীল অবস্থায় ছিল তখন ভারতীয় শিল্পও সেই অবস্থায় কিছুটা লাভবান হয় এবং একটা

অগ্রগতি লাভ করে। এখন, এইভাবে পঞ্চাশের দশকে যখন বিভিন্ন কারণে ভারতীয় শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ছে, যখন ভারতীয় মূলধন একটা উল্লম্ফনের আশায় অধীর, তখন কেন্দ্রীয় সরকার বিরাটভাবে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসে এবং শিল্পমূলধনের বিকাশে সাহায্য করে। তবে এই সরকারী বিনিয়োগটি হয় ব্যক্তি-গত মূলধনের অনুসৃত পথে—অর্থাৎ বিদেশী মূলধন আর কারিগরি সহযোগিতায়। কিন্তু, এই শিল্পায়নের লক্ষ্য ছিল সীমিত দেশীয় বাজার। এই দেশীয় বাজারের বিকাশের কাঠামোগত বাধা আগেই বলা হয়েছে। ফলে সেই কাঠামোগত দুর্বলতা টিকে থাকার জন্য অগ্রগতি নয়, বন্ধ্যাত্বই এই শিল্পায়নের স্বাভাবিক নিয়ম হল—যা প্রকট হল পরবর্তী দশকে।

স্বাধীনতার শুরু থেকে আজ অবধি বরাবর সর্বভারতীয় শিল্পোৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা অংশ কমে এসেছে। সে হিসেবে তার আপেক্ষিক গুরুত্বও ক্রমাগত খর্ব হয়েছে। তবে সারা ভারত জুড়ে যখন মন্দা চলেছে সেই মধ্য-ষাটের দশক থেকে গোটা দেশের তুলনায় এ রাজ্যের শিল্পের অবনয়ন হয়েছে আরও বেশি বেশি করে। সারা ভারতের শিল্পোৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের অংশ (সারণি ৩.১)

সারণি ৩.১। শিল্প উৎপাদন (ফ্যাক্টরি মূল্যে): পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত

	পশ্চিমবঙ্গ	ভারত	পশ্চিমবঙ্গের শতকরা অংশ
১৯৪৭	২১৪	৭৩৭	২৯.৪
১৯৫০	২৭৬	১০২৩	২৬.৯
১৯৫৫	৩৩৮	১৪০৯	২৩.৯
১৯৬০	৭২০	৩১৫০	২২.৯
১৯৬৫	১২৭৮	৬৫০২	১৯.৭
১৯৭০	১৬৩৮	১১৩৪৬	১৪.৪
১৯৭৫*	২৬৯৬	২৪৬৪৪	১০.৯

*পরিবর্তনসাপেক্ষ/সূত্র: ১। সেন্সাস অব ম্যানুফ্যাকচারিং ইণ্ডাস্ট্রিজ (বিভিন্ন বছরের)

২। ইকনমিক রিভিউ, গভর্ণমেণ্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৯৭৮-৭৯

দেখলেই পাওয়া যায় যে, ১৯৪৭-এ এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা কমে ১৯৭৫-এ এক-দশমাংশে এসে ঠেকেছে। এবং, মধ্য-ষাটের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গের অংশ দ্রুত হ্রাস পায়। এই ক্রমহ্রাসমান শিল্পক্ষেত্রের শিল্পওয়ারী পরিস্থিতি বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে সারা ভারতে কোন কোন শিল্পের আপেক্ষিক উন্নতি বা অবনতি হচ্ছে। এইসব শিল্পের সংযোজিত মূল্যে বিভিন্ন শিল্পবাষ্টির দানে (সারণি ৩.২) বস্ত্রশিল্পের অবদান সমানে কমে আসা লক্ষণীয়। পাশাপাশি অবদান বেড়েছে

সারণি ৩·২। সর্বভারতীয় কারখানা উৎপাদনের রেজিস্টার্ড ক্ষেত্রে সংযোজিত মূল্য

(১৯৬০-৬১র মূল্যমানে, লক্ষ টাকায় ও শতাংশে)

	১৯৫১-৫২	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৭০-৭১
খাদ্যসামগ্রী (পানীয় বাদে)	৯০৫৯	১০৫২৯	১৪১৫৯	১৭৭৪২	২২৩০৩
	(১৫·২)	(১৩·৭)	(১৩·২)	(১১·২)	(১২·১)
পানীয়	২১০	২২৮	৩৬৪	৫৩৯	৬১৪
	(০·৪)	(০·৩)	(০·৩)	(০·৩)	(০·৩)
তামাক	১৪৪৪	১৫৬৯	২৫০১	৩৭০১	৪২২১
	(২·৪)	(২·০)	(২·৮)	(২·৩)	(২·৩)
বস্ত্রশিল্প	২৪৫২৩	২৯২৩২	৩২০৫৬	৩৫৪৩৫	৩৪২৯৪
	(৪১·৩)	(৩৭·৯)	(২৯·৯)	(২১·৪)	(১৮·৭)
জুতা	১৬৪	১৫৭	২৭৪	২২৯	২২৩
	(০·৩)	(০·২)	(০·৩)	(০·১)	(০·১)
কাঠ (আসবাব বাদে)	২৫৯	৩৮৮	৯৪৪	২১১৪	২০৫৩
	(০·৪)	(০·৫)	(০·৯)	(১·৩)	(১·১)
আসবাব ইত্যাদি	১৮৯	৩৩৬	৪৪০	৬৯৬	৪৭১
	(০·৩)	(০·৪)	(০·৪)	(০ ৪)	(০·৩)
কাগজ ও বোর্ড	৭১১	১০২২	১৮৪৯	২৭৬৫	৩৯২৯
	(১·২)	(১·৩)	(১·৭)	(১·৭)	(২·১)
মুদ্রণ	১৯০০	২৩৯৭	৩৩৩৩	৪৯০২	৫৭৫২
	(৩·২)	(৩·১)	(৩·১)	(৩·১)	(৩·১)
চর্মশিল্প	৩৭৫	৩২৮	৪৯২	৫৮৩	২৯৪
	(০·৬)	(০·৪)	(০·৫)	(০·৪)	(০·৩)
রবার দ্রব্য	১৩২৫	১৬২৪	২৬০৮	৩৯১৬	৫৪৮২
	(২·২)	(২·১)	(২·৪)	(২·৫)	(৩·০)
রাসায়নিক দ্রব্য	৩৮৬১	৫১০৯	৮৪৫৪	১২৮৭৪	১৯৬৪৭
	(৬·৫)	(৬·৬)	(৭·৯)	(৮·১)	(১০·৭)

খনিজ তেল ও কয়লা-জাত দ্রব্য	৮৫	১১৭২	১৯২৪	৩১৫৩	৫৭০৬
	(০·১)	(১·৫)	(১·৮)	(২·০)	(৩·১)
অন্যান্য খনিজ দ্রব্য (অধাতুজ)	১৭৯৫	২৪৫৮	৪৪৬৭	৬৪৮৭	৮৬৫৭
	(৩·০)	(৩·২)	(৪·২)	(৪·১)	(৪·৭)
মৌল ধাতু	৩৯২৬	৫৪৭৪	৮৭০৪	১৫০৪৮	১৬৯৯১
	(৬·৬)	(৫·৮)	(৮·১)	(৯·৫)	(৯·২)
ধাতুজাত দ্রব্য (যন্ত্রপাতি বাদে)	১১৬৯	২০৭১	২৯৪৩	৩৬৩২	৩৬৭৪
	(২·০)	(২·৭)	(২·৭)	(২·৩)	(২·০)
যন্ত্রপাতি (বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি বাদে)	৮৯৯	১৬৫৩	৪১৫৬	১২১৬৫	১৫১১৩
	(১·৫)	(২·১)	(৩·৯)	(৭·৭)	(৮·২)
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	৮৬৩	১৫০৮	৩৫৯১	৭৩৫৩	১২৯৫৭
	(১·৫)	(২·০)	(৩·৪)	(৪·৬)	(৭·০)
পরিবহণ-যন্ত্রাদি	৫০০৬	৮৪২৯	১০৫৮৯	১৯৪২২	১২৮৫৭
	(৮·৪)	(১০·৯)	(৯·৯)	(১২·৩)	(৭·০)
বিবিধ	১৬৮২	২৩৯২	৩২৫৬	৫৭৫৩	৮৬২৩
	(২·৮)	(৩·১)	(৩·০)	(৩·৬)	(৪·৭)
মোট	৫৯৪৪৫	৭৭০৭৬	১০৭১৪৪	১৫৮৫০৯	১৮৩৮২

টীকা : বন্ধনীভুক্ত সংখ্যা শতাংশ মান নির্দেশ করে

সূত্র : ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস্ স্ট্যাটিস্টিক্স, ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৭২-৭৩ পর্যন্ত, ডিজ্ অ্যাগ্রিগেটেড্ টেব্‌ল্‌স্ ; মার্চ ১৯৭৫, সি, এস, ও

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অধীন কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন পরিবহণ-যন্ত্রাদি ছাড়া অন্যান্য যন্ত্রাদির ক্ষেত্রে, রাসায়নিক দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে, সীমিতভাবে মৌল ধাতুর ক্ষেত্রে। এখন যদি তুলনা করা যায় এর কোন কোন শিল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গের গতিবিধি নির্ধারণ করছে, তাহলে আমরা পাই বস্ত্রশিল্প (যার মধ্যে এ রাজ্যের পাটশিল্প অন্যতম) ক্রমাগত মার খেয়েছে। পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অন্তর্গত সব কটি শিল্পব্যষ্টির ক্ষেত্রে একটা ক্রমিক অবনয়ন লক্ষ করা যায় ষাটের দশক জুড়ে।

আবার রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি শিল্পেও তুলনামূলকভাবে কম হলেও অধোগতি ছিলই (সারণি ৩.৩ দ্রষ্টব্য)। অতএব যেসব শিল্প পশ্চিমবঙ্গের সাবেকী শিল্প, সেগুলি

সারণি ৩.৩। পশ্চিমবঙ্গের ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক নিয়োগের বৃদ্ধির হার

	১৯৫০-৬০ (শতাংশ বৃদ্ধি)	১৯৬০-৬৯ (শতাংশ বৃদ্ধি)
খাদ্যসামগ্রী (পানীয় বাদে)	২০.০০	(—) ৫.৬
পানীয়	(—)১৮.৯	৩৯.১
তামাক	৯২.১	২.১
বস্ত্রশিল্প	(—)১৬.৬	০.৬
জুতা	১৩.৪	৩৭.৯
কাঠ (আসবাব বাদে)	৮৩.৪	১৫.৭
আসবাব ইত্যাদি	১৩.৩	১২.১
কাগজ ও বোর্ড	১৯.৭	২২.৮
মুদ্রণ	৩৬.৯	১৪.৩
চর্মশিল্প	৪১৮.০	৫৪.০
রবার দ্রব্য	৩৫.৯	৩৮.৯
রাসায়নিক দ্রব্য	২৬.০	১৮.১
খনিজ তেল ও কয়লাজাত দ্রব্য	(—)৫২.৩	৬.৯
অন্যান্য খনিজ দ্রব্য (অধাতুজ)	৫০.৪	৮.৪
মৌল ধাতু	৯৯.৯	২৪.৮
ধাতুজাত দ্রব্য (যন্ত্রপাতি বাদে)	১০৮.০	৪৫.৫
যন্ত্রপাতি (বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বাদে)	৭৩.৩	৩১.৬
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	৫২.১	৪৩৪.
পরিবহণ-যন্ত্রাদি	৩৮.১	১৩.২
বিবিধ	(—) ৭.৯	৪২.৭
বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি	(—) ১.১	২৬.৯

সূত্র : গভর্ণমেণ্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল : স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবসট্রাক্ট

ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছে। আর যেসব শিল্প ভারতের অন্যত্র নতুন করে গড়ে উঠেছে সেগুলিও পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠতে পারেনি। আমরা প্রথমে অবক্ষয়ী শিল্পের সমস্যা ও পরে উন্নতি শিল্পগুলির সমস্যা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি।

পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের মধ্যে পাট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অন্যতম। ভারতের শিল্পায়নের আদি পর্বেই এদের উদ্ভব হয়েছিল এবং স্বাধীনতা-উত্তর কালেও অন্তত এক দশক পর্যন্ত এদের উজ্জ্বল অস্তিত্ব ছিল। সে ঐতিহ্য কিভাবে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল, সামগ্রিক অর্থনীতিতে মন্দার কারণগুলির বাইরেও এদের ক্ষেত্রে বিশেষে কী কী কারণ কাজ করেছিল তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

১৯৬০ সালেও সারা দুনিয়ার পাটদ্রব্যের সবচেয়ে বড় উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ ছিল ভারত। কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকেই পাটদ্রব্যের মোট উৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমেই কমে আসছিল, বিশেষত ১৯৬৫ সালের পর থেকে উৎপাদনের পরিমাণই সাংঘাতিকভাবে কমে যেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, এ দেশের পাটশিল্প আজন্ম মূলত রপ্তানি-নির্ভর। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে ভারতের পাট রপ্তানির বাজার দারুণভাবে ধ্বসে গিয়েছিল। ঐ সময়ের মধ্যে সারা পৃথিবীর মোট পাট রপ্তানিতে ভারতের ভাগ পঁচাত্তর শতাংশের থেকে কমে গিয়েছিল পঞ্চাশ শতাংশেরও নিচে। পাটের রপ্তানির বাজারে মন্দার কারণগুলি হল: প্রথমত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাটের পরিবর্ত হিসেবে প্লাস্টিক, পলিথিন, বিশেষ ধরনের কাগজ ইত্যাদির প্রচলন; দ্বিতীয়ত, বিদেশে (বিশেষ করে ভারতের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার আমেরিকায়) জিনিসপত্র পরিবহণ ও বন্টনের জন্য থলে বা বস্তার ব্যবহার কমে গিয়ে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'বাল্ক হ্যাণ্ডলিং', 'প্যাকেজিং', 'কন্টেনার' ব্যবহার প্রভৃতির প্রচলন। লক্ষণীয়, সমস্ত পাটদ্রব্যের মধ্যে আবার চট আর বস্তার উৎপাদন ১৯৬০ সাল থেকে কমে যাচ্ছিল হু হু করে, যদিও অন্যান্য পাটদ্রব্যের উৎপাদন ১৯৭৩ অবধি বেড়েছিল (সারণি ৩·৪)। তা ছাড়াও, বিপর্যয়ের অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিল

সারণি ৩·৪। পশ্চিমবঙ্গের কতগুলি বাছাই শিল্পে উৎপাদন

		১৯৫৩	১৯৫৫	১৯৬০	১৯৬৫	১৯৭৩	১৯৭৭
পাট দ্রব্য							
চট	মিলিয়ন মিটার/ হাজার টন*	১৩৭৯	১৪২২	১৪৪৩	৫৩০	৩২৫	৩৪৬
বস্তা	" *	৯৮৩	১২৫০	১১৬০	৫৯১	৪২৫	৪৩৮
অন্যান্য	"	—	—	১০৬	২১৫	২৮৭	২৪৯
মোট	হাজার মেট্রিক টন	৮৮৩	১০৪৩	১০৮৪	১৩৩৬	১০৩৭	১০২৮

সুতী বস্ত্র						
সুতো হাজার কেজি	২৭৩৩৪	৩২৫৩০	৩৬৮৯৩	৪৯২৩৮	৫৩৫২৮	৬২৭৬৮**
বস্ত্র হাজার মিটার	১৯১৯৭৩	২৩৪৭৭০	২৪৮৪৯৫	২৪৩৬৬৪	১৯৩৬৮০	১৭৮২০০**
লোহা ও ইস্পাত						
পিগ্ আয়রন						
হাজার মেট্রিক টন	৫৭২	৬৯৮	১৪৭২	২৬৯২	১৪৮৯	২০৭৭
ইস্পাত ,,	২০১	৩৯০	৫১১	১২২৬	৯৪৫	১১৪৯
চা হাজার কেজি	৬৮৬৮৪	৭৪৪৩২	৮১৫২৩	৮৬৯৭৯	১৯০৪৮৯	১৩১৩০৬**
কাগজ এবং কাগজ দ্রব্য						
হাজার কেজি	৫৭৬২৮	৬৮৮২৪	৯৭৮৮৮	১১৮৭৪৩	১২২৫০০	—

* 'হাজার টন একক' ১৯৬৫, '৭৩ এবং '৭৭ সালের জন্য প্রযোজ্য

** পরিবর্তন সাপেক্ষ

সূত্র : ১। স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাবস্ট্রাক্ট, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, ১৯৬১-'৬২

২। ইকনমিক রিভিউ, পূর্বোক্ত

কাঁচাপাটের যোগানে ঘাটতি এবং তার চড়া দাম, ভারতীয় পাটশিল্পে ব্যাপক ধর্মঘট এবং পাকিস্তানের (সরকারী মদত-পুষ্ট) পাটশিল্পের তীব্র প্রতিযোগিতা।

তা ছাড়া, এদেশের শিল্পায়নের মূলত পরগাছা চরিত্রের জন্য, অন্য অনেক শিল্পের মতো না হয়েছে কোন উপযুক্ত কারিগরি উদ্ভাবন, না হয়েছে দেশের আভ্যন্তরিক ব্যবহার ব্যাপকতর করার জন্য পাটদ্রব্যের প্রযোজনীয়তার বৈচিত্র্যায়ন। এই-সমস্ত কারণের যৌথক্রিযায ভারতীয় পাটশিল্প চরম সংকটে পড়ে এবং ষাটের দশকের শেষার্ধে 'রুগ্ন' শিল্প হিসেবে গণ্য হয়। আর আজ অবধি গোটা দেশের পাটশিল্পের মোট উৎপাদনের ৮০ শতাংশেরও বেশি পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীভূত বলে (পঞ্চাশের দশকে ছিল সবটাই) এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে তার নিরঙ্কুশ গুরুত্ব বলে ভারতীয় পাটশিল্পের সংকট সবচেয়ে বড় আঘাত দিয়েছে এ রাজ্যের শিল্পকাঠামোকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বনিয়াদ তৈরি হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তার যথেষ্ট প্রসার হয়। সেই সময়ই কলকাতায় আর তার আশপাশে ব্রেথওয়েট অ্যাণ্ড কোম্পানি (Braithwaite & Co.,) বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি (Burn & Co.) জেসপ অ্যাণ্ড কোম্পানি (Jessop & Co.), ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (Britannia Engineering Co.) স্যাক্সবি অ্যাণ্ড টার্ণার (Saxby &

Turner) প্রভৃতি ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পত্তন হয়। সমস্ত ধরনের বনিয়াদী (structural) কাজকর্ম ছাড়াও এদের অধিকাংশই ওয়াগন তৈরি এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজও করত। দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগের এই শিল্পগুলি অনুন্নত থাকলেও উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পাট, তুলার মিল এবং চিনির ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিরাট প্রসার হতে থাকে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের মেরামতি শিল্পও গড়ে উঠতে থাকে। ষাটের দশক থেকে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অভাবনীয় প্রসার হয়। পশ্চিমবঙ্গের চিত্র কিন্তু বিপরীত। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্ট্রিকৃত ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা সংখ্যায় প্রচুর বাড়লেও তারপর থেকে ১৯৭৪-৭৫ সাল পর্যন্ত তা ভীষণভাবে কমে গেছে, যদিও ঐ একই সময়ে ভারতের মোট ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার সংখ্যা সমানেই বেড়েছে (সারণি ৩.৫)। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নানান ধরনের জিনিস তৈরি হয়। এদের

সারণি ৩.৫। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান

রেজিস্ট্রিকৃত		১৯৫০	১৯৫৪	১৯৫৮	১৯৬৬	১৯৬৯	১৯৭৪-৭৫
সংস্থার সংখ্যা	পশ্চিমবঙ্গ	৫৪৬	৫৩১	৫৪৬	৮৫০	৭৫৩	৬৬০
	ভারত	১৭৭১	২০০২	২২৮৮	৩৬৩৬	৪০৭৩	২০০৫৫
সর্বভারতীয় হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের শতাংশ অবস্থান		৩০.৮	২৬.৪	২৩.৮	২৩.৫	১৮.৫	৩.৩

সূত্র: ১। সি, এম, আই, (১৯৫০, ১৯৫৪, ১৯৫৮ সালের জন্য)

২। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিট্স: সেল্ফ-অ্যাসিস্টেড্ ডিক্লাইন, বাই এ স্পেশাল করেস্পণ্ডেন্ট, বিজ্‌নেস স্ট্যাণ্ডার্ড, কলকাতা, জুলাই ৪, ১৯৭৯।

মধ্যে কতকগুলি কাজ (যেমন জাহাজ নির্মাণ, ওয়াগন তৈরি, বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ইত্যাদি) মূলত পশ্চিমবঙ্গে হয়ে থাকে। আরও কতকগুলি কাজকর্ম (যেমন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি, ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদি প্রভৃতি) হয় পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, প্রথমোক্ত জিনিসগুলির (যেমন পরিবহণ-যন্ত্রাদির, বিশেষত ওয়াগনের) উৎপাদন ষাটের দশকের থেকে বেড়েছে সবচেয়ে কম। আর শেষোক্ত জিনিসগুলির (বিশেষত বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির) উৎপাদন

বেড়েছে বেশি হারে। ফলে ষাটের দশকে সামগ্রিকভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বাড়-বাড়ন্তের মুখেও পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে মন্দা চলছিলই।

এ ছাড়া বিভিন্ন কারণগুলো এ রকম : (১) সর্বভারতীয় শিল্পায়নে অবক্ষয়, ফলত বিভিন্ন শিল্পের এবং আনুষঙ্গিক শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির (capital goods) পড়ন্ত চাহিদা। (২) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি শিল্প ছড়িয়ে পড়া, যেমন জাহাজ নির্মাণ, বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি, ওয়াগন প্রভৃতি শিল্প পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে শুরু হলেও ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। (৩) নতুন নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, যেমন গাজিয়াবাদ, বাঙ্গালোর, পুনে, কেরালা প্রভৃতি জায়গায়। এর ফলে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পও গড়ে উঠছে এদের নিকটবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে। (৪) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কারণগুলির পিছনে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারী ভরতুকি এবং নিয়মনীতিরও একটা ভূমিকা আছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকাঠামো অনেক পুরনো এবং প্রশস্ত ছিল বলে গত তিন দশকে পশ্চাদ্‌বর্তী অঞ্চলে শিল্পায়ন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারী ভরতুকি অনেক বেশি আছে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। (৫) আবার মধ্য-ষাটের দশক থেকে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে যে বিরাট ঊর্ধ্বগতি এসেছিল তার অনেকটাই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঐ শিল্পজ দ্রব্যাদির বিরাট রপ্তানিবৃদ্ধিতে (সারণি ৩·৬) কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সব

সারণি ৩·৬। মোট রপ্তানি আর কয়েকটি প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের শতাংশ অবদান

(সর্বভারতীয় হিসাব)

	১৯৫১·৫২	১৯৫৫·৫৬	১৯৬০·৬১	১৯৬৫·৬৬	১৯৭০·৭১	১৯৭৪·৭৫
পাট শিল্পজ দ্রব্য	৩৭·০	১৯·৫	২১·০	২২·৭	১২·৪	৮·৭
চা	১২·৮	১৮·১	১৯·১	১২·৭	৯·৫	৬·৭
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	—	—	১·০	২·৪	৭·৬	১০·৫
চিনি	—	—	০·৫	১·৪	১·৯	১০·২
লোহা ও ইস্পাত্	—	—	১·৫	১·৫	৫·৯	—
আকরিক লোহা	০·১	১·০	২·৭	৪·৯	৭·৬	৪·৮

সূত্র : ১। মনমোহন সিং, ইণ্ডিয়াজ এক্সপোর্ট ট্রেণ্ড্‌; অক্সফোর্ড, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ১৫; (১৯৫১-৫২, ১৯৫৫-৫৬ সালের জন্য)।

২। দীপক নায়ার, ইণ্ডিয়াজ এক্সপোর্টস অ্যাণ্ড এক্সপোর্ট পলিসিজ, কেম্‌ব্রিজ, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ২৩, ৩৫৬; (বাকি বছরগুলির জন্য)।

দ্রব্যের রপ্তানি কিন্তু সমানভাবে বাড়েনি। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদির (যেমন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির) রপ্তানি বেড়েছে খুবই কম। পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের যা চরিত্র তাতে উপরোক্ত দুদিক থেকেই এ রাজ্যের শিল্পকাঠামো সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছে। আবার কলকাতা বন্দর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পজ দ্রব্যাদির রপ্তানির জন্য জাহাজভাড়া বন্দরের তুলনায় বেশি, সেদিক থেকেও এ রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে মার খাওয়ার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রধানত বহু ছোট ছোট সংস্থা নিয়ে গঠিত পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উপরোক্ত অজস্র আঘাতে তার বিরাট কাঠামো নিয়ে, একটু একটু করে ভেঙে পড়তে থাকল। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সাবেকী শিল্পগুলির মধ্যে পাট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যখন এই দুরবস্থা, তখন চা এবং কাগজ শিল্প কিন্তু উৎপাদনের হিসাবে কমবেশি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু আনুষঙ্গিক শিল্পপ্রসারে বা শিল্প-অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে এদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নগণ্য বলে এই দু-একটি সুস্থতর শিল্প সামগ্রিক শিল্প-অবক্ষয়কে রুখতে পারেনি। (৭) স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের শিল্পায়নে প্রয়োজনীয় কারিগরি বিদ্যা ও যন্ত্রপাতির বৃহদংশ অনেক বেশি বেশি করে আসতে থাকে বিদেশ থেকে। সে কারণেও সামগ্রিকভাবে ভারতের ও বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মার খায়।

ভারতীয় শিল্পায়নের বন্ধ্যাত্বের কাঠামোগত কারণগুলির রূপরেখা ওপরে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতির অঙ্গীভূত পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি এই কাঠামোগত দুর্বলতার দোষে দুষ্ট। কিন্তু রুগ্ন শরীরের সমস্ত অঙ্গই যেমন একই মাত্রায় দুর্বল হয় না, তেমনি রুগ্ন ভারতীয় শিল্পও সর্বত্র একই মাত্রায় অচল ও ক্ষয়িষ্ণু নয়। স্বাধীন ভারতে মহারাষ্ট্র আর গুজরাতে শিল্পের সীমিত অগ্রগতি আর পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি একই তালে এবং একই মাত্রায় হয়নি। এর কারণ হিসাবে যদি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ আর সরকারী বিনিয়োগের অসাম্যের উল্লেখ করা হয় তবে তার উত্তরে বলা যায় যে সরকার কোন নিরালম্ব স্বয়ম্ভু নয়; সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক বিন্যাসই নির্ধারিত করে দেশ সরকারের আচরণ। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সরকারী বিনিয়োগের হার, অন্তত ১৯৬৮ পর্যন্ত, (সারণি ৪.১) মহারাষ্ট্র এবং গুজরাতের তুলনায় অনেক এগিয়ে থেকেছে।

সারণি ৪·১। কেন্দ্রীয় সরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগের বন্টন
(কোটি টাকায় ও শতাংশে)

	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮
পশ্চিমবঙ্গ	২৩৪·৭	২৬১·১	৩২৯·৩	৩৭৯·২	৪০৩·৩
	(১৫·১০)	(১৩·৮৩)	(১৪·৬৭)	(১৪·৪০)	(১৩·২৫)
গুজরাত	০ ৯	১·০	২৬·৬	৩০·৩	৭৭·৮
	(০·০৫)	(০·০৫)	(১·১৮)	(১·২০)	(২·৫৬)
মহারাষ্ট্র	৩৫·১	৪৩·৩	৬০·১	৬৭·৪	৯২·৭
	(২·৩০)	(২·২৯)	(২·৬৮)	(২·৬০)	(৩·০৫)

সূত্র : হ্যাণ্ডবুক অব ইনফর্মেশন অন পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস্, ১৯৬৯।

তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়. আধুনিক-কারিগরি-সম্বলিত শিল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গে না হয়ে বেশি বেশি করে অন্যান্য রাজ্যে. বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে আর গুজরাতে, হল কেন? এর কারণ খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ঔপনিবেশিক আমলে বিদেশী মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বুর্জোয়াদের অবস্থানে এবং লক্ষ্য করতে হবে স্বাধীনতার আমলে ভারতীয় শিল্পায়নের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। পরাধীন ভারতে ভারতীয় মূলধনের সর্বাধিক অগ্রগতি হয়েছিল পশ্চিম ভারতে। তুলনামূলকভাবে ব্রিটিশ মূলধনের বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত ছিল পূর্বভারতে। প্রাথমিকভাবে এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যায়, যদিও এ সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট তথ্য সন্নিবেশের অবকাশ আছে। ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশরা প্রথম ঘাঁটি গেড়েছিল বাংলাদেশে। ব্রিটিশ বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র ছিল কলকাতা। এ ছাড়া. সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্রিটিশরা গড়ে তুলেছিল খনি, চা ও পাট শিল্প—শিল্পায়নের বিস্তৃতিতে যাদের ভূমিকা খুব দুর্বল। আর রেল ও জলপথ প্রসারের তাগিদে গড়ে উঠেছিল কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। বিদেশী সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির ফলে এই-সমস্ত শিল্পে দেশীয় মূলধনীদের প্রবেশের সুযোগ ছিল সামান্য। তবে পশ্চিম ভারতে জাতীয় মূলধনের বিকাশের জন্য ঔপনিবেশিক নীতিও দায়ী ছিল। পূর্ব ভারতে চালু করা হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যার প্রভাবে দেশীয় লোকের হাতে গচ্ছিত অর্থের একমাত্র লাভজনক বিনিয়োগের রাস্তা হয়ে উঠল জমিদারি কেনা। পশ্চিম ভারতে কিন্তু রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে তা ততটা মাত্রায় জমিদারের স্বর্গে পরিণত হয়নি। এ ছাড়া পশ্চিমভারতে গ্রামের ছোট মহাজনের সঙ্গে শহরের বড় ব্যবসায়ী মহাজন সুদৃঢ় গ্রন্থিতে আবদ্ধ ছিল। যার ফলে বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজনীয় গ্রামীণ সম্পদ

আহরণ তাদের দখলে ছিল—পূর্ব ভারতে যা ধুলিসাৎ হয়েছিল ব্রিটিশ অত্যাচারের প্রকোপে। পশ্চিম ভারতে আরও একটি বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে প্রথম নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বস্ত্রশিল্পের মূল কাঁচামাল সুতো তৈরির ক্ষেত্র ছিল পশ্চিমভারত। ফলে যে শিল্পজাত দ্রব্যের একটি সীমিত প্রদত্ত বাজার ছিল এবং যার ভিত্তিতে দেশীয় বুর্জোয়াদের একটি শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব ছিল, তার উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হল পশ্চিম ভারতে। এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলশ্রুতি ভোগ করল এই বুর্জোয়ারা। পরবর্তী কালে যখন এই বুর্জোয়ারা ভারতের শিল্পায়নে অংশ গ্রহণ করেছে তখন আর তার স্বাধীন চেতনার প্রকাশ ঘটেনি। বিদেশী মূলধন এবং প্রধানত বিদেশী কারিগরির ভিত্তিতে নিজের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

স্বাধীন ভারতে শিল্পায়ন হয়েছে মূলত সহযোগিতার সড়ক বেয়ে। এই প্রতিযোগিতায় তুলনামূলকভাবে বেশি তৎপরতা দেখিয়েছেন সেই-সমস্ত বুর্জোয়ারা যাঁদের অর্থনীতির পরিভাষায় বলা যায় মধ্যবর্তী স্তরের একচেটিয়া পরিবারগুলি। এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে প্রথম কয়েকটি একচেটিয়া পরিবার সহযোগিতায় পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে স্বাধীন বুর্জোয়া হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু এই পরিবারগুলির বৃহৎ আকার তাদেরকে কোন একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখেনি। অর্থাৎ এদের বিনিয়োগনীতির ক্ষেত্রে কোন আঞ্চলিকতার প্রভাব খুব একটা স্পষ্ট নয়। তাই বিড়লা অ্যালুমিনিয়াম তৈরির জন্য যায় উত্তরপ্রদেশে, বস্ত্রশিল্পের জন্য মধ্যপ্রদেশে, সারের জন্য গোয়ায় আর কাগজের জন্য কেরালায়—যদিও বিড়লার আদি বিনিয়োগক্ষেত্র ছিল কলকাতা। ঠিক একই কথা বলা যায় টাটার ক্ষেত্রে। কিন্তু যে-সমস্ত পরিবারের বিনিয়োগ আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ, তাদের বেশির ভাগই দেখা যায় পশ্চিম ভারতে। পূর্ব ভারতে এই ধরনের মাঝারি আকারের একচেটিয়া পরিবার নেই বললেই চলে। স্বাধীন ভারতে এই ধরনের পরিবাররা তাদের মূলধন দ্রুত বৃদ্ধি করছে বিদেশী মূলধনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে। এবং তাদের আঞ্চলিক চরিত্র এদের স্থানকে করেছে সীমাবদ্ধ। এরাই আবার নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছে। যেমন রাসায়নিক শিল্প, ওষুধের কারখানা, ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রাদি। অন্যান্য রাজ্যে এইসব শিল্পগুলি যখন বন্ধ্যাত্বের মধ্যে নতুন দিকের সন্ধান দিচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুটি শিল্প পাট ও ইঞ্জিনিয়ারিং ক্রমশ মার খেয়েছে। পাশাপাশি কোন নতুন শিল্প গড়ে ওঠেনি। পশ্চিমবঙ্গের অবনয়নের হার তাই ক্রমাগত বেড়ে গেছে।

লেখক-পরিচিতি

বিনয় ঘোষ :—বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে অগ্রণী সমাজ-বিজ্ঞান গবেষণার পথিকৃৎ বিনয় ঘোষ দেশ ও কাল এর বিভিন্ন বিবর্তনের ধারায় তাঁর সুচিন্তিত গবেষণা ও অভিমত দ্বারা অগ্রবর্তী চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। মতাদর্শগত দ্বন্দ্বর ক্ষেত্রেও তিনি সবসময়ই এ ধারার সহায়ক চিন্তাবিদ হিসাবে কাজ করে চলেছেন।

প্রবহমানতার ধারায় তাঁর বিভিন্ন প্রকাশিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ নতুন চিন্তার সূত্রপাত করেছে, সমাজ ও মানুষকে কালের নিরিখে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করেছে।

অরবিন্দ বিশ্বাস :—প্রাথমিকভাবে অরবিন্দ বিশ্বাসের গবেষণার ক্ষেত্র ভারতবর্ষের, বিশেষ করে পূর্বভারতের ভূগোল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বীরভূম জেলার আবাদি জমির ব্যবহারপদ্ধতির আঞ্চলিক এবং সময়গত পরিবর্তন এর উপর ডক্টরেট করার পর, অরবিন্দ বিশ্বাস 'সমাজবিজ্ঞান'কে তাঁর গবেষণার অন্যতম বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি জাতিসঙ্ঘের সমাজ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থার অধীনে পূর্ব ভারতের জনসমাজ এবং খাদ্যসমস্যা নিয়ে গবেষণায় রত।

জ্যোতি ভট্টাচার্য :—ছাত্রজীবন থেকেই বৈপ্লবিক রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। ওয়ার্কার্স পার্টি অব ইণ্ডিয়ার নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধের রচয়িতা। 'পরিপ্রশ্ন' তাঁর বহু-আলোচিত রচনা-সংকলন। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।

অরবিন্দ পোদ্দার :—মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমের মূল্যায়ন করে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করার পর, অরবিন্দ পোদ্দার

উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত 'নবজাগরণ'-এর পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে বিস্তৃত গবেষণাকর্মে নিযুক্ত হন। এই বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন গবেষণাকর্ম এক নতুন চিন্তা-ভাবনার সূত্রপাত করে।

একজন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে নিজেকে সবসময়ে সমাজভাবনায় যুক্ত রেখে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়ে লিখে চলেছেন। বর্তমানে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক।

অশোক রুদ্র **ঃ**—পরিসংখ্যানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করার পর, অশোক রুদ্র ফলিত অর্থনীতির গবেষণাতেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। প্ল্যানিং টেকনিক বিষয়ে তাঁর গবেষণা দেশে-বিদেশে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। বর্তমানে কৃষি অর্থনীতিই তার গবেষণার প্রধান বিষয়। এ বিষয়ে তাঁর গবেষণা ও অভিমত প্রচলিত ধারার থেকে ভিন্ন সমাজের সার্বিক রূপান্তরের সহায়ক।

'অন্য অর্থ' গোষ্ঠী **ঃ**—প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আমাদের দেশ নির্ভরশীল সাহেবদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাধারা এবং বিতর্কের ওপর। সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ছাত্রদের যৌবন এ দেশের অর্থনীতিচর্চার ধারা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। জন্ম হয়েছিল বাংলা ভাষায় সামাজিক অর্থনীতির পত্রিকা 'অন্য অর্থ' (১৯৭৩ ডিসেম্বর)। পরবর্তী কালে যোগ দিয়েছেন সমাজ-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের সমমনোভাবাপন্ন মানুষেরা। পত্রিকা ঘিরে গড়ে উঠেছে সমাজবিজ্ঞান চর্চার গোষ্ঠী 'অন্য অর্থ'। ('অন্য অর্থ'-এর পক্ষে লেখাটি প্রস্তুত করেছেন অমিতাভ চক্রবর্তী, অশোক নাগ, নবীনানন্দ সেন, প্রদোষ নাথ, শুভেন্দু দাশগুপ্ত এবং সুদীপ চৌধুরী)।